রহস্যভেদী বাসব

(একাদশ খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৩৬১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

টাইপ সেটিং : দি একজিকিউটিভ্ প্রিন্টার

৩৭, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রণ : বাদল ভট্টাচার্য : অন্নপূর্ণা এজেন্সি

৬১, সূর্যসেন স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

এই খণ্ডে যে যে গল্প আছে

ঃ আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ঃ

রহস্যভেদী বাসব (১ —১০ খণ্ড)

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম

গোধূলির কুমকুম

ভোর হল বিভাবরী

আলোয় আলোয় পূর্ণিমা

মরণ দোলায় দোলা

জানু ভানু কৃশানু

রক্তাক্ত খাইবার

চুপি চুপি আঁধারে

টুরিস্টকারের গতিবেগ এখন চল্লিশ মাইল।

অ্যাসফল্টে মোড়া রাস্তার দু'পাশে গভীর জঙ্গল। ডানধারে ধূসর রঙের পাহাড়টি প্রাচীর রচনা করেছে। খুব কাছে নয়, আবছাভাবে দেখা যায়। তরাইয়ের এই জঙ্গল কতদূর পর্যন্ত পাহাড়টিকে অনুসরণ করেছে কে জানে। গরাণ আর দেওদারের সমারোহ। কোথাও কোথাও চোখে পড়ে দশ-বারোটা সেগুন গাছ একজোট হয়ে হেলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাসের মোট যাত্রীসংখ্যা সতেরোজন। তেরোটি পুরুষ, চারটি নারী।

মণিময় সান্যাল হাই তুললেন। চল্লিশের কোঠা সবে পেরিয়েছেন, তবে আরো একটু বয়স্ক বলে মনে হয় তাঁকে। মিশমিশে কালো গায়ের রঙ। মেদবহুল দেহ। বিশেষত্বহীন গোল মুখেও মাংস উপচে পড়ছে। ধবধবে সাদা টেরিউলের পাঞ্জাবিতে তাঁকে দেখাচ্ছেও অপরূপ।

তাঁর পাশের সিটে উপবিষ্টজনটি পুরুষ নয়, নারী। বছর চব্বিশ বয়স হবে বোধ হয় তরুণীর। অনিন্দ্য রূপবতী না হলেও তাকে সুশ্রী বলা চলে। গায়ের রঙ টকটকে না হলেও ফরসা ঘেঁষা। সাজপোশাকে তেমন চমক নেই। মুখে ম্রিয়মান ভাব।

আড়চোখে তরুণীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, সিটে হেলে বসে মণিময় বললেন, জঙ্গল আর পাহাড় দেখতে দেখতে তো চোখ পচে গেল। লোকালয় আসতে আর কতক্ষণ, কে জানে!

কথাগুলি বিশেষ কাউকে উল্লেখ করে বলা হয়নি অনুমান করেই ডাঃ রাজীব সেন মৃদু হেসে বললেন, লোকালয়ের আর নতুনত্ব কি আছে? ওই পরিবেশের মধ্যেই তো আমাদের দিন কাটে। এই বরং ভাল।

কি জানি মশাই, আমি তো ভালমন্দ কিছু বুঝছি না।

লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আমরা থাকি। এই নির্জনতা, এই গাছপালা, এই পাহাড় তো আমাদের ভাল লাগবার কথা।

মণিময় চোখ দুটিকে কুঁচকে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ডাক্তার না হয়ে আপনার কবি হওয়া উচিত ছিল।

ডাঃ রাজীব সেন প্রৌঢ় ব্যক্তি। ইংলণ্ডে গিয়ে ওখানকার ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে আসবার ইচ্ছা তাঁর যৌবনে ছিল। অর্থাভাবে আশা পূর্ণ হয়নি। তবে এখন তিনি ধনী ব্যক্তি। নামকরা সার্জনও বটে। ইংলণ্ডে না গেলেও মেম বিয়ে করেছেন। অবশ্য পরিচিতদের বিশ্বাস, তাঁর স্ত্রী পামেলা খাঁটি ইংরেজ হওয়া দূরের কথা, ইউরোপীয়ই নয়—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

পামেলা ডাঃ সেনের পাশেই বসে আছে।

তিনি কিছু বলতে যাবার আগেই পরিমল মুখার্জি বললেন, আমি জানি, মণিময়বাবুর কেন ভাল লাগছে না।

কেন?

উনি ভাবছেন ব্যবসাপত্তরের কথা। পাহাড় আর জঙ্গল দেখে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এত সময়ে কত টাকার লেনদেন হয়ে যেত।

সকলের মুখে শিষ্টাচার সম্মত হাসি দেখা গেল।

মণিময়ের ঠিক পিছনের সিটটি অধিকার করে আছে সোমনাথ। তার পাশে বসা দীপককে ছাড়া এই বাসের আর কাউকে সে চেনে না। আসারও তার ইচ্ছা ছিল না। একগাদা অপরিচিত লোকের মধ্যে গিয়ে পড়ে নিজেকে অস্বস্তিতে ফেলে লাভ কি? দীপক তার এই শেষ আপত্তিকেও টিকিয়ে রাখতে দেয় নি। অগত্যা—

প্রথম থেকেই বিষয়টি খুলে বলতে হয়।

মধ্যকলকাতার এক প্রাচীন বংশে সোমনাথের জন্ম। 'প্রাচীন' এই গৌরবটুকুই তখন বংশধরদের পিছনে শুধু জুড়ে ছিল—অর্থের কৌলিন্যতা ছিল না। যে সমস্ত ঘরে পারস্য থেকে আনা অতি মূল্যবান গালিচা পাতা থাকত, সেই সমস্ত ঘরের মেঝের এখানে ওখানে খোওয়া উঠে হাঁ-এর সৃষ্টি করেছে। হবে নাই বা কেন? পরিবার ক্রমেই বেড়ে গেছে। সেই হারে আয়ও কমেছে দ্রুত তালে। তারপর একসঙ্গে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ায় ভাগাভাগি হয়ে গেছে। সোমনাথের বাবা উমানাথবাবু শুধু সুযোগ-সন্ধানী ছিলেন না, ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল তাঁর। অল্প দিনের মধ্যেই লোহার দালালী ছেড়ে, বড়বাজারে দোকান দিয়ে বসলেন। এখন আয়রন মার্চেণ্ট বসুরায়কে লোকে এক ডাকে চেনে!

সোমনাথ যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে, সেই সময় ক্যানসারে মা মারা গেলেন। অভাবনীয় কিছু নয়, তিনি মৃত্যুর দিকে তিলে তিলে এগিয়ে যাচ্ছেন অনেক আগেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। এই মৃত্যুতে ছোট পরিবারটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন।

অবশ্য দুনিয়ার নিয়মে আবার সচল হল। সোমনাথ পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, উমানাথ নিজের ব্যবসায় আরো মনোযোগী হন। এইভাবে কিন্তু খুব বেশিদিন কাটল না। প্রথমে ভাসা ভাসা, তারপর সঠিকভাবে জানতে পারলেন নিজের লোকেরা, উমানাথ আবার বিয়ে করছেন।

যথাসময় সোমনাথের নতুন মা এলেন। দোহারা গম্ভীর মেজাজের বয়স্ক যুবতী। তিনি কিন্তু বেশ মানিয়েই নিলেন সৎ-ছেলের সঙ্গে। কিছুদিন ভালই কাটল। তারপর—হ্যাঁ, তারপরই সোমনাথের জীবনাকাশে দেখা দিল কালো মেঘ। বাপের বাড়ির লোকেদের ঘনঘন আসা-যাওয়া করার পর থেকেই কেমন বদলে গেলেন নতুন মা।

সোমনাথের ওপর অসম্ভব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তার কোন কাজই তাঁর পছন্দ নয়। এত বড় ছেলেকে অল্পতেই বকাঝকা করতে থাকেন। এমন কি উমানাথও বিরূপ হয়ে উঠলেন ছেলের ওপর। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যই তাঁর এই মনোভাব কিনা বুঝতে পারা গেল না। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, স্বল্পবাক সোমনাথের বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

উমানাথের শালাদের কানে কথাটা কিভাবে পৌঁছল। যদিও তাঁরা কলকাতা থেকে কয়েকশ' মাইল দূরে থাকেন, তবু তাঁদের কানে অচিরেই এই সংবাদ পৌঁছল।

সোমনাথের বড়মামা বিজনবাবু মা-মরা ভাগ্নের প্রকৃত অবস্থা দেখবার জন্য কলকাতা এলেন। ভগ্নীপতির বাড়িতে পা দেবার পর সমস্ত বুঝলেন তিনি। এমন কি তাঁর খাতির-যত্নও বিশেষ হল না। উমানাথকে তিনি কোন অনুযোগ জানালেন না, উপদেশ দেবার চেষ্টা করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলবার চেষ্টা করলেন না। শুধু বিদায় নেবার সময় সোমনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বলাবাহুল্য এতে উমানাথ আপত্তি করলেন না।

সেই থেকে সোমনাথ বক্সারে আছে।

বিজনবাবুরা তিনভাই। সকলেই কৃতবিদ্য। মোটা মাইনের চাকরি করছেন। শুধু বিজনবাবু কাজে ইস্তফা দিয়েছেন সম্প্রতি। দুইভাই এখন কর্মস্থলে। পৈতৃক বাড়িতে কয়েকজন ঝি-চাকর নিয়ে থাকেন বৃদ্ধা পিসিমা। ভাইয়েরা সপরিবারে ছুটিছাটাতে আসেন। বিজনবাবু পৈতৃক বাড়ির স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে ছোট একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে নিয়ে অবসরের দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। বিয়ে করেন নি—একা মানুষ, সময় ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। সোমনাথ হল এখন তাঁর সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী।

যথাসময় যোগ্যতার সঙ্গে বি-এস-সি পাশ করল সোমনাথ। তারপর হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে এম-এস-সি'ও। ঘরে বৌ আনার ইচ্ছে বিজনবাবুর ছিল, কিন্তু ভাগ্নের মতিগতি দেখে আর জেদাজিদি করলেন না। সোমনাথের তেমন উচ্চ আশা নেই। সে নিজেকে অসম্ভব গুটিয়ে নিয়েছে। স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করল।

এরপর আরো দুটো বছর কেটে গেছে।

উমানাথ ছেলের কোন খোঁজ-খবর করেন নি। সম্পর্ক সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েছেন বলে মনে হয়। এজন্য সোমনাথের কোন দুঃখ নেই। সে বেশ আছে। দিন কিন্তু একভাবে কাটে না। কোন নোটিশ না দিয়েই বিজনবাবু একদিন ওকে নিঃসঙ্গ করে চলে গেলেন। ব্লাডপ্রেসারের রুগী ছিলেন। হঠাৎ হার্ট ফেল করে গেল।

সোমনাথ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল যেন। খুব খারাপ লাগতে লাগল তার। কিন্তু উপায় কি? ভেবে মন খারাপ করে থাকলে বড়মামা কিন্তু ফিরে আসবেন না। মনকে অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যই যেন সে বিনা মাইনেতে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে থিসিস শেষ করার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

আর্থিক দুশ্চিন্তা নেই। নিজের আয় ছাড়া, বড়মামার অ্যাটর্নি জানিয়ে দিয়েছেন যথাসময়, তাঁর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মোটা টাকা আর বাড়িখানা তিনি সোমনাথকে দিয়ে গেছেন। উইলের প্রবেটও নেওয়া হয়েছে

সোমনাথ থিসিসের কাজ দ্রুত শেষ করেছে। দাখিলও করে এল একদিন। মন বেশ হাল্কা' লনে বেতের চেয়ারে বসে প্যারা অ্যালসেসিয়ান কুকরটার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল। এই জাতের কুকুর ভারতবর্ষে বিশেষ পাওয়া যায় না, বিজনবাবু একজন বুলগেরিয়ান ডিপ্লোম্যাটের কাছ থেকে কিভাবে যেন সংগ্রহ করেছিলেন। পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে এই কুকুরগুলি তুলনাহীন প্রত্যহ রাত্রে প্রিন্সকে বাগানে ছেড়ে দেওয়া হয়

প্রেমবাহাদুরকে আসতে দেখা গেল।

সঙ্গীনধারী প্রেমবাহাদুর প্রিন্সের মতই বাড়ি পাহারা দেয়। কি এমন মহামূল্য জিনিস বাড়িতে আছে যার জন্য গুর্খা গার্ডের প্রয়োজন—এর অর্থ খুঁজে পায়নি সোমনাথ। একবার এ প্রসঙ্গ তুলেও ছিল বড়মামার কাছে। তিনি কিছু বলেন নি, অল্প একটু হেসেছিলেন মাত্র। অবশ্য বিজনবাবু মারা যাবার পর প্রেমবাহাদুরকে ছাড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু ছাড়ায় নি। লোকটা ভাল। থাক।

কিছু বলবে বাহাদুর?

একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন।

এখানে পাঠিয়ে দাও।

বাহাদুর চলে যাবার মিনিট দুয়েক পরে যে ভদ্রলোক সেখানে এলেন তাঁকে সোমনাথ আগে কখনও দেখে নি। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের ওপরেই হবে। অবাঙালী। বোধ হয় পাঞ্জাবের অধিবাসী!

নমস্কার বিনিময়ের পর সোমনাথ তাঁকে বসতে বলল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে শুদ্ধ হিন্দীতে শিষ্টাচারের বুলি আওড়ালেন আগন্তুক, বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কিছু সময় নষ্ট করতে এলাম।

কি বলবেন বলুন?

আপনি আমার চেনেন না। আম্বালা থেকে আসছি। আমার নাম শেঠ কাপূরি চান্দ।

সোমনাথ উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। আম্বালার এই অপরিচিত ভদ্রলোক তার কাছে কি প্রয়োজনে এসেছেন? মুখে অবশ্য সে-ভাব প্রকাশ করল না। দেখাই যাক না লোকটির কি উদ্দেশ্য।—আমার নাম বোধ হয় আপনি জানেন?

বিলক্ষণ। না জেনেই কি এসেছি। আমি ব্যবসাদার লোক—খোঁজ-খবর না নিয়ে কোথাও পা আগে বাড়াই না। হ্যাঁ, এইবার কাজের কথায় আসা যাক।

ভদ্রলোক থামলেন। পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে, তার থেকে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে ফেললেন।

প্রিন্স আগন্তুককে ভাল চোখে দেখে নি, সামনের পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে চাপা গর্জন তুলছিল।

দাঁতের পাটির মধ্যে পানকে ভাল মত চালিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, আপনার কুকুর বোধ হয় আমাকে পছন্দ করছে না। ওর উপস্থিতিতে কথা-বার্তা চালান আমার পক্ষে...

কাপূরি চান্দ কথা ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না।

বেশ তো। ওকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি। বাহাদুর—

প্রেমবাহাদুরের সঙ্গে প্রিন্সকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিল সোমনাথ।

এবার বলুন?

এই বাড়িটার কত দাম হতে পারে?

অদ্ভুত প্রশ্ন।

আমি আপনার কথাটা ঠিক...

বুঝতে পারছেন না। আমার প্রশ্নের উত্তব যদি অনুগ্রহ করে দেন, তাহলে বুঝিয়ে বলতে অসুবিধে হয় না।

সোমনাথের বিস্ময় বর্ধিত হতে থাকে।

কিন্তু...

বাড়ির দামটা কিন্তু আপনি বলছেন না?

সঠিক দাম বলা সম্ভব নয়। যাচাই করে কোনদিন দেখি নি। মনে হয় হাজার বিশেক টাকা হতে পারে।

আপনার অনুমান যথার্থ। এই বাড়ির বর্তমান বাজাব দব তাই হবে। এইবার আসল কথায় আসা যাক। বাজাব দর যাই হোক, আমি কিন্তু এই বাড়ির দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা স্থির করেছি।

পঁয়ত্রিশ হাজাব!

হ্যাঁ। এত ভাল দাম আপনাকে আর কেউ দেবে না।

সোমনাথ বিস্ময়েব শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। লোকটা বলে কি? মাথায় গোলমাল আছে নাকি? বাড়ি বিক্রি করার কথা কাউকে বলা দূরেব কথা, কোনদিন মনের কোণেও স্থান দেয় নি। গলা ঝেড়ে নিয়ে কিছুটা বিরক্তিব সুরে বলল, আমি বাড়ি বিক্রি করছি, কে বলল আপনাকে?

কাপূরি চান্দের পানের রসে ভেজা ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। মুখ দেখে মনে হল, এই ধরনের প্রশ্ন যেন তিনি আশা করেছিলেন। বললেন, কেউ বলে নি। এমন কি আমি এও জানি, বাড়ি বিক্রি করার কথা আপনি মনেও স্থান দেন নি। যা হোক, দাম আশা করি আপনার পছন্দ হয়েছে?

আমি জানতে পারি কি, এত বেশি টাকা দিয়ে আপনি কম দামী একটা বাড়ি কেন কিনতে চাইছেন?

নিশ্চয় জানতে চাইবেন ! আসল কথা হল, এই বাড়িখানা আমার পছন্দ হয়েছে। শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে নয়, বেশ খোলামেলা।

আপনাকে এর চেয়ে একটা ভাল বাড়িব সন্ধান দিচ্ছি—এই পাড়াতেই। ডাঃ বর্মা এলাহাবাদে চলে যাচ্ছেন। তাঁর বাড়ি বিক্রি হবে। দামও বেশি নয়।

আমার এই বাড়িখানাই পছন্দ।

সোমনাথ এবাব বেশ বিরক্ত হল ঃ আপনি তো আশ্চর্য লোক। আপনার কথাই শেষ কথা নয়। বাড়ি আমার, আমি বিক্রি করব না।

দাম আবো একটু চড়াতে চাইছেন বোধ হয়?

পঞ্চাশ হাজাব টাকা দিলেও বাড়ি বিক্রি করছি না। আব নিশ্চয় আপনার কিছু বলবার নেই। এবার আপনি আসুন।

আমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখলে পারতেন।

বাহাদুর, সাহেবকে রাস্তা দেখাও।

সোমনাথ কথা শেষ করে ওখানে আর অপেক্ষা করল না। লন পেরিয়ে বাড়ির

মধ্যে প্রবেশ করল। মনের শান্ত আমেজ নষ্ট করে দিল কোথাকার এক কাপূরি চান্দ এসে। সোমনাথ নিজের স্টাডিরুমে গিয়ে বসল। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগল, এত বেশি দাম দিয়ে এই বাড়িখানা কিনতে আসার উদ্দেশ্য কি? অতি ছোট বাড়ি, সুদৃশ্য নয়, এমন কি তৈরি হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত হোয়াইটওয়াস বা দাগী-জায়গাগুলো মেরামতের কথাও ভাবা হয়নি। তবে? অবশ্য বাড়ির চারপাশের কম্পাউণ্ড লোভনীয়। সেই লোভে যে পাঞ্জাবীপ্রবর এসেছিলেন, তাও বলা চলে না। কারণ এই অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি কম্পাউণ্ড যুক্ত। ভেবে কূল-কিনারা না পেয়ে সোমনাথ একটা বই টেনে নিয়ে মন বসাবার চেষ্টা করল।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। কাপূরি চান্দের বাড়ি কিনতে আসার কথাটা সোমনাথ প্রায় ভুলেই গেছে। লোকটার মাথা খারাপ, এই রকম একটা ধারণা মনে জন্মে যাবার পর ওই বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি।

কলেজ থেকে ফিরল প্রায় সাড়ে পাঁচটার পর। গরমকালে প্রতিদিন জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়ে। কোনদিন দীপকের বাড়ি যায়, আবার কোনদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টা দুয়েক বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে। শীতকালে এ নিয়ম চলে না।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম এখন। বেশ শীত পড়েছে। সোমনাথ আবার শীতকাতুরে মানুষ। কোথায় বেরুবে? রামজী এক গেলাস ওভালটিন এনে দিল। তাকে জানিয়ে দিল, এখন আর কিছু খাবে না। আটটার মধ্যে রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। রামজী সোমনাথের সংসার সামলায়। চালাক-চতুর, বিশ্বাসী লোক।

কথা মত আটটায় আর হল না, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে ন'টা বেজে গেল। অনেকগুলো ক্লাস আজ নিতে হয়েছে, ক্লান্ত ছিল। বিছানায় শরীর ঢেলে দেবার পরই চোখ জড়িয়ে এল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সোমনাথ নিজেই জানে না। প্রিন্সের প্রবল চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। কি হল, প্রিন্স এভাবে চেঁচাচ্ছে কেন? সোমনাথ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। জ্বালল বাগানের আলোটা। বাগানের গেটের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার করছে প্রিন্স। আর গেটের একটা পাল্লা হাট করে খোলা।

সোমনাথ আশ্চর্য হয়ে গেল। গেট খোলা কেন? তবে কি কেউ ঢুকেছিল কম্পাউণ্ডের মধ্যে? নিশ্চয় তাই। নইলে প্রিন্স এত উত্তেজিত হত না। তাছাড়া গেটই বা খোলা থাকবে কেন? রামজীরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভয় চকিত মুখে সে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল।

বাড়িতে চোর ঢুকেছিল রামজী?

হতে পারে বাবু। কুকুরটা যেভাবে চেঁচাচ্ছে---

প্রিন্স---প্রিন্স--

সোমনাথের ডাকে প্রিন্স গলা একটু নামাল বটে, ডাক বন্ধ করল না। কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার আগেকার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। অগত্যা সোমনাথ এগিয়ে গিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করল

বাবু, বাহাদুরকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই তো' বাহাদুর আবার কোথায় গেল?

ডাকাডাকি করেও তার সাড়া পাওয়া গেল না। এমন তো হবার কথা নয়। রাত্রে সে জেগে পাহারা দেয়। এ তার বহু দিনের অভ্যাস। অথচ তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

এস তো এগিয়ে দেখি!

দুজনে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। প্রিন্সও গেল পিছু পিছু। গেটের ডান পাশে ছোট একটা ঘর আছে। পাহারা দেবার ফাঁকে বাহাদুর এখানে বিশ্রাম করে। এখন ঘরখানা খালি। গেল কোথায় নেপালী-পুঙ্গব?

রামজী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বাবু, ওই দেখুন—

গেটের অন্যধারে গাছের ছায়ার দরুণ অন্ধকার আরো জমাট হয়ে আছে; ওখানে বাহাদুরের পড়ে থাকা দেহটা প্রিন্সই প্রথমে আবিষ্কার করেছে। রামজী তারপর দেখতে পেল। যা হোক, দেহটা দুজনে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এল। কপাল কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। প্রাণে মারা যায় নি বাহাদুর, আঘাতেব দরুণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

বাড়িতে ব্রাণ্ডি ছিল। কোনরকমে খাওয়ানো হল তাকে। আধ ঘণ্টা পরে সুস্থ হয়ে বাহাদুর যা বলল, তার সারমর্ম হল, হঠাৎ সে দূর থেকে লক্ষ্য করে, গেটটা খুলে যাচ্ছে। প্রিন্স তখন বাগানের অন্যধারে ছিল। সে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য এগিয়ে যায়। আর সেই সময় কে তার মাথায় আঘাত করে।

সোমনাথ এবার সমস্ত কিছু চোখের ওপব দেখতে পায়। চোর বাহাদুরকে আহত করেই মনে করেছিল, এবার বাড়ির ভেতরে ঢুকতে আর কোন অসুবিধা হবে না। প্রিন্সের কথা তার জানা ছিল না। এই সময় বোধ হয় প্রিন্স বাগানের অন্যধার থেকে এদিকে এসে উপস্থিত হয়—আর চেঁচামেচিতে চোর ভয় পেয়ে সরে পড়েছে।

ডেটল দিয়ে ধুয়ে টিঞ্চার বেঞ্জিন দিয়ে বাহাদুরের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হল।

সোমনাথ মনে মনে স্থির করল, কাল সকালে বড়সাইজের নবতাল তালা আনাবে। এবার থেকে রাত্রে গেট তালা দিয়ে বন্ধ করা থাকবে। রামজী বাহাদুরকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এল।

বাবু, পুলিশে খবর দেব?

না, তার দরকার নেই। চোর যখন কিছু চুরি করতে পারে নি, তখন পুলিশ ডেকে কি হবে? আচ্ছা রামজী, পাড়ায় কি আজকাল খুব চুরিটুরি হচ্ছে?

তা তো কিছু শুনিনি।

তুমি এবার শুয়ে পড় গিয়ে।

বেশ বেলায় সোমনাথের ঘুম ভাঙল। বিছানায় উঠে বসেই মনে পড়ে গেল গতরাত্রে চোর আসার কথা। রামজী কাছাকাছিই ছিল। মনিবকে উঠতে দেখে ওভালটিন নিয়ে এলো। চায়ের পরিবর্তে, ঘুম থেকে উঠেই এক গেলাস ওভালটিন খাওয়া সোমনাথের অনেক দিনের অভ্যাস।

কয়েক চুমুক মাত্র ওভালটিন খেয়েছে, রামজী বলল, বাবু, এটা আজ সকালে বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছি।

জার্মান সিলভারের একটা পানের ডিবে। ডিবেটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে সোমনাথের মন সজাগ হয়ে উঠল। এই পানের ডিবেটাই তো সেদিন দেখেছিল শেঠ কাপূরি চান্দেব হাতে! কি আশ্চর্য ব্যাপার। কাপূবি চান্দ গতকাল রাত্রে তার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল নাকি? যে লোক বেশি দব দিয়ে বাড়ি কিনতে চায়, সে সেই বাড়িতেই চুরি করতে ঢোকে কোন যুক্তিতে?

সোমনাথ বেশ প্যাঁচাল চিন্তায় পড়ে গেল। লোকটাব মাথা খারাপ—এ ধারণা করে নেওয়া ঠিক হয়নি। কোন উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়ি কেনার কথা বলতে এসেছিল। উদ্দেশ্যটা কি? কাল পুলিশে খবর দিলেই বোধ হয় ভালো হত। অবশ্য এখনো দেওয়া চলে। তবে কথায় আছে, পুলিশ ছুঁলেই আঠারো ঘা!

চিন্তার বোঝা ঘাড়ে নিয়েই সোমনাথ কলেজ গেল।

ওই ঘটনার পর দিন কুড়ি কেটে গেছে। আর কোন উৎপাত হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে সোমনাথের মন থেকে দুশ্চিন্তাও কেটে গেছে ক্রমে। কাপূরি চান্দের চোরের ভূমিকা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য অজানা থেকে গেলেও, প্রসঙ্গের গুরুত্ব আপনা থেকেই কমে গেছে।

ছুটির দিন ছিল। সোমনাথ লনে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। সকালের মিষ্টি রোদে শীতকালে এখানে বসতে ভালই লাগে। শীত পড়েছেও জবর। এই সময় দীপক এল। দীপক মোটর মেরামতের কারবার করে। বহুদিনের বন্ধুত্ব। হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গেই ছিল দুজনে। দীপকেব বাবা দেবজ্যোতিবাবু স্থানীয় নামকরা উকিল।

বন্ধুকে স্বাগত জানাল সোমনাথ।

এসো—এসো—। পথ ভুলে নাকি?

দীপক বসতে বসতে বলল, তুমি আমাদের ওখানে কতবার যাও শুনি? আমি তো তাও পথ ভুলে এলাম—

এই দেখ, এসেই চার্জ করতে আরম্ভ করলে? অবশ্য আমি জানি, তুমি মোটেই পথ ভুলে আসোনি। আসার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

দীপক মৃদু হেসে বলল, আছেই তো।

শঙ্কিত গলায় সোমনাথ বলল, তোমার সেই মামাতো শালীর ব্যাপার নয় তো? তাহলে ভাই...

ভয় নেই বৎস। চিঠি পেয়েছি সম্বলপুরে তার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। তাকে তুমি বিয়ে করলে আমি কিন্তু খুশী হতাম।

আমার মত লোকের হাতে পড়লে তোমার শালীটিব নরকবাসের সামিল হত। সম্বলপুরে উনি বেশ আরামে থাকবেন।

আচ্ছা, তুমি কি স্থির করেছ বিয়ে করবে না?

কে বললে? সেই মনের মানুষটির সন্ধান পেলেই একদিন তোমাদের একপাত খাইয়ে ছাড়ব দেখে নিও।

বিজনবাবু যখন দিতে চেয়েছিলেন, তখন অমত করেছিল ; কারণ সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই বাঁধা পড়তে ভালো লাগেনি। এখন বড় একা একা মনে হয় নিজেকে।

এই গৃহে একটি নারীর প্রয়োজনীয়তা যেন এখন বিশেষ বাঞ্ছনীয় বিষয়। দীপক তার মামাতো শালীর সম্বন্ধ দিয়েছিল। কিন্তু ছবি দেখে ভদ্রমহিলাকে পছন্দ হল না সোমনাথের।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দীপক বলল, এক এক সময় আমার সন্দেহ তুমি কারুর প্রেমে পড়েছ—

আপাতত নয়। এবার বলো, কি বলতে এসেছ?

তোমাদের তো এখন সেই পয়লা জানুয়ারী পর্যন্ত ছুটি। ছুটিটা কিভাবে কাটাবে কিছু স্থির করেছ!

কিভাবে আবার! প্রতিবার যেভাবে কাটাই—শুয়ে বসে।

একে লাইফ বলে না। চলো, আমাদের সঙ্গে দিন চারেক ঘুরে আসবে।

কোথায়?

কার্মনচক।

সে আবার কোথায়?

তুমি নেহাৎই গ্রন্থকীট হয়ে পড়েছ। আশপাশের কোন খবরই রাখো না দেখছি। কার্মনচক একটা পাহাড়ী জায়গা। ওখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য যে না দেখেছে, তার জীবন ব্যর্থ। আমরা জনা সাতেক যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

এই ঠাণ্ডায় পাহাড়ী জায়গায় গিয়ে নিজের জীবন সার্থক করতে চাই না। তোমাদের সখ বলিহারি!

আমরা কি পাহাড়ের ওপর থাকব নাকি? ভ্যালিতে যে ডাকবাংলো আছে, তাতেই আড্ডা গাড়ব। দেশের ওই একটিমাত্র হিল স্টেশন, যেখানে লোকে শীতকালে রোদ পোহাতে যায়। কুনো হয়ে থেকো না। বলছি তোমার ভালো লাগবে। আমি আর সকলকে কথা দিয়েছি তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।

আর কে কে যাচ্ছে?

শহরের কয়েকজন বাঙালী, তুমি সকলকে চিনবে না। তার জন্য কোন অসুবিধা হবে না। আমি তো রয়েছি—

সোমনাথ কয়েকবার আরো আপত্তি করল, কিন্তু তার আপত্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না দীপক। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির হল। এখান থেকে কার্মনচক মাইল পঞ্চাশেক দূরে। ট্রেনের কোন ব্যবস্থা নেই। টুরিস্টকারে যাওয়া হবে স্থির হয়েছে—একথা জানাল দীপক। ওই সঙ্গে জানিয়ে দিল শ'খানেক টাকা জন প্রতি চাঁদা ধার্য হয়েছে।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ওরা যাত্রা করল। সঙ্গে প্রত্যেকে নিয়েছে ভারি ভারি গরম কাপড়। বিছানা নেবার দরকার হয়নি। ডাকবাংলোয় পাওয়া যাবে। টুরিস্টকারে অবশ্য সতেরোজন যাত্রী আছেন। সকলেই চলেছেন কার্মনচক। তবে বাকিদের সঙ্গে এ দলের কোন সম্পর্ক নেই।

টুরিস্টকারের গতি এখন আর চল্লিশ মাইল নেই। খুব ধীরে ধীরে চলেছে। গতি মন্থর না করে উপায় নেই। পিছনে ফেলে আসা মাইল পনেরো রাস্তার

দু'পাশে ছিল জঙ্গল। মাইল দুয়েক থেকে রাস্তা ঘন ঘন মোড় নিয়েছে। এক ধারের জঙ্গলও সরে গেছে অনেক দূরে। এখন প্রাকৃতিক খাদ রাস্তার পাশে পাশেই চলেছে। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে গেলে অবধারিতভাবে খাদে পড়তে হবে।

অধিকাংশ যাত্রীর শঙ্কিত দৃষ্টি ঘনঘন জানলার দিকে ফেরাচ্ছেন। তাঁদের মনের ভাব এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সোমনাথ বাইরের দিকে তাকাচ্ছে না। সে এক-আধবার দেখে নিচ্ছে সামনের সীটে বসা তরুণীকে। পিছন থেকে সমস্ত মুখ চোখে ধরা দেয় না। মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে শুধু।

দীপক সোমনাথকে লক্ষ্য করছিল। চাপা গলায় বলল, কি দেখছ?

কি আবার দেখব?

দেখছ বৈকি! সুন্দর জিনিসের দিকে অবশ্য তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তবে...

এই মেয়েটি আমাদের কলেজে একদিন এসেছিল। প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি।

মৃদু হেসে দীপক বলল, তাই বার বার দেখে সিওর হয়ে নিচ্ছিলে?

তুমি ঠাট্টা করছ! বিলিভ মী, আমি একদিন প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকেই দেখি...

মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অ্যাডমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে হয়তো অনুসন্ধান করতে এসেছিল।

হতে পারে।

তুমি মণিময় সান্যালকে চেনো?

না। কে তিনি?

তরুণীর পাশে অর্থাৎ ঠিক তোমার সামনে যিনি বসে আছেন, উনিই হলেন মণিময় সান্যাল। অতি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। তুমি বারে বারে তাঁর পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকাচ্ছ বুঝতে পারলে কেলেঙ্কারী বাধিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

ভ্রূ-কুঁচকে সোমনাথ বলল, এই ধরনের লোককে দলে নেওয়া তোমার উচিত হয়নি—

আহা-হা, তুমি যা ভাবছ তা নয়! গুণ্ডামী করে বেড়ানো ওঁর পেশা নয়। ধনী ব্যবসাদার লোক—আসল কথা হল, আঁতে ঘা লাগলেই ফোঁস করে ওঠেন।

পরিমল মুখার্জির গলা পাওয়া গেল।

পার্থবাবু, আপনি তো কিছু বলছেন না? এতটা পথ সম্পূর্ণ চুপচাপই কাটিয়ে দিলেন, ব্যাপার কি মশাই?

পার্থ চক্রবর্তী সত্যি চুপচাপ আছেন। খাপছাড়া ভাবে মাঝে মাঝে যে আলাপের সূত্রপাত হচ্ছে, তাতে তিনি মোটেই যোগ দেননি। জানলার বাইরের দিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত।

এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, যাদের বয়স অনুমান করা রীতিমত কঠিন। পঁয়ত্রিশও হতে পারে, আবার পঞ্চান্নও হতে পারে। পার্থ চক্রবর্তী সেই জাতীয় পুরুষ। তবে ষাটের কোঠায় পা দেননি এটা ঠিক। মুখে শ্রী আছে। চোখে মোটা ফ্রেমের ওয়াইন কালারের চশমা।

ভাবুক প্রকৃতির। ছবি আঁকা অভ্যাস আছে, অথচ পেশায় তিনি রেডিও এঞ্জিনীয়ার।

কানপুর থেকে কিছুদিন এখানে এসে রেডিওর জমকালো দোকান করেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই দোকানটি শহরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পরিমল মুখার্জির কথায় পার্থ চক্রবর্তী একটু নড়েচড়ে বসে বললেন। প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলাম। সাবজেক্টের ছড়াছড়ি—

কার্মনচকে পৌঁছেই আঁকতে বসে যাবেন বলুন?

বলা যায় না।

মণিময় বললেন, তেল নিতে আজকাল আসেন না। গাড়ি চড়া ছেড়ে দিলেন নাকি?

মণিময়ের পেট্রোল পাম্প আছে।

চক্রবর্তী নাকের ওপর চশমা ঠিকমত বসিয়ে নিয়ে বললেন, বেচে দেব ভাবছি। বড় বেশি তেল খাচ্ছে।

বেচে দিন। আমার সন্ধানে সস্তায় একটা ভাল গাড়ি আছে। সেখানা কিনলে ঠকবেন না। ফিয়েট।

ফিয়েট হলে আপত্তি নেই। ফিরে গিয়ে দেখব।

পঞ্চাশ মাইল আর কতটুকু পথ। মাইল চারেক বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে যাবার পরই টুরিস্টকার তীব্রবেগে ছুটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। বাস থেকে নামার পরই সোমনাথের চোখ জুড়িয়ে গেল। দীপক মিথ্যা বলেনি। অপূর্ব! শহরের এত কাছে এমন জায়গা আছে আগে কে জানত! না এলে ঠকতে হত। এখানে পা দিয়েই কার্মনচকের প্রেমে পড়ে গেল সোমনাথ। সকলেই একে একে নামলেন বাস থেকে। কয়েকজন কুলী অপেক্ষা করছিল। তাদের ঘাড়ে মালপত্র চাপিয়ে দলটি এগুলো।

ডাকবাংলোয় কিন্তু জায়গা পাওয়া গেল না। আগে থেকে খবর পাঠানো হয়নি। বাসে অন্য যেসব যাত্রী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ডাকবাংলোয় ঘর রিজার্ভ করে রেখেছেন। চিন্তার কিছু ছিল না। চারটে টুরিস্ট লজ আছে, কোথাও না কোথাও জায়গা পাওয়া যাবেই।

পাওয়া গেলও। সানসাইন পাহাড়ের প্রায় কোলে। চারদিকে বারান্দা বিশিষ্ট ছ' কামরার টুরিস্ট লজ। চারদিনের জন্য এখানেই সংসার পাতলেন বক্সার থেকে আগত আটজন। পৌঁছে রান্নাবান্না করে খেতে গেলে অনেক সময় নেবে। ড্রাই ফুড সঙ্গে আনা হয়েছিল। তাই খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করা হল তখনকার মত। তারপর একে একে সকলে বেরুলেন প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা করতে।

বেলা এখন একটা। চমৎকার রোদ্দুরে আকাশ ঝলমল করছে। অনেকেই ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়েছেন। রাজীব সেন সস্ত্রীক বেরিয়েছেন বন্দুক নিয়ে। এখানকার পুরন্ত হরিয়ালের প্রচণ্ড খ্যাতি। গোটা কয়েক যদি মারতে পারেন, মেনুতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হবে। রাঁধবার দায়িত্ব নেই, রাঁধবে টুরিস্ট লজের বাবুর্চি।

বিজনবাবুর ডবল ব্যারেল বন্দুক ছিল, তিনি মারা যাবার পর লাইসেন্স নিজের নামে ট্রান্সফার করে নিয়েছে সোমনাথ। বন্দুক সঙ্গে আনা হয়নি। খালি হাতেই বেরুল— দু'চোখ ভোরে চারদিক দেখে নেবে। রোদ্দুর কড়া হলেও, জল-হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ

আছে। বেশ সুখকর। সোমনাথ পাহাড়ে কিছুদূর ওঠার পর একটা সমতল পাথরের ওপর বসল। অভ্যাস নেই, একটুতেই হাঁপ ধরে গেছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

সোমনাথ সিগারেট ধরাল। এই সময় দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এল। ডাঃ সেন নিশ্চয় একটা হরিয়াল ধরাশায়ী করলেন। আবার উৎকট নির্জনতা। হাওয়া না থাকায় গাছপালা নড়ার শব্দ হচ্ছে না। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল নিচের দিকে। সেই তরুণী উঠে আসছে। এতক্ষণ কোথায় ছিল? সোমনাথ কেমন শিহরণ অনুভব করল। আলাপ করতে গেলে কিছু মনে করবে কি? বোধ হয় না। এক সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। সকলের সঙ্গেই তো সকলের আলাপ পরিচয় করে নেওয়া উচিত।

তরুণী উঠে আসছে। সে এখনও সোমনাথকে দেখতে পায়নি। চড়াইয়ের পথ অতিক্রম করার জন্য তার মুখের ক্লান্ত ছায়া আরো গাঢ় হয়েছে। দুজনের দূরত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে। হাত দশেক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। ডিসেম্বর মাসের ঠাণ্ডাতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

সোমনাথ পরিচিতজনের মত বলল, হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বসে একটু বিশ্রাম করে নিন।

তরুণীর অকারণেই মুখ লাল হয়ে উঠল। সে কিছু বলবার চেষ্টা করে বসল একপাশে।

মিনিটখানেক চুপচাপ থাকার পর সোমনাথ বলল, আমাদের একসঙ্গে যখন দিন চারেক থাকতে হবে, তখন আলাপ-পরিচয়টা বোধহয় হয়ে যাওয়া উচিত। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে...

না...আপত্তি আর কি।—কোনরকমে কথাটা বলল সে।

আমি সোমনাথ বসুরায়।

আমার নাম স্নিগ্ধা ভৌমিক।

পাহাড় চূড়ায় একেবারে ওঠার ইচ্ছে আছে নাকি?

ওখানে কি উঠতে পারব?

দেখুন না, আমি এইটুকু উঠেই হাঁপিয়ে পড়েছি। জায়গাটা কিন্তু চমৎকার। আপনি আগে কখনও এসেছেন?

না।

আমিও এই প্রথমবার।

স্নিগ্ধা একটু ইতস্তত করে বলল, আর উঠব না, এবার নামি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে নামতে আরম্ভ করল!

মনের মধ্যে অতৃপ্ত ভাব নিয়ে সোমনাথ বসে রইল। মণিময় সান্যাল কে হন, এ ছাড়াও আরো অনেক প্রশ্ন করার ছিল। কিন্তু—

ঘণ্টা দেড়েক আরো ওখানে একইভাবে বসে থেকে সোমনাথ নেমে এল। ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ ওর কানে এসেছে। ডাঃ সেন চুটিয়ে পাখি মারছেন। টুরিস্ট লজে তখন সকলেই প্রায় ফিরে এসেছেন। ও কম্পাউণ্ডে পা দেবার পরই,

সস্ত্রীক ডাঃ সেন গোটা চারেক পাখি হাতে ঝুলিয়ে এলেন। সকলে সহর্ষে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে প্রায় বেলা পড়ে এল।

নিভৃতে দীপক প্রশ্ন করল, আলাপ জমল?

সচকিতভাবে সোমনাথ বলল, কার সঙ্গে?

আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না বন্ধু। শুধু চোখ কেন, আমার ক্যামেরাও তোমাদের ধরে রেখেছে।

না, তেমন কিছু নয়। মানে...

তেমন কিছু নয়, মানে? ওস্তাদ ছেলে যা হোক।

মৃদু হেসে সোমনাথ বলল, তুমি বিবাহিত লোক। আমার মত ব্যাচেলার কি করছে, সেদিকে তোমার দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়।

তুমি আমার বন্ধু না হলে দৃষ্টি দিতাম না। মণিময় সান্যালের কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি? তোমাকে বোধহয় বলেছি, এমনিতে সে বেশ আছে। রাগলে একেবারে অন্য মানুষ।

মণিময়ের সঙ্গে স্নিগ্ধার কি সম্পর্ক বলতে পার?

অতি মধুর। শালী।

শালী!!!

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে।

ভণিতা না করে বলেই ফেল?

একটু গম্ভীর গলায় দীপক বলল, ও মেয়ে তোমার যোগ্য নয় সোমনাথ।

কেন? একথা বলছ কেন?

নারীঘটিত ব্যাপার খুলে কিছু না বলাই ভাল। আলাপ একটু জমলে তুমিও বুঝতে পারবে। তাস খেলবে নাকি? পরিমলবাবুর ঘরে তাসের আড্ডা বসেছে।

দীপক চলে গেল।

চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল সোমনাথ। স্নিগ্ধা ওর মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। তার মনেও যদি ও জায়গা করে নেয় ক্রমে। মণিময় সান্যালকে খোলাখুলিভাবে সহজেই বলতে পারে। এতে সান্যাল মশাইয়ের রাগ করার কিছু নেই। একদিন না একদিন শালীর বিয়ে কোথাও দিতেই হবে। তবে দীপক যে সমস্ত জট পাকানো কথা বলে গেল, তার অর্থ কি? সোমনাথ ভাবতে ভাবতে পায়চারি আরম্ভ করল!

তাসের আসর চলল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। খেলছিলেন, ডাঃ রাজীব সেন, মণিময় সান্যাল, পরিমল মুখার্জি ও পার্থ চক্রবর্তী। পামেলা, স্নিগ্ধা ও দীপক দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল। তাস খেলা ভেঙে যাবার পর সোমনাথ ঘরে এল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাইরের ঘরে বসেই অনুমান করা যাচ্ছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে বাইরে বুঝি বরফ পড়ছে। অবশ্য আজ পর্যন্ত এখানে বরফ পড়েনি। ফায়ার প্লেসের আগুন উস্কে দিয়ে সকলে চেয়ারগুলি কাছাকাছি টেনে বসলেন।

অসংলগ্নভাবে কথাবার্তা চলতে লাগল। স্নিগ্ধা কথাবার্তায় যোগ দেয়নি, মাথা নিচু করে বসে আছে। পামেলাও চুপচাপ। তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকালে কেমন অবাক লাগে। এই সময় সোমনাথ লক্ষ্য করল, রাজীব সেন তেরছা দৃষ্টিতে নতমুখী স্নিগ্ধার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হল, তাঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়।

প্রৌঢ় বিবাহিত ডাক্তারের চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি কেন?

বিমর্ষ সোমনাথ আরো বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ পামেলা বলে উঠল, আপনারা কে কে নেশা করেন।

পামেলা চমৎকার বাংলা বলতে পারে। অদ্ভুত প্রশ্ন।

পরিমল মুখার্জি বললেন, আমরা সকলেই নেশাবাজ। চা খাই, সিগারেট খাই, পানও চলে।

ওগুলো তো জীবন-ধারণের অঙ্গ! আমি প্রকৃত নেশার কথা বলছি।

অর্থাৎ?

মণিময় সান্যাল বললেন, মদ, গাঁজা, আফিঙ, চণ্ডু, চরস—আমরা খাই কিনা, এই প্রশ্নই বোধহয় উনি করছেন।

আমার প্রশ্নটা তাই বটে।

সকলে চুপ করে রইলেন।

ডাঃ সেন বললেন, লজ্জা পাবার কিছুই নেই। নেশা করা তো আজকাল অ্যারিস্টোক্র্যাসীর অঙ্গ। আমি তো কয়েক ধরনের নেশা করি।

পার্থ চক্রবর্তী বললেন, মিসেস সেনের প্রশ্নের তাৎপর্যটা আগে আমাদের জানা দরকার!

পামেলা হাসল—তাৎপর্য গভীর নয়। আমি একরকম নেশার কথা জানি। তার সঙ্গে আপনারা পরিচিত কিনা তাই আমার জানা উদ্দেশ্য।

মণিময় সান্যাল প্রশ্ন করলেন, সেই নেসাব বস্তুটি কে?

মর্ণিমা।

এ নামের সঙ্গে সকলেই অপরিচিত।

দীপক বলল, এ নাম তো আগে শুনিনি?

না শোনারই কথা।—ডাঃ সেন বললেন, বছর দেড়েক আগে আমরা রেঙ্গুন গিয়েছিলাম। ওখানেই মর্নিমার বহুল প্রচার লক্ষ্য করি। টেস্ট করে দেখলাম, কোথায় লাগে এর কাছে অন্য কোন ড্রিঙ্ক। নেশা জমে ভাল, বলকারকও।

পামেলা বলল, নিয়মিত খেলে শরীরের শক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে।

পরিমল মুখার্জি বললেন, ভারতের মার্কেটে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না?

সেন বললেন, খোলা বাজারে পাওয়া না গেলেও, সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

সোমনাথ শুনেছিল দীপকের মুখে, এরা সকলেই জলপথে বিচরণকারী। এমন কি দীপকও মাঝে মধ্যে হুইস্কি টানে। ওর মনে হল, ডাঃ সেন ও পামেলা সকলকে যেন লোভাতুর করে তোলবার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য কি?

কিভাবে?

চোরাপথে কি না হয়? আমি কলকাতার একজনকে জানি, যে, মর্নিমা তৈরি করে। আমার প্রয়োজন হলে তার কাছ থেকে আনাই। কাছে আছে। আপনাদের দেব টেস্ট করতে।

এই সময় কথাবার্তায় ছেদ পড়ল। বাবুর্চি এসে জানাল খাবার তৈরি। বেলা সাড়ে তিনটেয় বেশ গুরুভোজনই হয়েছে। এই ক'ঘণ্টা পরেই খেতে যাওয়ার মত খিদে পাওয়ার কথা নয়। তবে জল-হাওয়ার গুণে ইচ্ছেটা আছে। সকলে উঠে পড়লেন।

খাওয়ার টেবিলে বসে আর মর্নিমার প্রসঙ্গ উঠল না।

কাল কিভাবে সমস্ত দিন কাটানো হবে তার প্রোগ্রাম চকআউট হতে লাগল। দুপুরে খাওয়ার সময় সোমনাথের সকলের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। ও লক্ষ্য করেছিল তখন পরিমল মুখার্জি কি যেন বলি বলি করেও বললেন না।

খাওয়া তখন শেষ মুখে, হঠাৎ মুখার্জি বললেন, আপনারা কি জানেন, কয়েক বছর আগে এখানে একটা খুন হয়েছিল?

সকলে মাথা নাড়লেন। কেউ জানেন না।

হত্যাকারী এই বাড়িতে উঠেছিল। যে খুন হয়েছিল, সেও উঠেছিল এখানে।

'খুন' কথাটার মধ্যে শঙ্কা মিশ্রিত আকর্ষণ আছে। সকলে ঘটনাটা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

পরিমল মুখার্জি বললেন, আমিও বিস্তারিত ভাবে কিছু জানি না। ঘটনাটা ঘটে যাবার দিন দশেক পরে আমি এখানে এসেছিলাম। এখন যে খানসামা আছে, তখনও সে ছিল। তারই মুখ থেকে ভাসা ভাসা শুনেছিলাম?

পামেলা কাঁপা গলায় বলল, কোন ঘরে খুন হয়েছিল? আমরা যে-ঘরে আছি, সেখানে নয় তো?

না। ইব্রাহিম বাবুর্চি গিয়েছিল এক পীরের কাছে। মাঝের পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় তিনি থাকেন। ফেরার পথে সে দেখে একজন আরেকজনকে গভীর খাদে ফেলে দিচ্ছে। দুজনেই তার পরিচিত। ইব্রাহিম ভয়ে ভয়ে পালিয়ে আসে। পুলিশকে জানায় না কথাটা জড়িয়ে পড়ার ভয়ে। তাছাড়া প্রমাণ কই, লাশ তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হত্যাকারী সেই দিনই টুরিস্ট লজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

পার্থ চক্রবর্তী বললেন, আমরা কি হত্যাকারীকে চিনি? সে কি বক্সারের অধিবাসী?

আপনি চেনেন কিনা জানি না। তবে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেনেন। ক্ষমা করবেন, নাম বলতে পারব না।

মণিময় সান্যাল বললেন, একজন হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে বেড়াবে, কারুর কিছু করার নেই?

পরিমল মুখার্জি হাল্কা গলায় বলল, সত্যি আর কিছু করার নেই। হত্যাকারীও মারা গেছে। অবশ্য তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। একেই বলে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া—

দীপক বলল, বেঁচে যখন নেই তখন আর নাম বলতে দোষ কি?

শিষ্টাচারে বাধছে নাই বা শুনলেন নাম! হত্যাকারী আমাদেরই মধ্যে একজনের আত্মীয়।

সকলে সবিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। কার আত্মীয় কয়েক বছর আগে একটি হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন—একথাই সকলের মনে দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। কিংবা পরিমল মুখার্জির এ এক ভাঁওতা। কোন খুনই হয়নি এখানে কোনদিন। মনগড়া কাহিনী বলে সকলকে ধাঁধায় ফেলেছেন।

কিন্তু বাবুর্চি ইব্রাহিম রয়েছে। শুধু প্রশ্ন করলে সে কিছু বলবে না জানা কথা। দু-চার টাকা গুঁজে দিলে হাতে, প্রকৃত সত্য কি উদ্ঘাটন করবে না? এরপর নীরবেই আহার পর্ব শেষ হল। কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। সকলে যে যার ঘরে চলে গেলেন রাতের মত। ছ'খানা ঘরের মধ্যে সস্ত্রীক ডাঃ সেন এবং দীপক ও পার্থ চক্রবর্তী দুখানা, বাকি চারখানা একক ভাবে অধিকার করেছেন মণিময় সান্যাল, সোমনাথা, স্নিগ্ধা ও পরিমল মুখার্জি।

ঘরে এসে সোমনাথ বড় আলোটা নিভিয়ে বেডরুম ল্যাম্প জ্বালল। কম্বলে মোড়া ভারি বিছানার ওপর বসল। ফায়ারপ্লেসের আগুন ঘরখানাকে গরম রেখেছে। ক্যামেল উলের জোড়া কম্বল দুটো তুলে বিছানায় শ্রান্ত দেহ ঢেলে দিল সোমনাথ। নানারকম চিন্তার মধ্যে মনে দুটো চিন্তা বিশেষ ভাবে ওঠানামা করছে। দীপক স্নিগ্ধা সম্বন্ধে কি ইশারা দিল আর পরিমল মুখার্জি কথিত হত্যাকারী কে?

ঘুম আসছে না চোখে। অথচ সকাল থেকে শরীরে ধকল কম যায় নি! বিছানায় এপাশ-ওপাস করেই মিনিট পঁয়তাল্লিশ কাটিয়ে দিল, তারপর উঠল বিছানা ছেড়ে। একটা সিগারেট খেয়ে আবার ঘুমের দেশে পাড়ি দেবে। আলনায় টাঙানো ওভারকোটের পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল। কিন্তু দেশলাই পাওয়া গেল না।

দেশলাই গেল কোথায়? একটু চিন্তা করবার পর মনে পড়ল, দেশলাই ফেলে এসেছে তাসের আসর যেখানে বসেছিল, সেই ঘরে। গায়ের ওভারকোট চাপিয়ে ও দেশলাই আনতে বেরোল ঘর থেকে।

করিডরে আলো নেই। বেশ অন্ধকার। সতর্কতার সঙ্গে সোমনাথ এগোল। বাঁকের কাছাকাছি আসতেই ওর গতি রুদ্ধ হল। বাঁকের মুখের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কারা চাপা উত্তেজিত গলায় কথা বলছে।

আপনি কোন সাহসে এই সময় এ-ঘরে এসেছেন?

ঘর খালি। পাখি উড়ল কোথায়?

সাট-আপ! যা জিজ্ঞেস করলাম তার উত্তর দিন।

উত্তর চাইলেই যে পাবেন তার কি মানে আছে? আপনি মাঝরাতে শালীর ঘরের সামনে ঘুরঘুর করছিলেন কেন জানতে চাওয়া কি আমার পক্ষে অন্যায়?

মুখ সামলে কথা বলবেন!

থাক, আর গলাবাজি করবেন না। আমি সব জানি। রোজগারের ভালো পন্থাই-তো বার করেছেন! আমার সামনে ঘোমটা টেনে লাভ কি?

সোমনাথ আর দাঁড়াল না।

দেখতে পাওয়া না গেলেও কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হয় দুজন লোক আছে ওখানে। গলার আওয়াজ চাপা হওয়ায় বুঝতে পারা যাচ্ছে না কারা ওরা। ও এধারের

দেওয়াল ঘেঁষে পা টিপে টিপে বাঁক পার হল। আরো কিছুদূর এগিয়ে লক্ষ্য করল খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে ঢুকতে গিয়েও ঢোকা হল না, ওখানেও কারা কথা বলছে।

হিন্দীতে কথা হচ্ছে

তুমি তাহলে নিজের চোখে দেখেছ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে?

হ্যাঁ।

হত্যাকারীর নাম আর কাউকে বলবে না। বললে বিপদে পড়বে।

আরো গোটা ত্রিশেক টাকা যদি দেন—

তা দিচ্ছি। কথাটা কিন্তু মনে থাকে যেন!

একজন ইব্রাহিম। দ্বিতীয়জনকে গলার আওয়াজে বুঝতে পারা গেল না। উঁকি মারতেও সাহস হচ্ছে না, আবার কৌতূহল দমন করতেও পারছে না সোমনাথ। উপায় নেই। ও আবার ফিরে চলল নিজের ঘরের দিকে। দ্বিতীয় লোকটির হিন্দী বলার কায়দা শুনে মনে হয় বাঙালি। তাই যদি হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াল বাইরের কেউ নয়।

বাঁকের মুখে এসে কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। তারা বোধহয় যে যার ঘরে চলে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে কয়েক পা এগিয়েই ওকে আবাব থামতে হল। একটা ঘরের একপাল্লা দরজা খোলা। আলোর ফালি এসে পড়েছে করিডরে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই নারী-পুরুষ। পামেলা ও ডাঃ সেন।

তীক্ষ্ণ গলায় পামেলা বলছে, এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

ডাঃ সেন আমতা আমতা করে বললেন, রাত এমন কিছু বেশি হয়নি—

তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমি জানতে চাই।

এ তোমার জুলুম। আমার এতটুকু স্বাধীনতা থাকবে না তার কি মানে আছে?

না, সে স্বাধীনতা তোমার নেই। ভুলে যেও না, তুমিও আমার অনেক স্বাধীনতা খর্ব করেছ। ভেবেছিলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, না? চুপি চুপি কাজ সারবে আর আমি বুঝতে পারব না—

চেঁচিয়ে আর সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দিও না! ঘরে এসো।

ডাঃ সেন ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। পামেলাও।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

রাজ্যের বিস্ময় সোমনাথের মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। ব্যাপার কী? আজ কি কেউ ঘুমোয় নি? কিসের ধান্দায় সকলে জেগে আছে? অবশ্য বিস্ময়ের তখনো অনেক বাকি ছিল। সোমনাথ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতে যাবে—

দরজা বন্ধ করবেন না।

কে!!

ঝটিতে সোমনাথ ফিরে দাঁড়াল। বেডরুম ল্যাম্পের আবছা আলোয় স্নিগ্ধাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এত রাত্রে স্নিগ্ধা এখানে! কেমন যেন সমস্ত গুলিয়ে যাচ্ছে।

কোনরকমে ওর গলা থেকে বেরিয়ে এলো : আপনি ?

স্নিগ্ধার গলাও কাঁপছে ; আমি জানতাম না এ ঘর আপনার—

আপনি কি আর কারুর ঘরে যেতে চেয়েছিলেন? কথাটা বলে ফেলেই সোমনাথ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

না, আমি খালি ঘর খুঁজছিলাম। দরজা খোলা দেখে মনে হয়েছিল এ ঘরখানা খালি।

আপনার ঘর রয়েছে, তা সত্ত্বেও...

আমি...মানে...

অত্যধিক সঙ্কোচ বা অন্য কোন বিশেষ কারণে স্নিগ্ধার শরীর বোধহয় কাঁপছিল। সে বসে পড়ল বিছানার ওপর ; কিছুই বলল না।

আপত্তি থাকলে বলবেন না।

আপত্তি...মানে...আমি আর পেরে উঠছি না। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে বাঁচাবেন সোমনাথবাবু?

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! এই গভীর রাত্রে প্রায় অপরিচিতা এক যুবতী ওর শয়নকক্ষে উপস্থিত। বসে আছে ওরই বিছানার ওপর। কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নাটকীয়।

আমাকে সমস্ত খুলে বলুন। সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় সাহায্য করব।

স্নিগ্ধা এতক্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে। সংযত গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ বেশি দিনের নয়, তবু কেন জানি না মনে হচ্ছে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। মেয়েরা কত দূর মরীয়া হয়ে উঠলে, একজন পরপুরুষের কাছে সাহায্য চায়, তা আপনি জানেন?

বিশেষ বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি। বলুন কি হয়েছে। দেখি যদি কিছু করতে পারি—

সমস্ত কথা খুলে বলার এ অবসর নয়, তাছাড়া সেকথা আপনাকে কোন দিন বলতে পারব কিনা সন্দেহ। বলুন, মণিময় সান্যালের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করতে পারবেন?

সোমনাথ অবাক হয়ে যায়। কি বলছে স্নিগ্ধা!

কি বলছেন? উনি আপনার ভগ্নিপতি—

ওরকম অর্থপিশাচ, জহ্লাদ ভগ্নিপতি দুনিয়ার আর কারুর বোধহয় নেই।

কিন্তু—

ভয় পেয়ে গেলেন?

ভয় পাইনি। আমি ভাবছি আপনি যা বললেন, তার প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে।

দুবার আমি চেষ্টা করেছিলাম ওর হাত ফসকে পালাবার। ধরা পড়ে গেছি। তাছাড়া ভয় হয়েছে, কোথায় যাব? চারদিকে পুরুষমানুষ। বলুন, আমায় সাহায্য করবেন? পাঠিয়ে দেবেন কোন উদ্ধার আশ্রমে?

সোমনাথের মনের মধ্যে হাজার বাতি জ্বলতে নিভতে আরম্ভ করেছে। সতি,

মরীয়া হয়ে না উঠলে কেউ এভাবে বলতে পারে না। অসমসাহসিকতার পরিচয় দেবার জন্য অগ্রসর হল ও।

আমি জানি না, মণিবাবু আপনাকে কি রকম বিপদে ফেলেছেন। তবে এটা ঠিক, সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছেন বলেই এইভাবে সাহায্য চাইছেন। অনেক বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হলেও আমি আপনাকে সাহায্য করব। তবে কোন উদ্ধার আশ্রমে আপনাকে পাঠাবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি অবশ্য আমার প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করবেন কিনা জানি না।

প্রস্তাব—?

আমি—বলতে আমার বাধছে—আপনাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। এতে মণিময়বাবুর হাত থেকে নিশ্চিত ভাবে রেহাই পাবেন।

কথাটা শেষ করতে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও সোমনাথের কান গরম হয়ে উঠল।

স্নিগ্ধা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মিনিটখানেক তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তারপর কোন রকমে বলল, স্ত্রীর মর্যাদা!

হ্যাঁ। স্নিগ্ধা—

বলুন?

ভাবাবেগে একথা আমি বলিনি। প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। বলো, আমার প্রস্তাবে সমর্থন আছে তোমার?

একটু চুপ করে থেকে স্নিগ্ধা বলল, এ হয় না সোমনাথবাবু, আপনার স্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার নেই।

যোগ্যতা আছে কি নেই, তার বিচারক তুমি নাই বা হলে!

না, না, এ হয় না। এ হবার নয়। আমায় ক্ষমা করবেন।—কথাটা শেষ করেই স্নিগ্ধা দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হতভম্ব সোমনাথ দাঁড়িয়ে রইল। নাটকীয়ভাবে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, পরিসমাপ্তিও ঘটল নাটকীয়ভাবে। এইভাবে চলে গেল কেন স্নিগ্ধা, সোমনাথ ভেবে পাচ্ছে না। স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েও তো তাকে চরমভাবে সাহায্য করতে চেয়েছে। মণিময়বাবু কি ধরনের অত্যাচার করছেন জানে না। তাঁর হাত থেকে পালিয়ে সহস্র জোড়া লালসার হাতের মধ্যে গিয়ে পড়া থেকে তাকে সম্মানজনকভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যই তো ব্যক্ত করেছে। তবে কেন রাজি হল না?

সাহায্য নিতে এসে সাহায্য না নিয়ে চলে যাবার অর্থ কি? যুগে যুগে নারীর এই এক রূপ। বিচিত্র স্বভাব—প্রকৃতপক্ষে সে কি চায় নিজেই জানে না। শাস্ত্রকাররা ঠিক কথাই বলে গেছেন

সোমনাথ ওভারকোট খুলে খাটের ওপর এসে বসল। অবশ্য দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। এক অজানা ভয় মনের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। ওর এই প্রস্তাবের কথা স্নিগ্ধা কাউকে বলে দেবে না তো? ও কি চরম বিদ্রূপের খোরাক হতে চলেছে? সোমনাথ কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করল আর কি ঘুম আসবে? চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলে তবে তো ঘুম। সোমনাথের জীবনে এ-রকম রাত আর কখনও কাটেনি। ও বেডরুম ল্যাম্পের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল।

প্রবল দরজা-ধাক্কায় সোমনাথের ঘুম ভাঙল। ও দ্রুত উঠে বসল বিছানায়। জানলার কাচের পাল্লা ভেদ করে রোদ্দুর ঘরে প্রবেশ করেছে। বহুক্ষণ জেগে থাকার পর ভোর-রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালিশের পাশে রাখা রিস্টওয়াচে দেখল, সাড়ে আটটা। অনেক বেলা হয়ে গেছে তো! বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দিল।

দীপক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘরে না ঢুকেই দীপক বলল, ব্যাপার কি, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ?

হেসে সোমনাথ বলল, নতুন জায়গা বলে ঘুম আসতে চায়নি প্রথমে। তাই বেলা হয়ে গেল উঠতে।

তৈরি হয়ে নাও। আমরা বেরুচ্ছি।

আমার ভাই একটু দেরি হবে। দাড়ি কামাবো, ব্রেকফাস্ট আছে—

তাহলে তুমি পরে পাহাড়ের দিকে এস, আমরা এগোই।—দীপক চলে গেল।

সোমনাথ গেল বাথরুমে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাথরুম থেকে ফিরল ও। কিচেন থেকে এক বাটি গরম জল এনে দাড়ি কামাতে বসল। দাড়ি কামানো শেষ হল এক সময়। জামাকাপড়ে ফিটফাট হয়ে নিল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর। একটা ভাঁজ-করা চৌকোণা কাগজ রাখা রয়েছে। কাগজের ওপরের অংশে কালী দিয়ে নাম লেখা। চিঠি নাকি? কাল তো ছিল না! কাগজটা তুলে নিল। চিঠিই। সাগ্রহে সোমনাথ পড়ল ঃ

মান্যবরেষু,

আজ সকালেই আপনাকে চিঠি লিখতে হবে ভাবিনি। কিভাবে যেন জামাইবাবু জেনে গেছেন, কাল রাত্রে আমি আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। তিনি সাঙ্ঘাতিক চটে গেছেন। আপনাকে অপমান করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আপনি আর সময় নষ্ট না করে এখান থেকে চলে যান। আমার বিশেষ অনুরোধ

—স্নিগ্ধা

সোমনাথ দুবার চিঠিখানা পড়ল। যখন বাথরুমে গিয়েছিল, সেই সময় চিঠি রেখে গেছে স্নিগ্ধা। এখন ওর কর্তব্য কি? অনেক চিন্তার পর স্থির করল এখান থেকে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। মণিময় সান্যাল যদি সকলের সামনে ওকে অপমানিত করেন, তা স্বাস্থ্যকর হবে না।

দ্রুতহাতে সুটকেশ গুছিয়ে নিল। বিশেষ কাজ মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ চলে যাচ্ছে বলে দীপককে চিঠি লিখল। ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে ইব্রাহিমের কাছে খোঁজ-খবর নিতেই জানা গেল, কুলীর মাথায় সুটকেশ চাপিয়ে মাইল দুয়েক হেঁটে যাবার পর বাসের স্টপেজ পাওয়া যাবে। ঘণ্টা তিনেক অন্তর বাস আসে। এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

সোমনাথের কথায় ইব্রাহিম একটা পাহাড়িয়া কুলি ডেকে আনল। ও রওনা হবার আগে দীপকের চিঠিটা ইব্রাহিমের হাতে দিয়ে গেল। তারপর পথের ক্লেশ সহ্য করে যখন বক্সারে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

বাড়িতে পা দিয়েই এক মর্মন্তুদ সংবাদ পেল সোমনাথ। প্রিন্স বেঁচে নেই। গতকাল

দুপুরে মারা গেছে। তাকে বাগানের বকুলগাছতলায় পুঁতে রাখা হয়েছে। রামজীর দৃঢ় ধারণা বিষ মাখানো মাংস কেউ বাগানে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাই খেয়ে প্রিন্স মারা গেছে। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল সোমনাথের। পাঁচ বছর এ-বাড়িতে ছিল প্রিন্স। পরিবারের একজন ছাড়া তাকে আর কিছু ভাবা হত না। রামজীর ধারণা কি সত্যি। প্রিন্সকে বিষ খাইয়ে মেরে কার লাভ হল? সোমনাথ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে। সময় ওর সত্যি ভাল যাচ্ছে না।

দিন ছয়েক কেটে গেছে। কার্মনচক থেকে পার্টি ফিরে এসেছে। দীপকের সঙ্গে সোমনাথের দেখা হয়েছে। হঠাৎ চলে আসার জন্য অনুযোগ জানিয়েছিল দীপক। ওর অনুপস্থিতিতে মণিময় সান্যাল সোমনাথ সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছেন কিনা জানবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হল।

সোমনাথ খবর কাগজের পাতা উল্টেপাল্টে সবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বাহাদুর কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়াল। কিছু বলতে চায় বোধ হয়।

কিছু বলবে বাহাদুর?

আমি বাড়ি যাব সাহেব।

বাড়ি যেতে চাও! হঠাৎ?

তার এসেছে। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভাল নয়।

বাহাদুর টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে দিল। সোমনাথ পড়ে দেখল প্রেরিত সংবাদ তাই বটে। এক্ষেত্রে ওকে ছুটি দেওয়াই মানবিকতা।

বেশ, তুমি যাও। স্ত্রী ভাল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চলে এসো। তোমার ট্রেন কটায়?

সাড়ে আটটায় সাহেব।

সময় তো হয়ে এলো। এক মাসের মাইনে আগাম নিয়ে যাও।

সোমনাথ টাকা এনে দেবার পর বাহাদুর চলে গেল। বাহাদুরকে ওখান থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা আনতে বললে ভাল হত। ও তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে বাহাদুরকে ডেকে কথাটা বলতে যাবে—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, গেটের সামনে রিক্সা থেকে স্নিগ্ধা নামছে।

স্নিগ্ধা!! কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

দিনের বেলা গেট বন্ধ থাকে না, ভেজিয়ে রাখা হয়। গেট পেরিয়ে স্নিগ্ধা মন্থর পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। তার সুন্দর মুখে মলিন ছায়া। মাথার তেলহীন চুল অবিন্যস্ত। কপালের ডান পাশে কালো একটা দাগ। মনে হয় কিছু দিয়ে আঘাত লেগেছে।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্নিগ্ধাব দ্'চোখ সীমাহীন ক্লান্তি। সোমনাথের দৃষ্টিতে তীব্র ব্যগ্রতা।

স্নিগ্ধা—

বাড়ি খুঁজে পেতে আমার অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে!—যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল স্নিগ্ধার গলা।

তুমি আমার বাড়িতে আসবে, আমি কখনো চিন্তাও করিনি।

আমি নিরুপায় হয়ে এসেছি. দেখছেন, আমার কপালে জামাইবাবু কি এঁকে দিয়েছেন?

তোমায় মেরেছেন নাকি?

এই প্রথমবার নয়।

এসো, ঘরে এসো।

দুজনে ঘরের মধ্যে এলো।

ওদের কথা আরম্ভ হবার আগেই বাইরে গোলমালের আওয়াজ পাওয়া গেল। রামজী ও আরেকজনের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে কথা হচ্ছে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারা গেল রামজী একজনকে বাধা দিচ্ছে ভেতরে আসতে।

সোমনাথ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ওকে দেখেই মণিময় সান্যাল নিজের বিশাল শরীরকে যতদূর সম্ভব দ্রুত চালিত করে এগিয়ে এলেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি।

কি চাই আপনার?

স্নিগ্ধা এখানে এসেছে আমি জানি—

হ্যাঁ, এসেছে।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল স্নিগ্ধা। জামাইবাবুকে দেখে তার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। ওই লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বলে তো কিছু নেই। এখন কি করে বসে কে জানে?

টেনে টেনে হাসলেন মণিময় সান্যাল।

চমৎকার! অনাত্মীয়া যুবতীদের বাড়িতে স্থান দেওয়া সব সময় আইনসঙ্গত নয়, তা কি আপনি জানেন?

আইন বোঝাবার পরিবর্তে আপনার যদি আর কিছু বলবার থাকে, তাহলে তাই বলুন।

প্রেমে পড়ে গেলে মানুষ ভাল কথায় কান দেয় না শুনেছি। কিন্তু প্রেম করার পাত্রীটির উপযুক্ততা সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি?

কি বলতে চাইছেন?

বিধবা—স্নিগ্ধা আমার বিধবা শালী মশাই!

বিধবা!!

সোমনাথের বুকে কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। লোকটা বলে কি? উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কথাটা বলেনি তো? যা বলেছে তার মিথ্যার সম্পর্ক নেই।

কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না বুঝতে পারছি। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না, আমি সত্যি কথা বলেছি কিনা—

আপনার বলা শেষ হয়েছে?

কই আর হল। ওর গুণ কি একটা মশাই! ওরকম নষ্ট মেয়েমানুষ এই শহরে আর দ্বিতীয় নেই।

মণিময়বাবু!

ও বাবা আপনি যে রেগে উঠছেন! যাক, এত কথায় আমার কাজ কি? স্নিগ্ধাকে ডেকে দিন—

তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।

আপনি তার গার্জেন নন। গার্জেন আমি।

মিথ্যে কথা বাড়াচ্ছেন চাকর ডাকবার আগেই আপনি এখান থেকে চলে যাবেন এই আমি চাই।

ফেটে পড়লেন মণিময়। বললেন, আমাকে ঘাঁটিয়ে ভাল করলেন না। আমি যাচ্ছি, কিন্তু শিগগিরই বুঝতে পারবেন মণি সান্যাল কতদূর হিংস্র হতে পারে।

রাগে ফুলতে ফুলতে তিনি চলে গেলেন।

সোমনাথ এসে দাঁড়াল স্নিগ্ধার সামনে।

স্নিগ্ধা নতমুখে ধরা গলায় বলল, এখানে এসে ভাল করিনি। আমার জন্য আপনি বিপদে জড়িয়ে পড়ছেন।

সান্যাল যা বলে গেল তা কি সত্যি?

উনি মিথ্যা বলেননি।

তারপর তীক্ষ্ণ গলায় স্নিগ্ধা বলল, আমি বিধবা। সত্যিই আমি নষ্ট হয়ে গেছি সোমনাথবাবু! ভদ্রভাবে জীবন কাটাবার লোভে আপনাকে প্রতারিত করতে এসেছিলাম। আমি যাই—

যাওয়া এখন তোমার হবে না। বসো ওখানে। আমি সমস্ত কথা শুনতে চাই।

সে এক দীর্ঘ নোংরা ইতিহাস। কি করবেন শুনে?

গম্ভীর গলায় সোমনাথ বলল, আমাকে উত্ত্যক্ত করো না স্নিগ্ধা। প্লিজ-প্লিজ, বলো সব কথা।

একটু চুপ করে থেকে স্নিগ্ধা আত্মগত ভাবে বলল, আমার আবার লজ্জা! বেশ, বলছি।

এরপর একটি অসহায় নারীকে নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে, তার মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করল। সেই কাহিনীর সারাংশ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে।—স্নিগ্ধার চেয়ে তার দিদি বছর আটেকের বড। তার বিয়েও হয়েছিল অনেক আগে। বাবা বেঁচে নেই। স্নিগ্ধা মা'র সঙ্গে থাকত টালিগঞ্জের অতি সাধারণ একটা ঘরে। মা কাজ করতেন এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। দিন কেটে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধা ম্যাট্রিক পাশ করল আঠারো বছর বয়সে—বিয়েও হল তার সেই বছর। স্বামী সওদাগরি অফিসে কাজ করে। মেয়ে সুন্দর হওয়ায় দাবী না করেই বিয়ে হয়েছে। বছরখানেক মোটামুটি ভাল ভাবেই কাটল। তারপরই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন স্বামী। এ শোকে সান্ত্বনা নেই। শুধু সহ্য করে যেতে হবে। মুখ বুজে পড়ে রইল শ্বশুরবাড়িতে। সহস্র গঞ্জনাতেও সে রা কাড়ত না, তা সত্ত্বেও সেখানে সে থাকতে পেলো না। জোর করে একদিন স্নিগ্ধাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাপের বাড়ি এবং একথাও জানিয়ে দেওয়া হল ও-বাড়ির দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হল।

কথায় আছে, দুর্ভাগ্য যখন পিছু নেয়, তখন তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া

কঠিন। মা'র কাছে আসার তিন মাস পরে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। রোগজীর্ণ শরীর নিয়েই তিনি আপ্রাণ ভাবে বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। শরীরে কত আর ধকল সহ্য হবে! স্নিগ্ধা চোখে অন্ধকার দেখল। এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে। আয়ের তো কোন পথ নেই। যাই হোক, অকূলে ভাসতে হল না, জামাইবাবু মণিময় এসে প্রস্তাব দিলেন, সে বক্সারে গিয়ে থাকতে পারে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই দিদি নিউরাইটিসে পঙ্গু। ওখানে গেলে মণিময়ের সংসারে সুবিধা হয়।

এই প্রস্তাবে স্নিগ্ধা রাজী হয়ে গেল। বক্সারে এসে দেখল, দিদি বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছেন। কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না, গলা দিয়ে শুধু ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয়। সংসার নিয়ে উঠে-পড়ে লাগল স্নিগ্ধা। তখনো সে জানে না কোথায় এসে পড়েছে। তিনদিন পরে মণিময় নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। মাঝরাত্রে স্নিগ্ধার ঘরে প্রবেশ করে জড়িয়ে ধরলেন। বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছিল কিন্তু ক্ষুধার্ত দানবকে নিরস্ত করার সাধ্য তার কোথায়?

তারপর—? তারপর প্রতিটি রাত্রে মণিময়ের দাবী পূরণ করেছে স্নিগ্ধা। এ ছাড়া উপায় কি? কোথায় যাবে। মন না চাইলেও এ জীবনকে মেনে নিতে হবে। এইভাবে কিছুদিন চলবার পর মণিময়ের নতুন রূপ প্রকাশ পেলো। তিনি একদিন বাড়ি নিয়ে এলেন একজনকে, এবং তার সঙ্গে স্নিগ্ধাকে রাত কাটাতে বাধ্য করা হল। মাঝে মাঝে এইভাবে লোক আসে। স্নিগ্ধা বুঝতে পারে অর্থপিশাচ মণিময়ের অর্থ সংগ্রহের এ এক নতুন উপায়। কিন্তু তার কিছু করার নেই—সে শুধু নিরুপায় নয়, অসহায়ও।

মণিময়ের চেষ্টাতেই কার্মনচক যাবার পরিকল্পনা সকলে গ্রহণ করেছিল। সেখানে প্রদীপের মত জ্বলবে স্নিগ্ধা, পতঙ্গরা আসবে আর পুড়ে মরবে। এই ফাঁকে মুঠো মুঠো টাকা পকেটস্থ করবেন মণিময়। এ-কাজে স্নিগ্ধার মন আর সায় দেয়নি। যা হবার হবে—সে মরীয়া হয়ে উঠল। তাই সেদিন রাত্রে ডাঃ রাজীব সেন লোভে হিসহিস করতে করতে যেই ঘরে ঢুকেছেন, স্নিগ্ধা তাঁকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অজান্তে নয়—দরজা খোলা পেয়ে জেনেশুনে সে সোমনাথের ঘরে ঢুকেছিল। কারণ সোমনাথের চোখের ভাষা পড়তে পেরেছিল সে। ওই পুরুষটি তাকে চায়। তবে এই চাওয়ায় স্বর্গীয় ভাব আছে। এত ঘটনার পরও স্নিগ্ধার মন একটি শান্তির সংসারে বাধ্য স্ত্রী হয়ে থাকবার জন্য উন্মুখ। তাই সাহায্য পাবার অছিলায় সোমনাথের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার জন্য নিজের সব কিছু ভুলে গিয়ে ওর ঘরে প্রবেশ করেছিল।

সোমনাথ বিয়ের প্রস্তাব করতেই তার মনে ধিক্কার গুমগুমিয়ে উঠল। একি, একজনের সুস্থ জীবনকে সে নষ্ট করে দিতে চলেছে! তাই প্রস্তাবে রাজী হতে পারেনি। সে সোমনাথকে ভালবেসে ফেলেছে, মণিময় বুঝতে পেরেছিলেন। কার্মনচক থেকে ফিরে এসেই অত্যাচার আরম্ভ হল। মণিময় পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ভালবাসার জন্য যদি ডাঃ সেনের মত মক্কেলকে ভবিষ্যতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাকে গুলি করে মারা হবে।

স্নিগ্ধার শরীর ও মন আর সহ্য করতে পারছিল না এই অবস্থাকে। সোমনাথের

ভালোব জন্যই ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আব রাখবে না—এ প্রতিজ্ঞা কোথায ভেসে গেল। প্রথম সুযোগেই সে এখানে চলে এল। কেন চলে এল তা নিজেও জানে না। এক অন্ধ আবেগ তাকে টেনে নিযে এসেছে এ বাড়িতে।

বহুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

তারপর—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নিগ্ধা বলল, স্বার্থপবেব মত কাজ করতে গিয়ে আমি আপনাকেও বিপদে ফেললাম। জামাইবাবুব অসাধ্য কিছু নেই—

আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

সোমনাথ জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

স্নিগ্ধা আসন ছেড়ে উঠে দরজাব দিকে এগিযে গেল।

কোথায় যাচ্ছ?

জানি না।

তোমার যাওযা হবে না—

আমার কথা তো সব শুনলেন। এবপরও থাকতে বলছেন?

হ্যাঁ।

না—না—

সোমনাথ এগিয়ে এসে স্নিগ্ধাব হাত ধবল।

কেন বুঝতে পাবছ না, তোমাকে বাদ দিযে আমার চলবে না—চলতে পারে না!

কেন অবুঝের মত কথা বলছেন? দাগধবা আমাব চরিত্র। আপনাকে দেবার মত আমার কিছু নেই।

আছে, সব আছে। যা হয়ে গেছে, তাব কথা নাই বা মনে রাখলে। নতুন করে তোমার জীবন আরম্ভ হবে—সেখানে কোন অভিযোগ কোন মালিন্য থাকবে না। আমরা সুখী হবো তুমি দেখে নিও।

স্নিগ্ধার দু'চোখ ছাপিয়ে অজস্র জল গডিযে পড়ল।

আমি.. আমি...

সোমনাথ তাকে কাছে টেনে নিল।

কথা বলো না। কেঁদে নাও; মন হাল্কা হবে।

আমি কাঁদতে চাই নি। কিন্তু

স্নিগ্ধা!

পরে তোমার অনুতাপ হবে দেখে নিও;

জোরে হেসে উঠল সোমনাথ। প্রাণখোলা হাসি।

পরে অনুতাপ হয়েছে, এমন কাজ আজ পর্যন্ত আমি করি নি।

বেলা দুটোর পর সোমনাথ কলেজে বেরুল। কলেজে যাবার ইচ্ছে ছিল না, স্নিগ্ধার

সান্নিধ্যে থাকতে চাইছিল মন। তাছাড়া কয়েক দিনের মত তার অন্যত্র থাকারও একটা ব্যবস্থা করতে হত। বিয়ের আগে এক বাড়িতে দুজনের থাকাটা ঠিক নয়। অবশ্য স্নিগ্ধাকে কোথায় রাখবে তা এক রকম স্থির করে ফেলেছে। প্রৌঢ়া সুজয়া বসু—বাংলার প্রফেসার। ওকে বিশেষ স্নেহ করেন। মনে হয় অনুরোধ রাখবেন। কলেজ কামাই করা গেল না, শুধু আজ টেস্ট পরীক্ষার খাতা জমা দেবার শেষদিন বলে। স্নিগ্ধা এখন অনেকটা সহজ হয়েছে। রামজীকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরুল।

প্রথমে কলেজ গেল না; গেল দীপকের মোটর গ্যারেজে। ওর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া ভাল। সমস্ত কথা গিয়ে জানাল দীপককে। পার্থ চক্রবর্তী কি একটা কাজে ওখানে এসেছিলেন; তিনিও শুনলেন। সোমনাথ দুজনের কাছে জানতে চাইল মণিময় কিভাবে তাকে বিপদে ফেলতে পারে। অবশ্য স্নিগ্ধার চারিত্রিক দিকটা মোটেই তুলে ধরেনি।

পার্থ চক্রবর্তী বললেন, মেয়ে যখন সাবালিকা এবং স্বেচ্ছায় এসেছে তখন আইন আপনার দিকে। অবশ্য এরপরও কেস হয়। তবে আমার মনে হয় না, গলগ্রহ শালীর জন্য মণি সান্যাল কোর্টকাছারি করবে।

দীপক বলল, পুলিশের কাছে বা কোর্টে যাবার পাত্রই নয় সান্যাল। হুমকি একটা দিতে হয় দিয়েছে। অবশ্য জেদ বজায় রাখতে গিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে পথে ঘাটে তোমাকে মার দেওয়াতে পারে।

দেখা যাক।

মৃদু হেসে দীপক বলল, তুমি যদি মার খাও আমরা দুঃখিত হব। তবে ভাই বিয়ের পর আমাদের একপেট পোলাও খাওয়াতে ভুলো না।

হেসে সোমনাথও বলল, বেশ তো।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ও কলেজে চলে গেল। কাজকর্ম সারতে সাড়ে চারটে প্রায় বাজল। ইতিমধ্যে সুজয়া দেবীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি স্নিগ্ধাকে কয়েকদিন নিজের বাড়িতে রাখতে রাজি হয়েছেন। বাড়ি পৌঁছল পাঁচটার সময়। গেটের কাছে দেখা হল রামজীর সঙ্গে। উত্তেজিত ভাব-ভঙ্গিতে সে কোথাও যাচ্ছিল। ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

উত্তেজনা চাপবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে সে বলল, আমি আপনাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম বাবু। বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে?

কি হয়েছে?

আমি বাজারে বেরিয়েছিলাম। এই ফাঁকে দিদিজীকে কে সাঙ্ঘাতিকভাবে মেরে চম্পট দিয়েছে।

সেকি! আমি দেখছি—তুমি ডাঃ শ্রীবাস্তবকে এখুনি ডেকে নিয়ে এস।

সোমনাথ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। না, ওর ঘরে স্নিগ্ধা নেই। তাকে পাওয়া গেল বিজনবাবুর ঘরে। ডিভানের ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে; মুখে রক্তারক্তি। এখনও রক্ত পড়ছে। মনে হয়, আঘাত করা হয়েছে অল্প কিছুক্ষণ আগে।

সোমনাথ স্নিগ্ধাকে দু-হাত দিয়ে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল। কে এইভাবে স্নিগ্ধাকে আহত করে গেল। মণিময় সান্যাল এসেছিলেন নাকি? এই কাজ কি তাঁর? সে চিন্তা পরেব, আগে ওকে সুস্থ করে তোলা দরকার। আঘাতের দরুণই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে মনে হয়। সোমনাথ মুখে জলের ছিটে দিল কয়েকবার। ভ্রূর ওপর আঘাত করা হয়েছে। বোধহয়, আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

ডাঃ শ্রীবাস্তব এসে পড়লেন। বিজ্ঞ, প্রবীণ চিকিৎসক। স্নিগ্ধাকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে ফেলতে তাঁর পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগল না। বলকারক ওষুধের ব্যবস্থা করে, পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

ঘটনাটা এবার জানতে পারা গেল।

রামজী বাজারে বেরিয়ে যাবার পর স্নিগ্ধা বিজনবাবুর ঘরে ঢুকেছিল অগোছালো ঘর ক'খানা গুছিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জিনের মত মণিময় সেখানে উদয় হলেন। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে জেদ করতে লাগলেন। স্নিগ্ধা দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করায়, হঠাৎ ছোট একটা টুল তুলে তার মাথায় আঘাত করেন।

স্তম্ভিত সোমনাথের শুধু মনে হয়, এরা মানুষ না আর কিছু। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতেও বাধে না? এরকম চলতে দেওয়া যায় না, কিছু একটা করতেই হবে। বর্তমানে যা করণীয় সোমনাথ সেই বিষয়েই এখন মন দিল। চিঠি লিখে রামজীকে পাঠাল সুজয়া বসুর বাড়িতে। তিনি কি এই পরিস্থিতির দরুণ এ-বাড়িতে রাত কাটাতে আসতে পারবেন? এ কথাও লিখেছে, তিনি নিজে না আসতে পারলে তাঁর ঝি'কে পাঠিয়ে দিলেও কিছু কাজ হবে।

শহরের মুখে জাতীয় সড়কের ওপর 'হাইওয়ে পাম্পস্টেশন'। ছবির মত সাজান পেট্রোল পাম্পটি। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত কাচের দেওয়াল। অফিস ঘরের সমস্ত কিছু বাইরে থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। অফিসের পিছনের ছোট ঘরটি প্রোপ্রাইটার চেম্বার। 'হাইওয়ে পাম্প-স্টেশনে'র সুনাম আছে। চারজন কর্মী সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত অজস্র গাড়ি অ্যাটেণ্ড করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

প্রোপ্রাইটার চেম্বারে মণিময় সান্যাল গদি-আঁটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। টেবিলের ওপর কাচের গেলাসে তামাটে রঙের পানীয় রাখা হয়েছে। তিনি গেলাস তুলে নিয়ে কয়েক চুমুক পান করলেন। ঘরে দু-দিকে দরজা। একটি দিয়ে অফিস ঘরে যাওয়া যায়। অন্যটি হল পিছনের গলিতে যাওয়ার পথ। ওই পথ দিয়েই মণিময় যাওয়া-আসা করেন।

গেলাসের পাশে পড়েছিল-কাঠের একটা টুকরো। ইঞ্চি দশেক হবে। বেড় প্রায় চার ইঞ্চি। গেলাস নামিয়ে তিনি কাঠের টুকরোটা কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেন। তাঁর চোখ জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ড্রয়ার খুলে তার মধ্যে রাখলেন টুকরোটা।

এই সময় গলির দিকের দরজায় করাঘাত হল। মণিময় তাড়াতাড়ি গেলাসটা টেবিলের ওপর থেকে নিচে নামিয়ে রাখলেন।

আসুন।

ডাঃ রাজীব সেন ঘরে ঢুকলেন।

হঠাৎ জরুরি তলব?

কথা আছে। আরো কয়েকজনকে ডেকেছি। বসুন।

ডাঃ সেন আসন গ্রহণ কববার পর, মণিময় মাটি থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর আবার রাখলেন। কৈফিযতের সুরে বললেন, আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ এসেছে।

ডাঃ সেন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, কেমন লাগছে মর্ণিমা।

চমৎকার। বেশ টেস্টি পানীয়র সন্ধান আপনি দিয়েছেন।

আমার ভাল লেগেছিল বলেই তো আপনাদের বললাম।

কাল আমার আরেক বোতলের দরকার হবে।

পাবেন।

গেলাসের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মণিময় বললেন, জিনিস যেমন ভাল, দামও তেমনই আকাশ ছোঁয়া।

অ্যাস্ট্রেতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ডাঃ সেন বললেন, দাম বেশি হবে বৈকি। প্রিপারেশনে কস্টলি মেটিরিয়াল লাগে। তাছাড়া কলকাতা থেকে আনাতে খরচ পড়ে। কাজেই—

এবার ঘরে এলেন পরিমল মুখার্জি। তারপর পার্থ চক্রবর্তী। সবার শেষে দীপক ঘরে এল। সকলের মুখে জিজ্ঞাসু ভাব। এই সময় অফিস ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে সশব্দে সাতটা বাজল। সন্ধ্যা সাতটা।

আপনাদের ফোন করে এখানে টেনে আনার জন্য আমি মর্মাহত। অবশ্য ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত—মণিময় একটু থেমে বললেন, তবে আমি আপনাদের পরামর্শ নিয়েই এগুতে চাই। আপনারা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। এ সময় আপনারা ছাড়া আমায় আর কে পরামর্শ দেবে!

পার্থ চক্রবর্তী বললেন, কি হয়েছে বলুন তো?

আমি অবশ্য এর জন্য দীপকবাবুকেই দায়ী করব। তিনি তাঁর বন্ধুকে কার্মনচকে নিয়ে না গেলে এই কেলেঙ্কারি ঘটত না। আমার শালী স্নিগ্ধাকে আপনারা দেখেছেন। সে গিয়ে এখন সোমনাথের খপ্পরে পড়েছে।

পার্থ চক্রবর্তী ও দীপকের ব্যাপারটা জানা ছিল। সোমনাথের মুখ থেকে দুজনের শোনা। এই ব্যাপারে সকলকে ডেকে পরামর্শ নিতে যাওয়ার মত ছেলেমানুষি তিনি কেন করলেন বোঝা গেল না। পরিমল মুখার্জির ও ডাঃ সেনের এত কথা জানা ছিল না।

উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন মুখার্জি, খপ্পরে পড়েছে বলে আপনি কি বোঝাতে চাইলেন?

স্নিগ্ধা এখন তার বাড়িতে মশাই। কার্মনচকেই দুজনে দুজনের প্রেমে পড়েছিল। বোকা মেয়েটা এখন তার কথায় উঠতে বসতে আরম্ভ করেছে।

বলেন কি?—ডাঃ সেনও কম উত্তেজিত হননি।—এতদূর গড়িয়েছে! এ তো রীতিমত কেলেঙ্কারী!

আমার মান-সম্মান আর শহরে কিছু রইল না। তাই তো আপনাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি, কি করা যায়।

মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে যে তিনি স্নিগ্ধাকে বেশ ঘা' কতক দিয়ে এসেছেন, তার উল্লেখ করবেন না বুঝতে পারা গেল। দীপক কোন মতামত দেবে না স্থির করল। দেখাই যাক না, সোমনাথের বিরুদ্ধে কি করার পরামর্শ এরা দেয়।

চক্রবর্তী বললেন, সাবালিকা মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় চলে গেছে, তখন তো আর আপনার কিছু করবার রইল না।

পরিমল বললেন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন। আইনের সাহায্য যদি নিতে চান, আরো হ্যাঙ্গামাতে আপনিই জড়িয়ে পড়বেন।

মণিময় ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, না না, ও-সমস্ত ব্যাপারে আমি যেতে চাই না। কিন্তু এতবড় অপমানটা মুখ বুজে সহ্য করে যাব? আমি কি করব আপনারা বলুন?

কি বলবেন কেউ ভেবে পেলেন না। এ এমন একটা ব্যাপার যাতে কোন মতামত দেওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাছাড়া আরেকটা কথা আছে, এ বিষয় নিয়ে এইভাবে ঢাক পিটিয়ে আলোচনা কবতে যাওয়াটা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি!

কেউ কিছু বলছে না দেখে মণিময় সান্যাল আবার বললেন, আপনারা চুপ করে রয়েছেন! আমি কিছু একটা না করলে লোকটা আমাকে আরো বিপদে ফেলতে পারে।

পরিমল মুখার্জি বললেন, আমার তা মনে হয় না।

মনে হয় না কেন?

তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে। আপনার শালীকে সে হয়তো বিয়ে করতে চায়। নতুন ঝামেলা ডেকে এনে তার লাভ কি? তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। আপনি কিছু না মনে করলে বলতে পারি।

বেশ। বলুন?

না, থাক।

থাকবে কেন? বলুন।

পরিমল একটু থেমে থেমে বললেন, আপনার শালী তো তেমন নিষ্ঠাবতী নয়। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন—তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। সব জেনেও যদি কেউ তাকে নিজের করে পেতে চায়, এতে তো আপনার খুশি হবার কথা। তা নয়—

প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মণিময়, আপনি কি সমস্ত যা-তা বকছেন!

ঠিক এই সময় গলির দিকের দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে প্রবেশ করল সোমনাথ। সকলে হতবাক হয়ে গেলেন। তার এই সময় এখানে আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সকলে এক সঙ্গে যে-যার আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল, সোমনাথের রক্তাভ উত্তেজিত মুখের ওপর। সকলের সামনেই এইবার বুঝি কিছু ঘটবে। মণিময় কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও বললেন না।

সেই থমথমে অবস্থার মধ্যেই হঠাৎ আলো নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকার মুহূর্তের

মধ্যে ঘরখানাকে গ্রাস করল। সকলের সম্বিত ফিরে এসেছে। অর্থহীন কোলাহল—আলো—আলো—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে এই সময় পর পর দুবার রিভলবারের শব্দ চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তুলল। অন্ধকারের মধ্যেই সকলে দেখলেন দুবার আলোর ঝলকানি। শুনলেন চাপা আর্তনাদ, গুরুভার কিছু পতনের শব্দ। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগেনি।

ঘরের মধ্যে তখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সুইচ বোর্ডের সন্ধানে সকলেই তৎপর হওয়ায় নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি খাচ্ছেন। যাঁরা সিগারেট খান এতক্ষণে দেশলাই বার করেছেন। মনেই পড়েনি দেশলাইয়ের কথা। কাঠি জ্বালতেই সুইচ বোর্ডের দেখা পাওয়া গেল। দীপক সুইচ অন করে আলো জ্বালল।

আলোয় ঘর ভরে যাবার পরই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য সকলের চোখে ধরা দিল। টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মণিময় সান্যাল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারধার।

কে কি করবেন ভেবে পেলেন না। সকলের আগে ডাঃ সেন নিজেকে সামলে নিলেন। এখন তাঁর কর্তব্যই সবচেয়ে বেশি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন মণিময়ের দিকে। দেহ পরীক্ষা করতেই মুখ কালো হয়ে উঠল। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঠাণ্ডা গলায় ডাক্তার বললেন, মারা গেছেন।

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল, মারা গেছেন!

হ্যাঁ।

কি অদ্ভুত। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে যে লোক বেঁচেছিল, বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, সে আর নেই। তাকে কে গুলি করে মেরেছে? নির্মম নিয়তি।

ডাক্তার আরো বললেন, যদিও আমি সেণ্ট পারসেণ্ট সিওর, তবু বডি হাসপাতালে পাঠিয়ে...

তাঁকে বাধা দিয়ে সোমনাথ বলল, এখন পুলিশে খবর দেওয়াই উচিত কাজ হবে।

দীপক বলল, আমারও তাই মত। বডি সরাবার অপরাধে পুলিশ আমাদের ওপর সিরিয়াস চার্জ আনতে পারে।

পরিমল মুখার্জি বলে উঠলেন, আমাদের একজনের ওপর সিরিয়াস চার্জ শেষ পর্যন্ত আসবেই। সান্যালকে আমরাই কেউ খুন করেছি।

এ-কথায় কোন ভেজাল নেই সকলেই জানেন। তবু কথাটা শুনে সকলে শিউরে উঠলেন যেন। পুলিশকে ফোন করে এই সংবাদ জানানই স্থির হল। এদিকে গুলির শব্দ পাম্পের কর্মচারিদের কানেও গিয়েছিল। তারা অফিস ঘরের দিকের দরজায় মরীয়া হয়ে করাঘাত করছিল।

পার্থ চক্রবর্তী এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনি খুলে দিলেন।

হতভম্ব পার্থ চক্রবর্তীর পাশ কাটিয়ে সকলে অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন। টেলিফোন এখানে আছে। পুলিশকে ফোন করা হল। তারপর সকলে নির্বাক হয়ে অফিস ঘরেই অপেক্ষা করতে লাগলেন পুলিশের জন্য।

দশ মিনিটের মধ্যে সদর কোতয়ালী থেকে সদলবলে এলেন ইন্সপেক্টর মিরানী।

সোমনাথ ছাড়া আর সকলের সঙ্গে ইন্সপেক্টরের অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। চিকিৎসক আর ব্যবসাদারদের সঙ্গে পুলিশের পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি দলবলকে বাইরে রেখে শুধু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে প্রবেশ করলেন। কর্মচারিরা তখন ঘরে ছিল না। মিরানী খুঁটিয়ে মৃতদেহ দেখলেন। তারপর গলির দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অফিস ঘরে এলেন। প্রশ্নের মাধ্যমে ঘটনাটা জেনে নিলেন ইন্সপেক্টর।

তাঁকে বিশেষ চিন্তিত হতে দেখা গেল। তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে কেউ খুন হয়ে যাবার পর ওঘর থেকে এঘরে আসা ছাড়া আর কোথাও গিয়েছিলেন কি?

ডাঃ সেন সকলের হয়ে বললেন, না। ওঘর থেকে আমরা এঘরে এসেছিলাম আপনাকে ফোন করতে। তারপর সেই থেকে আমরা একইভাবে এখানে বসে আছি।

কর্তব্যের খাতিরে এবার আমাকে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে। আপনাদের সহযোগিতা চাইছি—

সকলে উৎসুক দৃষ্টি মেললেন।

আমি আপনাদের সার্চ করব।

পরিমল মুখার্জি বললেন, সার্চ! কিসের জন্য?

মিরানী বললেন, রিভলবারের গুলিতে মিস্টার সান্যাল মারা গেছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বাইরে থেকে এ-কাজ কেউ করেনি। আপনারাও কেউ বাইরে যান নি বললেন। রিভলবারটা খুঁজে দেখতে চাই।

ও। আমার আপত্তি নেই, আমায় সার্চ করতে পারেন।

কারুরই আপত্তি দেখা গেল না।

মিরানীর ইঙ্গিতে সাব-ইন্সপেক্টর একে একে সার্চ করল, কিন্তু কারুর কাছেই রিভলবার পাওয়া গেল না। এই অভিনবত্বে ইন্সপেক্টর বিস্মিত হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করলেন না। তাঁর আদেশে ফটোগ্রাফার নানা এ্যাঙ্গেলে মৃতদেহের কয়েকখানা ছবি তুলল। তারপর লাশ চালান দেওয়া হল মর্গে।

এবার ইন্সপেক্টর মিরানী একে একে সকলের এজাহার নিলেন। পাম্প স্টেশনের কর্মচারিরাও বাদ গেল না। পুলিশের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন বক্সারের বাইরে না যান, একথা জানিয়ে দেবার পর সকলে বাড়ি যাবার অনুমতি পেলেন। বলা বাহুল্য, প্রাইভেট চেম্বার ও অফিস ঘর সীল করে দেওয়া হল। দুজন কনস্টেবলও ওখানে মোতায়েন করলেন মিরানী।

সোমনাথ যখন বাড়িতে পা দিল, তখন রাত পৌনে একটা।

রামজী চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বারান্দায় বসেছিল। প্রভুর মুখচোখের অবস্থা দেখে কোন প্রশ্ন করতে সাহসী হল না। রামজীকে পাশ কাটিয়ে সোমনাথ শোবার ঘরে চলে গেল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় স্নিগ্ধা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার দু'চোখে উৎকণ্ঠা।

সোমনাথকে দেখেই প্রশ্ন করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি ভেবে মরছি

সোমনাথ মণিময়ের মৃত্যু-সংবাদ দিতে ইতস্তত করতে লাগল।—তুমি খেয়েছো তো?

না। কোথায় ছিলে বললে না?

বলতেই যখন হবে তখন ইতস্তত করে লাভ কি।—পুলিশের হাত থেকে এই ছাড়া পেলাম। মণিময়বাবু খুন হয়েছেন।

এই সংবাদ পরিপাক করতে স্নিগ্ধা কিছু সময় নিল। তারপর বলল, খুন হয়েছেন!

হ্যাঁ। ও সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন কোরো না, আমার কিছু জানা নেই। খাওয়ার পাট এবার চুকিয়ে ফেলা যাক। রামজী—

রামজী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমাদের দুজনের খাবার নিয়ে এস।

স্নিগ্ধা মৃদু গলায় বলল, দিদির কি হবে এবার? কেউ তো মাথার ওপর রইল না।

আমাদেরই দেখা-শুনা করতে হবে। কাল সকালে তুমি ও-বাড়ি চলে যেও। ঝিয়ের হাতে ওঁকে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

শহরে হৈ হৈ পড়ে গেছে। হৈ হৈ পড়বারই কথা। শহরে দু-চারটে খুন যে মাঝে মধ্যে না হয়, তা নয়। তবে সে সমস্ত খুনোখুনি হয় নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে। তাতে কোন বৈচিত্র্য থাকে না ; রহস্য নেই। ফসল কাটা নিয়ে গোলমাল বা সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে দু-দলে মারপিট হল, এক-আধটা লাশ পড়ল—এই যা।

আর এ হল উত্তেজিতভাবে আলোচনা করবার মত ব্যাপার। ছ-জনের উপস্থিতিতে একজন খুন হল, অথচ হত্যাকারী কে বুঝতে পারা গেল না। বিদেশী চলচ্চিত্রে এ-রকম রহস্যময় ঘটনার অবতারণা থাকে বটে। বক্সারে—কলকাতা নয়, ছোট শহর। অনেকেই বেশির ভাগ মানুষকে চেনে। পেট্রোল পাম্পের মালিক মণিময় স্যান্যাল। অতি পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং আলোচনা সোচ্চার।

পুলিস চুপচাপ বসে নেই। মিরানী বারংবার খুঁটিয়ে পড়েছেন সকলের এজাহার। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছেন। তাঁর সন্দেহ কেন্দ্রীভূত হয়েছে সোমনাথের ওপর। স্নিগ্ধা পালিয়ে এসেছিল মণিময়ের আশ্রয় থেকে। তাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোর বিরোধ চলছিল। মণিময়কে পথ থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দেওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয় মনে করেছে সোমনাথ।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এরপরও থেকে যায়। আক্রোশ সোমনাথের চেয়ে মণিময়েরই বেশি হবার কথা। প্রেমে পড়ে শালী বাড়ি ছেড়ে দেওয়ায় তাঁর আভিজাত্যে ঘা লেগেছিল। এমন কি তিনি শাসিয়েও ছিলেন। এক্ষেত্রে মণিময়ই তো খুন করবেন সোমনাথকে। তা না হয়ে উল্টো ঘটনা ঘটল কেন? তাছাড়া রিভলবার সোমনাথের কাছে পাওয়া যায় নি। এমন কি আর কারুর কাছেও পাওয়া যায় নি। হাওয়া হয়ে সেটা উড়ে যেতে পারে না, হত্যাকারী কোথাও সেটা লুকিয়ে রেখেছে। কোথায়? মিরানী ঘরের চতুর্দিকে আতিপাতি করে খুঁজেছেন, পাননি। সোমনাথ গলির দরজার

মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হত্যাকারী হলে তার পক্ষে রিভলবার গলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সুযোগ ছিল। গলির একধার বন্ধ থাকায় লোক-চলাচল একেবারেই নেই। সেই রাত্রে পুলিশ গলি ঘিরে রেখেছিল। পরের দিন বলতে গেলে প্রতি ইঞ্চি মাটি খুঁটিয়ে দেখেছে। ওখানেও রিভলবার পাওয়া যায় নি। যাই হোক, মিরানী স্থির করলেন, সোমনাথকে অবলম্বন করেই তিনি অগ্রসর হবেন। তিনি ওঁর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন সন্ধ্যার পর।

বাহাদুর ইন্সপেক্টরকে এনে বসাল। বাহাদুর এই ঘণ্টা তিনেক হল ফিরেছে নেপাল থেকে। স্ত্রীর মোটেই শরীর খারাপ হয়নি। এমন কি বাড়ি থেকে কেউ টেলিগ্রামও করেনি আসবার জন্য।

সোমনাথ মাত্র আধঘণ্টাখানেক হল বাড়ি ফিরেছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে স্নিগ্ধার কাছে গিয়েছিল। তার দিদি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং মণিময় যে নেই, একথা জানানোর প্রয়োজনীয়তা পড়েনি। ওখানে ঘণ্টাখানেক ছিল।

মিরানী সোমনাথকে বললেন, কয়েকটা কথা জেনে নেবার জন্য এলাম। কেসটা কি রকম ঘোরালো বুঝতেই পারছেন। কাজেই.. .

কি জানতে চান, বলুন?

আপনি নিজের এজাহারে বলেছেন, মিঃ সান্যাল আপনাকে ডাকেননি। আপনি এমনি গিয়েছিলেন ওখানে।

তাই বলেছিলাম।

তখন জেনে নেওয়া হয়নি ; এখন প্রশ্ন করছি, বিনা আহ্বানে ওখানে আপনি গিয়েছিলেন কেন? আপনাদের দুজনের যে-রকম সম্পর্ক যাচ্ছিল, তাতে তো আপনার ওখানে যাবার কথা নয়।

আমি ওঁকে একটু বোঝাবার জন্য গিয়েছিলাম।

কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ওঁর শালী যখন আপনার পক্ষে, তখন আপনি আবার কি বোঝাতে গিয়েছিলেন তাঁকে?

সোমনাথ বুঝল, স্নিগ্ধাকে আহত করার কথা আর চেপে রেখে লাভ নেই। ও সেই ঘটনা বর্ণনা করল ইন্সপেক্টরের কাছে। এও জানাল, এই রকম বর্বরতায় ও ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিল। মণিময়কে কড়া করে দু-চার কথা বলার লোভ সামলাতে পারেনি। তাই অনেক খুঁজে পেতে গিয়েছিল তাঁর পাম্পস্টেশনে।

মিরানী এবার আলোর সন্ধান পেলেন। একটা মোটিভ যেন রূপ নিচ্ছে। তিনি গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই জানতেন না, আপনাকে নিয়েই এক আলোচনা সভা মিস্টার সান্যাল সেই সময় নিজের চেম্বার বসিয়েছেন?

না।

আপনার ধারণা হয়েছিল তিনি একলা আছেন!

হ্যাঁ।

আপনি তো একলাই তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন। কারণ—

সোমনাথ উৎসুকভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনি আবার বললেন, রাগ যে মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তার প্রমাণের তো অভাব নেই।

আমি রাগের বশবর্তী হয়ে মিস্টার সান্যালকে খুন করতে গিয়েছিলাম?

কি করতে গিয়েছিলেন, আপনার চেয়ে ভাল আব কেউ জানে না।

সোমনাথ উত্তরোত্তর উত্তেজিত হচ্ছিল। অসীম বলে নিজেকে সংযত করে বলল, অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন, আমার নামে রিভলবারেব লাইসেন্স নেই।

না থাকাই স্বাভাবিক। ব্যাক-ডোর দিয়ে রিভলবাব আজকাল সংগ্রহ করা কি খুব কঠিন?

আপনি একজন ভদ্রলোককে অপমানিত করার চেষ্টা করছেন ইন্সপেক্টর। আমাকে দোষী বলা চলে, এমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি?

আমাদের কাজ হল সকলকেই সন্দেহ করা। প্রমাণ হল সব শেষ কথা। উত্তেজনা পরিহার করে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আরো কোন কথা যদি জানা থাকে, তাহলে বলুন?

আর কিছু আমার জানা নেই।

মিরানী উঠে দাঁড়ালেন।—চলি এখন। আবার হয়তো আসতে হতে পারে।

তিনি বিদায় নিলেন।

সোমনাথ মহা ভাবনায় পড়ে গেল। পুলিশেব বকম-সকম যে ভাল নয়, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্য কোন দিকে সুবিধা করতে না পারলে ওর বিরুদ্ধেই চার্জ গঠন করবে। শেষ পর্যন্ত কি হবে তা পরের কথা, কিন্তু সামাজিক অপমৃত্যু ঘটবে সঙ্গে সঙ্গে।

এমনিতেই আজ কলেজ যাবার পরই প্রিন্সিপ্যাল সোমনাথকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নানারকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন ওকে। ছাত্ররাও ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। তাদের বিভিন্ন জটলার প্রধান লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে এই কেমিস্ট্রির অধ্যাপকটি।

শরীরের সমস্ত রক্ত ক্রমেই সোমনাথের মাথায় গিয়ে জমা হচ্ছে। নিদারুণ অস্বস্তিতে ছটফটিয়ে উঠছে ও। নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা এখনই না করে নিলে কোথায় তলিয়ে যাবে, কে জানে? ইন্সপেক্টর মিরানীর কথাবার্তা শুনে মনে হল, তিনি যেন ওয়ার্নিং দিয়ে গেলেন। অথচ একথা তো খুবই সত্যি, খুন ও করেনি। এমন কি, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে—সেই রিভলবার চালাতে জানা দূরের কথা, কোনদিন নাড়াচাড়া করে দেখার সুযোগও পায় নি।

খুন করল কে?

একথা তো স্বীকার করতেই হবে, মণিময় সান্যাল ওর উপস্থিতিতে খুন হয়েছেন। অথচ সমস্ত বিষয়টাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যাই হোক, সোমনাথকে এখন বাঁচতে হবে। উপায় অনুসন্ধান করার জন্য ও গভীরভাবে মাথা ঘামাতে লাগল।

আধো ঘুমের মধ্যেই রাত কেটে গেল। কিছুতেই এমন কোন সূত্র মাথায় এল

না, যাতে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় অমুক ব্যক্তি মণিময় সান্যালেব হত্যাকারী। জোরাল কোন সূত্র আবিষ্কার করে পুলিশকে জানালে অনেক কাজ হত। সকালে চা খেতে বসে খুন সম্পর্কে চিন্তা কবতেই হঠাৎ ওর মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল।

বাসব...

কলকাতার সেই প্রখ্যাত গোয়েন্দার স্মরণ নিলে কেমন হয়। বেনারসে থাকাকালীন সোমনাথ বাসবের আশ্চর্য কার্যকুশলতার পরিচয় পেয়েছিল। জটিল এক খুনের কেস হাতে নিয়ে বাসব ওখানে গিয়েছিল। সমাধান করতে তার তিনদিনের বেশি সময় লাগেনি। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তখনই দীপকের ওখানে রওনা হল।

সমস্ত শুনে দীপক বলল, তাঁর নাম শুনেছি ; তিনি এলে হত্যাকারী হয়তো ধরা পড়তে পারে। কিন্তু ভাই, এতে তোমার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে—

তা হোক। তুমি বুঝছ না দীপক, এই কেস সল্‌ভ না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। সব সময় পুলিশের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াবে। তাছাড়া এই অনিশ্চিত অবস্থায় আমাদের বিয়েটাও হতে পারবে না। কিভাবে তাঁকে আনানো যায় বলো তো?

কলকাতা গেলে খুবই ভাল হয়। তবে প্রথমে তুমি একবার ট্রাঙ্ককল করে দেখতে পারো।—

ট্রাঙ্ককল করাই স্থিব হল। ব্যবসাব জন্য দীপককে কলকাতার নানা কোম্পানীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ কবতে হয়। তার কাছে ক্যালকাটা ফোন ডায়রেক্‌ট্রি ছিল। বাসবের নম্বর খুঁজে নিযে ট্রাঙ্ককল বুক করল ওরা। সোমনাথ কলেজ কামাই করে লাইনের আশায় বসে বইল ওখানে।

চারঘণ্টা পরে পাওয়া গেল বাসবকে।

সংক্ষেপে ঘটনার বিববণ দিল সোমনাথ। তার সাহায্য যে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, এ-কথাও জানাল। বাসব রাজী হয়ে গেল। এত সহজে যে ওকে রাজী করানো যাবে, তা ভাবাই যায় নি। বাসব জানাল কাল অমৃতসর মেলে বক্সারে পৌঁছোবে। স্টেশনে যেন ওকে নিতে আসা হয়। এই সঙ্গে আরো জানিয়ে রাখল, সে যে তদন্ত করতে যাচ্ছে, একথা যেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশেব গোচরে আনা হয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সোমনাথ। অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল ওর মন। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এবার হত্যা-রহস্যেব সমাধান হবেই। ও এবার ছুটল পুলিশ অফিসে।

অমৃতসর মেল কাঁটায় কাঁটায় রাইট টাইমে স্টেশনে প্রবেশ করল। শৈবালকে সঙ্গে আনা সম্ভব হযনি ; ওব হাতে এখন অনেক কাজ। বাসব একাই এসেছে। কেউ কাউকে চেনে না, তবু সোমনাথ বাসবকে সহজেই খুঁজে পেলো। কুশল প্রশ্ন বিনিময় ছাড়া বাড়ি ফেরার পথে আর কোন কথা হল না দুজনের মধ্যে।

বাড়ি পৌঁছে জামাকাপড বদলে, কড়া এক কাপ চা খাবার পর বাসব বলল, পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন তো?

জানিয়েছি। কিন্তু ওঁরা আপনাব আগমনকে তেমন সুনজরে দেখছেন না।

স্বাভাবিক। যাই হোক, আমাব অনেক জানাশোনা আছে; প্রয়োজন হলে এই প্রদেশের বড়কর্তার কাছ থেকেও অনুমতি আনিয়ে নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, এবার সমস্ত কথা গুছিয়ে বলুন! কোন কথা বাদ দেবেন না। সবই আমার কাছে প্রয়োজনীয়।

বিস্মিত গলায় সোমনাথ বলল, সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছেন। একটু বিশ্রাম করবেন না?

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, ট্রেনে কোন অসুবিধা হয়নি। সমস্ত রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বলুন।

কোনখান থেকে আরম্ভ করব বলুন?

আপনি নিজের কথা থেকেই আরম্ভ করুন। ভিক্টিমের বিষয় যা জানেন তাও বাদ দেবেন না।

কর্মনচক যাওয়া থেকে আরম্ভ করে—সেখানকার যাবতীয় ঘটনাবলী, এবং ফিরে আসার পর এখানে যা যা ঘটেছে, সমস্ত একে একে বলে গেল সোমনাথ। খুঁটিনাটি কোন কথাই বাদ দিল না।

বাসব ঘন ঘন পাইপ টেনে চলেছে। তার প্রশস্ত কপালের ভাঁজে ভাঁজে চিন্তা। তার মনের মধ্যে যে অনেক কিছু ওঠা-নামা করছে, মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

আচ্ছা, ইব্রাহিমের কাছ থেকে সেই লোকটার নাম জেনে নেবার ইচ্ছে আপনার হয়নি কেন?

ওই ঘটনার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে, সোমনাথ বুঝে উঠতে পারল না। তবু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করে বলল, স্নিগ্ধার ওই রকম একটা চিঠি পেয়ে হঠাৎ চলে আসার সিদ্ধান্ত না করলে হয়তো নামটা জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করতাম।

তা বটে। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমি ওই প্রশ্ন করলাম কেন? কেন করলাম এই মুহূর্তে আমি নিজেও জানি না। আসল কথা হল, সমস্ত দিকই বাজিয়ে রাখা দরকার। কোন্ ঘটনার সঙ্গে যে কোন্ ঘটনা সম্পর্কিত, তা তো এখন বলা যাচ্ছে না। আর কোন কথা ছেড়ে যান নি তো?

আর কোন কথা?—সোমনাথ একটু চিন্তা করে বলল, আর একটা ব্যাপার কিছুদিন আগে অবশ্য ঘটেছে। জানি না, সেকথা আপনার কাজে লাগবে কিনা।

বলুন শুনি।

সোমনাথ শেঠ কাপূরী চান্দের বাড়ি কিনতে আসার কথা বলল। চোর আসার কথা, বাহাদুরের আহত হওয়ার কথাও বাদ দিল না। শুনে বাসবের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। মনে হল সে যেন উত্তেজনা বোধ করছে।

ব্যাঙ্কে না রেখে বাড়িতে মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার সার্থকতা কি?

মূল্যবান বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ জুয়েলারী গয়না বা অনেক টাকাকড়ি—সেরকম বাড়িতে কিছু নেই।

তবে গুর্খা রাখার কি দরকার?

এ প্রশ্ন আমিও বড়মামাকে করেছিলাম, তিনি কোন উত্তর দেননি। তিনি মারা যাবার পর বাহাদুরকে তাড়াইনি অনেকদিন থেকে আছে বলে।

হুঁ। আপনার বড়মামা কোথায় চাকরি করতেন?

'জীবনলাল য়্যাণ্ড সাতরামদাস' ফার্মে। এঁদের অনেক রকম ব্যবসা আছে। কানপুরে হেডঅফিস। মামা হেডঅফিসের প্রধানব্যক্তি ছিলেন।

রিটাযার করার কতদিন পরে মারা গেছেন?

রিটায়ারমেণ্টের দু'বছর আগেই উনি চাকরি থেকে রিজাইন দিয়েছিলেন। মারা গেছেন এই মাস ছয়েক হল।

রিজাইন দিয়েছিলেন কেন? অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কি?

না। কারণটা ঠিক জানি না। আমি এ-বাড়িতে আসার আগেই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বিচিত্র ব্যাপার। মোটা মাইনের চাকরি এমনি ছেড়ে দিলেন? নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ ছিল।

বামজী এসে জানাল আহারের সময় হয়েছে।

খেতে বসে বাসব প্রশ্ন করল, মণিময় সান্যালের প্রাইভেট চেম্বারে সুইচ কোন দিকে ছিল বলতে পারেন? অর্থাৎ গলির দরজার দিকে ছিল, না অন্যধাবের দেওয়ালে ছিল?

সুইচ। বলতে পারব না। তখন আমি এত উত্তেজিত ছিলাম যে কোথায় কি আছে লক্ষ্য করাব মত মনেব অবস্থা ছিল না। তাছাড়া ওঘরে আগে কখনো যাই নি।

খাওয়া শেষ হল এক সময়।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে বাসব থানার উদ্দেশে রওনা হল। সোমনাথ সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, নতুন জায়গা যদি কোন অসুবিধা হয়। বাসব ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে একাই রাস্তায় নামল। রিক্সায চেপে থানায় পৌঁছতে মিনিট পনেবোর বেশি সময় লাগল না।

ইন্সপেক্টর মিরানী বাসবের খ্যাতির কথা জানতেন না। তিনি শুনেছিলেন, কলকাতা থেকে একজন আসছেন, সোমনাথের পক্ষে এই কেসের তদন্ত করতে। একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। কেস একটু ঘোরাল সন্দেহ নেই, তাই বলে কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনতে হবে?

মিরানী অফিসেই ছিলেন? বাসব নিজের পরিচয় দেবার পর তিনি তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন বলে মনে হল না, বহুদর্শী বাসব তা সহজেই বুঝতে পারল। এ-রকম অবস্থার মুখোমুখি তাকে বহুবার হতে হয়েছে, সুতরাং ঘাবড়ালো না।

সকালে এসেছি। সময় নষ্ট না করে আপনার কাছে চলে এলাম।

নিরাসক্ত গলায় মিরানী বললেন, আপনি আপনার পথ ধরে এগুবেন। আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে লাভ কি?

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনার মনোভাব কিন্তু অসহযোগিতার। বিস্ময়ের বিষয়, আমার বহুল প্রচারিত কার্যকলাপের বিষয় আপনি কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আমি

পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কি-না? না করলে, আমার মক্কেলের স্বার্থে আমাকে ইন্সপেক্টর জেনারেলের কাছে পৌঁছতে হবে। আপনার বোধহয় জানা নেই, তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ খাতির আছে।

স্বাভাবিক ভাবে মিরানীকে এবার নরম হতে হল। তিনি বুঝলেন এ লোককে উপেক্ষা প্রদর্শন করা চলবে না। বললেন, আপনি আমার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য চান?

সব রকম। পুলিশের সাহায্য না পেলে কোন খুনের তদন্তে সাফল্য লাভ করা যায় না। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা দেখাবেন কি?

বাসব জানে ওষুধ ধরেছে।

মিরানী আর আপত্তি না করে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বার করে দিলেন।

বাসব রিপোর্টখানা খুঁটিয়ে পড়ল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুলি ছোঁড়া হয়েছিল আড়াই থেকে তিন হাত দূর থেকে। গুলি দুটি কোন তির্যক ক্ষত সৃষ্টি করেনি। এতে মনে হয় হত্যাকারী হতব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে। ৩২ ক্যালিবারের দুটো গুলিই পাওয়া গেছে শরীরের মধ্যে থেকে।

এবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্টেটমেণ্ট দেখতে চাই।

ইন্সপেক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে বার করে দিলেন। বাসব সকলের স্টেটমেণ্টের ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। চিন্তার পুরু প্রলেপ পড়েছে ওর মুখের ওপর। চিন্তিতভাবেই পাইপে মিক্সার ভরে ধরাল। ঘনঘন টান দিল কয়েকবার।

আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে ইন্সপেক্টর। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে মিস্টার সান্যালের পেট্রোল স্টেশনে।

আমার অবশ্য অন্যত্র কিছু কাজ আছে। তবে..

ঘর সীল করা রয়েছে বলেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছি।

নাচার ভঙ্গিতে মিরানী বললেন, চলুন।

সীল ভেঙে দুজনে অফিস-ঘরে ঢুকল। কয়েকদিন বন্ধ থাকায় এই শীতকালেও ভিতরে গুমোট ভাব। অফিস-রুম পেরিয়ে ওরা প্রাইভেট চেম্বারে এল। মিরানী জানালা দুটো খুলে দিলেন। ঘরের আয়তন বেশি নয়। মূল্যবান সানমাইকা-মোড়া টেবিলের ওপর ছাপকা ছাপকা রক্তের কালো দাগ একটা লোমহর্ষক মৃত্যুর সাক্ষী হিসেবে বিরাজ করছে। টেবিলের ওপ্রান্তে রিভলভিং চেয়ার। মণিময় সান্যাল ওতে বসেছিলেন। এধারে সাতখানা হাতলবিহীন চেয়ার।

ওধারের দরজার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বাসব প্রশ্ন করল, ওই দরজা দিয়ে বোধহয় গলিতে যাওয়া যায়?

হ্যাঁ।

কে কোন চেয়ারে বসেছিলেন, খোঁজ নিয়েছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। গলির দরজার দিকে প্রথম চেয়ারটায় বসেছিলেন পার্থ চক্রবর্তী, তার পরেরটায়

দীপক রায়, তার পরেরটায় ডাঃ সেন, তার পরেরটায পবিমল মুখার্জি। ওধারে দেওয়ালের দিকের বাকী চেয়ার দুটো খালি ছিল।

এবার আমাদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হোক। আপনি আমার মক্কেলকে সন্দেহ করেছেন। এই ঘরে এসে আপনার মুখ থেকে যা শুনলাম, তাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধা নেই, আমার মক্কেলকে সন্দেহ করার কোন সঙ্গত হেতু থাকতে পারে না।

আপনার সিদ্ধান্তটা কি জানতে পারি?

নিশ্চয় পারেন। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টেই তো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, গুলি শরীরে বেঁকে প্রবেশ করেনি। হত্যাকারী সামনে থেকে গুলি চালিয়েছিলেন। সোমনাথবাবু ঘরে ঢুকেছেন গলির দিকের দরজা দিয়ে। ওখান থেকে রিভলিং চেয়ারের অবস্থান কোণাকুণি। তিনি ঘরের মাঝামাঝি গিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া এধারে তাকিয়ে দেখুন, ইলেকট্রিকের সুইচ রয়েছে অফিস ঘরের দরজার পাশে—গলির মুখ দরজার অন্য প্রান্তে। সোমনাথবাবুর নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

বাসবের কথায় মিরানী একটু থতমত খেলেন। তিনি এভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরে গিয়েছিল অন্য ধারে।

আপনি বলতে চান, সুইচের দিকে যে দুজন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ হত্যাকারী?

জোর দিয়ে এখন কিছু বলতে চাই না। এমনও হতে পারে, সোমনাথ ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সকলেব দৃষ্টি তখন গলির দরজার দিকে নিবদ্ধ। চারজনের মধ্যে যে কেউ একজন এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আলো নিভিয়ে নিজের কাজ সেরেছে। ভাগ্যগুণে তার সহায়ক হয়েছে সুইচের অবস্থান। দেখুন সুইচবোর্ড স্বাভাবিক নিয়মে নেই ; রয়েছে অনেক নিচে। হাত তুলে আলো নিভোতে গেলে কেউ দেখে ফেলতেও পারে তো! হত্যাকারীকে সে অসুবিধাটুকুও পোহাতে হয়নি।

বাসবের বিশ্লেষণে মিরানীর আগেকার উপেক্ষা ভাব ক্রমেই মিলিয়ে যেতে লাগল। তিনি বুঝলেন, বড়কর্তার খাতিরের ব্যক্তিটি মোটেই হেঁজিপেজি নয়। কত সহজ ভাবে নিজের মক্কেলকে উনি প্রায় সন্দেহমুক্ত করে আনলেন!

তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়াল কি?

আরো ভেবে দেখতে হবে। এঁদের কার কার রিভলবার আছে জানেন?

কারুর নেই। আমি ভালভাবে অনুসন্ধান করেই জেনেছি। আরো একটা ব্যাপার দেখুন, এই ঘরের কোথাও রিভলবারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেন অস্ত্রটা! আমি সকলকে সার্চও করেছিলাম।

কোন কারচুপি নিশ্চয় আছে। সমাধানটাও হয়তো সহজ, আমরা ধরতে পারছি না এই যা। তবে রিভলবার খুঁজে পেতেই হবে। শেয পর্যন্ত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ওই অস্ত্রটাই প্রধান প্রমাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরপর আসছে মোটিভের কথা। সোমনাথবাবুকে সন্দেহ কবায় আপনি নিশ্চয় একটা মোটিভ খাড়া করেছিলেন ; আর তা স্ট্যাণ্ড করছে না।

আবার নতুন করে সমস্ত কিছু ভাবতে হবে।

আপনিও ভাবুন, আমিও ভাবছি। চলুন, এবার যাওয়া যাক। এখানে এখন আর কিছু করার নেই।

জানলা দুটো বন্ধ করে, বাইরে এসে আবার দরজা সীল করলেন ইন্সপেক্টর মিরানী। দুজন কনস্টেবল যথানিয়মে পাহারায় আছে। তিনি থানায় ফেরার পথে বাসবকে নিজের গাড়িতে করে সোমনাথের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

সোমনাথ বাড়িতে ছিল না ; স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রামজীকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, সে চা জলখাবার এনে উপস্থিত করল। বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। খিদেও পেয়েছে। চিন্তার জাল বুনতে বুনতেই জলযোগ শেষ করল বাসব।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে পড়ন্ত রোদে চিন্তায় একাগ্র হয়ে বাসব লনে পায়চারী আরম্ভ করল। মণিময় সান্যাল খুন হলেন একটা আলাদা ইসু, না এই বাড়ি বেশি দামে কিনতে চাওয়াব সঙ্গে ওই খুনের কোন সম্পর্ক আছে? পরিমল মুখার্জি যে খুনের কথা বলেছেন, হত্যাকারী কার আত্মীয়? হঠাৎ তাঁর ওই কাহিনী বলার উদ্দেশ্যই বা কি? এই বিষয়টিও কি বর্তমান খুনের সঙ্গে সম্পর্কিত?

সমস্ত জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাসবের মন বলছে, এই কেস তেমন জটিল নয়। কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে—ধরতে পারা যাচ্ছে না এই যা। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। বাসব ঘরে এসে বসল। ঠিকই বলেছে ইন্সপেক্টরকে, বিভলবার খুঁজে পাওয়া গেলে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে। হত্যাকারীকে বাহবা দিতেও হয়, মুহূর্তের মধ্যে রিভালবার কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে। এখানে আরো কথা আছে, রিভলবার পকেটে নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মণিময় সান্যালকে খুন করতে গিয়েছিল হত্যাকারী। সুতরাং প্রথম থেকেই ওকে এই ব্যাপারে জড়াবার উদ্দেশ্য যে হত্যাকারীর ছিল তা নয়।

চিন্তা মুলতুবি বেখে বাসব রামজীকে ডেকে কথাবার্তা আরম্ভ করল।

একথা-সেকথার পর হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি এ-বাড়িতে আগে এসেছো, না বাহাদুর?

একগাল হেসে রামজী বলল, আমি চাকরি করছি পনেরো বছরের ওপর। বাবু যখন কানপুরে ছিলেন, আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। বাহাদুর তো সেদিনের! বাবু চাকরি ছেড়ে দেবার পর ওকে রাখেন—

তোমরা যখন কানপুরে থাকতে, তখন এ-বাড়ি পাহারা দিত কে?

কেউ না, তালা বন্ধ থাকত।

বাহাদুরকে এখানে এনেছিল কে?

আজ্ঞে আমি। এখানে পা দিয়েই বাবু বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন গুর্খা দারোয়ান জোগাড় করতে। প্রেমবাহাদুরের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, ওকেই আনলাম। বাহাদুর না আসা পর্যন্ত বাবু ঘুমোতেন না, বন্দুক কোলে করে বসে থাকতেন বারান্দায়।

বিস্মিত হয়ে বাসব বলল, তাই নাকি! তোমার বাবু যখন কানপুর থেকে এখানে চলে আসেন, তখন নিত্য প্রয়োজনীয় মালের সঙ্গে বিশেষ কোন মাল ছিল কি?

আজ্ঞে তা তো মনে পড়ছে না!

সোমনাথ ফিরে এলো এই সময়।

আপনাকে অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রেখেছি—

কোন অসুবিধা হয়নি, আমি এর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

রামজী চলে গেল।

সোমনাথ বসে পড়ে বলল, আপনার কথা সকলকে বলে এলাম। আপনি প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চান তাও জানিয়েছি। কারুর আপত্তি নেই। আপনি কি স্নিগ্ধার সঙ্গে দেখা করবেন?

নিশ্চয়।

বাসব আর কিছু না বলে দরজাব বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করল। সোমনাথের অনুমান করতে অসুবিধা হল না, ও এখন কথা বলতে চায় না। গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছে।

পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যে স্নিগ্ধার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে নিল বাসব। সোমনাথ যা বলেছিল, তার চেয়ে বেশি কোন কথা বলতে পারল না সে। তারপর দেখা করল দীপকের সঙ্গে। দীপক তাকে সাদরে বাসল। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর, প্রশ্ন-উত্তরের পালা আরম্ভ হল।

খুনের পূর্ব মুহূর্তে ঘরের অবস্থা কি রকম হয়েছিল বলুন তো?

একটু ভেবে নিয়ে দীপক বলল, আমাদেব আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। নিশ্চয় আপনি শুনে থাকবেন আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল। হঠাৎ সোমনাথ সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ঘরের সকলেই হকচকিয়ে গেল। সকলে এক অজানা কারণে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। এমন কি মণিময়বাবুও। সোমনাথের অভাবনীয আগমনে সকলেবই বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে মিনিট খানেকও বোধহয় কাটে নি, আলো নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ঠিক এই সময় শুনলাম দুবার গুলির আওয়াজ। চাপা আর্তনাদ ও গুরুভার কিছু পডাব শব্দও পেয়েছিলাম।

কে গুলি চালিয়েছিল, এ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?

কি করে বলব? চোখে তো কিছু দেখিনি—

আপনারা কি ভাবে বুঝেছিলেন আলো কেউ নিভিয়ে দিয়েছে, নিজে থেকে ফিউজ হয়ে যায় নি?

তখনকার মনের অবস্থা এখন সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা কি সম্ভব? কে যেন প্রথমে আলো আলো করে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা সকলেই ধাক্কাধাক্কি করে সুইচ খুঁজতে লাগলাম। দেশলাই জ্বালা হল এই সময়, তারপর সুইচ পাওয়া গেল।

যতদূর শুনেছি মিঃ সান্যালের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না। কটুভাষীও ছিলেন। এই ধরনের মানুষের শত্রু থাকাটা স্বাভাবিক, কি বলেন?

ব্যবসার ক্ষেত্রে শত্রু তাঁর ছিল—একথা তাঁর মুখ থেকেই শোনা। তবে সেদিন আমরা যে ক'জন উপস্থিত ছিলাম ঘরে, তাঁদের কারুর সঙ্গে যে তাঁর শত্রুতা ছিল না, একথা জানি।

. সোমনাথবাবু—

শালীর ব্যাপারটা নিয়ে সোমনাথের ওপর উনি রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু সোমনাথ কখনও ওঁকে নিজের শত্রু মনে করেনি।

আচ্ছা, মর্ণিমা আপনি পান করে দেখেছেন?

মর্ণিমা!! দীপক অবাক হয়ে গেল। এই খুনের কেসের সঙ্গে মর্ণিমার সম্পর্ক কি? মর্ণিমার কথা উনি সোমনাথের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু—

চেখে দেখেছি, মন্দ নয় খেতে। এই কেসের সঙ্গে মর্ণিমার কি সম্পর্ক বলতে পারেন?

মৃদু হেসে বাসল বলল, হয়তো কোন সম্পর্ক নেই। তবে কি জানেন, তদন্ত করতে এসে আমাদের সব কথাই জেনে নিতে হয়। এবার বলুন তো, কয়েক বছর আগে কার্মনচকে কে কাকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

বলতে পারব না। খোঁজ নিইনি। আমার তো মনে হয়েছে পরিমলবাবু চটকদার এই গল্প নিজের মাথা থেকে বার করেছিলেন—আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। পার্থ চক্রবর্তীর বাড়ি এখান থেকে কতদূর হবে? ঠিকানা অবশ্য জানি। তবে—

কাছেই তাঁর রেডিওর দোকান। আপনাকে যেতে হবে না, আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

দীপক একজন কর্মীকে পাঠিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্থবাবু এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বাসবের খ্যাতির কথা অনেক দিন থেকেই জানেন। এই তদন্তভার হাতে নিয়ে সে এখানে আসায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দীপক দুজনকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল।

বাসব পাইপ থেকে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আপনাকে বেশিক্ষণ আটকাব না, খুব বেশি প্রশ্ন নেই।

কুণ্ঠিত হবেন না; স্বচ্ছন্দে যত ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন।

আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার প্রশ্ন।

চোখে তো কিছু দেখিনি! অবশ্য চোখে না দেখলেও অনেক সময় সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু পাইনি।

আপনাদের কারুর সঙ্গে মণিময় সান্যালের কখনো মনোমালিন্য হয়নি? সোমনাথবাবুর কথা বাদ দিয়ে বলুন।

যতদূর জানি, হয়নি। তবে মণি সান্যালের অনেক শত্রু ছিল। মোটরের চোরাকারবার করত কিনা! এ বড় খারাপ লাইন। সকলকে কি আর তুষ্ট রাখা যায়? আপনিই বলুন না!

তা অবশ্য যায় না। কিন্তু সেরকম কোন লোক তো ওখানে উপস্থিত ছিল না সেদিন?

আমার একটা থিওরি আছে। জানি না আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা—

বলুন, শুনি।

আমার মনে হয়, চোরাকারবারের ব্যাপারে যারা শত্রু ছিল, তাদের কেউ আমাদের মধ্যে একজনকে ডেপুট করেছিল মণি সান্যালকে খুন করার জন্য।

এ আপনার শুধু ধারণা, না কোন প্রমাণও আছে?

কোন প্রমাণ নেই। আমি অনেক ভেবে এই থিওরি খাড়া করেছি। নইলে খুনের কি মোটিভ থাকতে পারে বলুন?

ডাঃ সেনের কাছ থেকে মর্ফিমা নিয়ে টেস্ট করেছেন নাকি?

একটু চুপ করে থেকে পার্থ চক্রবর্তী বললেন, ডাঃ সেন সুবিধার লোক নয়। আমাদের সকলকে মর্ফিমার নেশা করিয়ে পয়সা লুটতে চায়। মাল কলকাতা থেকে আনায়, এ একেবারে বাজে কথা। স্বামী-স্ত্রী মিলে এখানেই তৈরি করে।

এও কি আপনার ধারণা, না কোন প্রমাণ আছে?

আমার ধারণা।

শুধু মাত্র ধারণার ওপর নিজের সমস্ত মতামত খাড়া করা কিন্তু ঠিক নয়, সময় সময় ঠকতে হয়। যাক, ও-কথা। আপনি কি বরাবরই এখানকার অধিবাসী?

না; কিছু দিন হল এখানে এসেছি। আমি কানপুরের লোক।

হঠাৎ এখানে চলে এলেন যে?

একবার বেড়াতে এসেছিলাম। ভাল লেগে গেল। কানপুরে অনেক ভাল ভাল রেডিওর দোকান আছে। ওখানে দোকান দেওয়া লাভের হবে না। স্থির করলাম এখানেই দোকান করব।

আগে কি করতেন?

চাকরি করতাম।

একটু অবাক হয়ে বাসব বলল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেডিওর দোকান দিলেন! রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে আপনার কি কোন জ্ঞান ছিল?

আমি একজন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। রেডিও কোম্পানিতেই চাকরি করতাম। পোষালো না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে দোকান নিয়েছি। ভগবানের ইচ্ছায় দোকান ভালই চলছে।

আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব। পার্থ চক্রবর্তী ও দীপকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এল। মনের আনাচে-কানাচে চিন্তা ঠেসে গেছে। পথ খুঁজে পাচ্ছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ কলেজ যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল; বাসবকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বলল, আমি চিন্তা করছিলাম আপনার কথা, কখন ফিরলেন—

তাড়াতাড়িই ফিরেছি বলা চলে। অবশ্য দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এখনও বাকি আছে।

আধঘণ্টাটাক পরে সোমনাথ কলেজ চলে গেল। ওর কয়েক দিন ছুটি নেবারই ইচ্ছে ছিল, বাসব সে ইচ্ছে থেকে ওকে নিরস্ত করেছে।

সোমনাথ চলে যাবার পর বাসব বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে চিন্তাসমুদ্রে থৈ খুঁজতে লাগল। মোটিভটা কি—এই চিন্তাই তাকে বেশি ক্লান্ত করে তুলেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাসবের হঠাৎ মনে হল ভাল করে বিজনবাবুর ঘরখানা একবার পরীক্ষা করলে কি হয়। যদিও এখনও প্রমাণ করা যায় নি, মণিময় সান্যালের মৃত্যুর সঙ্গে এই বাড়িতে যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা হয়েছে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। যদি নাই থাকে সম্পর্ক, তাহলেও দেখতে হবে, দু হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে বিজনবাবু হঠাৎ চলে এসেছিলেন কেন? তাঁর বাড়ির যা দাম তার চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে লোকে কিনতে চায় কেন? এই সমস্ত রহস্যেরও তো একটা কিনারা হওয়া দরকার।

দরজা ভেজান ছিল। বিজনবাবু মারা যাবার পর থেকে ও-ঘর ব্যবহারে আসে না। রামজী মাঝে মাঝে ঝাড়া-মোছা করে এই পর্যন্ত। সেদিন ওই ঘরেই স্নিগ্ধাকে আহত করেছিলেন মণিময় সান্যাল। প্রশ্ন করে বাসব জেনেছে, নিতান্ত কৌতূহলের বিশবর্তী হয়েই সেদিন স্নিগ্ধা ওই ঘরে ঢুকেছিল। দরজা ঠেলে বাসব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরে আসবাবপত্র যেন একটু বেশি মাত্রায় রয়েছে। আলমারি, বুক-কেস ওই ধরনের কিছু নয়। খাট ছাড়া ছোট ছোট টুল রয়েছে গোটা আটেক। মোটা মোটা পায়া তার। দেখলেই মনে হয়, বেশ ভারী। রাইটিং টেবিল এবং চেয়ারও আছে। পায়াভাঙা একটা টুল একধারে পড়ে রয়েছে—ওই দিয়েই বোধ হয় স্নিগ্ধাকে আঘাত করা হয়েছিল। মনে হয় সেদিনের ঘটনার পর আর রামজী এ-ঘরে ঢোকেনি ঝাড়া-মোছা করার জন্য।

বাসব ঘরের চারদিকের দেয়াল ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগল। বিজনবাবু কানপুর থেকে এমন কিছু নিশ্চয় নিয়ে এসেছিলেন, যা অন্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গুর্খা-গার্ড ও অ্যালসেসিয়ান কুকুর রাখতে হয়েছিল তাঁকে। আরো সাবধানতার জন্য সেই বিশেষ বস্তুটি দেয়ালে গেঁথে রাখাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। বিপক্ষ দল তাঁর জীবদ্দশায় সুবিধা করতে না পেরে, এখন বেশি দামে এই বাড়ি কিনতে চায়। তারা জানে, বিশেষ বস্তুটি বাড়িতেই আছে। তাই তারা কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে। বাহাদুরকে মিথ্যা টেলিগ্রাম করে সরিয়েছিল এখান থেকে।

দেয়ালের অবস্থা দেখে এবং ঠুকেঠাকে সন্দেহজনক কিছু মনে হল না। এরপর বাসব মেঝে পরীক্ষা করল। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। মেঝে খুঁড়ে কিছু রেখে আবার নতুন করে মেঝে তৈরি করা হয়েছে মনে হয় না। বাসব নিরাশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তবে এটা ঠিক, এই বাড়িতে কোথাও না কোথাও বিশেষ কোন জিনিস এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন বিজনবাবু। এখন প্রশ্ন হল সেই জায়গাটা কোথায়?

না ঘুমিয়ে সারাটা দুপুর শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে কাটিয়ে দিল বাসব। সোমনাথ বাড়ি ফেরবার আগেই অর্থাৎ চারটে বাজার পরই সে বেরুল।

রিক্সাওয়ালার সাহায্যে পরিমল মুখার্জির ঠিকানা খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। কাঠের তাঁর ফলাও কারবার। বাড়িতেই অফিস। তিনি অফিসেই ছিলেন।

বাসব গিয়ে নিজের পরিচয় দিতে তিনি খুব বেশি খুশি হলেন বলে মনে হল

না। তবে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল না। যত্নাকৃত হাসি খেলা করতে লাগল। একটু ব্যস্ততাও দেখালেন। ঘরে আর যে দুজন লোক ছিল তাদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন।

বাসব বলল, এখন আপনার কাজ-কর্ম করার সময়। এই সময় এসে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

ব্যস্ততার সঙ্গে পরিমল বললেন, সেকি কথা! সোমনাথবাবুর মুখে আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে এক রকম পথ চেয়ে বসে আছি। কাঠ ঠেঙিয়ে খাই বটে, আপনার প্রতিভার কথা আমি জানি।

এ আমার সৌভাগ্য! এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে?

নিশ্চয়। তবে কি জানেন, পুলিশকে যা বলেছি, তাছাড়া নতুন কিছু আর বলার নেই।

পুলিশকে যা বলেছেন, তা আমি পড়েছি। দ্বিতীয়বার সে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করবার ইচ্ছে নেই।

আমারই ভুল , আপনি তো নতুন প্রশ্ন করবেনই। বলুন?

আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

কাকে? বললে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। তবে—

বলুন? নিঃসঙ্কোচে বলুন? আপনার সন্দেহের কথা আর কারুর কাছে প্রকাশ পাবে না।

গলা একটু চেপে পরিমল মুখার্জি বললেন, এ কাজ সোমনাথবাবুর।

তাঁকে সন্দেহের কারণ?

পুলিশ রিভলবার খুজে পায় নি, শুনেছেন তো? রিভলবার লুকিয়ে ফেলার সুযোগ একমাত্র সোমনাথবাবুরই ছিল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন গলির দরজার মুখে। আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুবার গুলি করেন। তারপর রিভলবাবটা ছুঁড়ে ফেলে দেন ওধারের ঝোপঝাড়ের মধ্যে। দেখেছেন বোধ হয় গলির মাঝামাঝি জায়গায় একটা ঝোপ মত আছে। আমার বিশ্বাস, ওখানে ভালভাবে অনুসন্ধান চালালেই রিভলবারটা পাওয়া যাবে।

আপনিও বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন, আলোর সুইচ আছে গলির দরজার অপর দিকের দেয়ালে। সোমনাথবাবুর পক্ষে আলো নিভানো কি সম্ভব ছিল?

সম্ভব ছিল না আমিও জানি। সোমনাথবাবুর একজন সহযোগী থাকতে নিশ্চয় বাধা নেই—সে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল।

সেই সহযোগী কে হতে পারে?

তা বলতে পারব না।

আপনি পুলিশকে এ-সমস্ত কথা বলেননি কেন?

পুলিশ আমায় এ-সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি। উপযাচক হয়ে আমি কেন বলতে যাব বলুন?

তা বটে। আচ্ছা, সকলে মিলে কার্মনচকে যাবার প্রস্তাব কে করেছিল, বলুন তো?

মণি সান্যাল। সেই আমাদের প্রথম বলে। আমরা সকলেই রাজি হয়ে গেলাম। এক নাগাড়ে কত আর কাজকর্ম করা যায় বলুন না? মাঝে মাঝে বিশ্রামের তো প্রয়োজন।

আপনি যে খুনের গল্প ওখানে বলেছিলেন, তা আমি সোমনাথবাবুর মুখে শুনেছি। হত্যাকারীর নাম আমায় বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

এতক্ষণ বেশ সহজভাবে কথা বলছিলেন। এবার একটু গম্ভীর ভাবে পরিমল বললেন, নাম বলতে পারব না।

কেন? আপত্তি কিসের?

গল্পচ্ছলে কিছু বলা আলাদা কথা। একটা বাবুর্চির মুখে কি শুনেছি, তা কাউকে সিরিয়াসলি বলা চলে না। তাছাড়া এ খুনের সঙ্গে তার কি কোন সম্পর্ক আছে?

এখন বলা যাচ্ছে না। ওখানে কি ওই একটাই টুরিস্ট লজ আছে?

চারটে আছে। আমরা লজ নম্বর টু-তে ছিলাম।

আপনার আর সময় নেব না। আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে। চলি এবার। আবার দেখা হবে।

এখুনি উঠবেন? এক কাপ চা অন্তত খেয়ে গেলে ভাল হত না?

না, থাক। ও সমস্ত হাঙ্গামার দরকার কি?

বাসব পরিমল মুখার্জির অফিস থেকে বেরিয়ে ডাঃ সেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফেরার মনস্থ করল। রিক্সাওয়ালাই তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিল।

ডাঃ সেন সবেমাত্র চেম্বারে এসে বসেছেন। বাসবকে দেখে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, আসুন, আসুন,—আমার কি সৌভাগ্য!

চেম্বারটি বেশ ছিমছাম। এখনও রুগীদের ভিড় হয়নি। দুজন লোক মাত্র ওধারের ওয়েটিং হলে বসে আছে।

বাসবও মুখে হাসি টেনে বলল, আমায় চিনলেন কিভাবে?

আজ সকালে সোমনাথবাবুর সঙ্গে দেখলাম আপনাকে। কোথায় যেন যাচ্ছিলেন; তখনই বুঝেছি, আপনি কে।

আপনার অনুমান মিথ্যা হয়নি দেখা যাচ্ছে। আমি কেন এসেছি বুঝতেই পারছেন। খুন সম্পর্কে গোটা কয়েক প্রশ্ন করব।

আমি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব বলে তো মনে হয় না, কারণ আমি বিশেষ কিছুই জানি না।

বিশেষ কিছু না জানলেও, ঘটনাস্থলে যখন উপস্থিত ছিলেন, তখন কাউকে না কাউকে সন্দেহের লিস্টে রেখেছেন, একথা ভেবে নেওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয়?

সত্যি কথা বলতে কি, হতভম্ব হয়ে গেছি। আমাদেরই মধ্যে একজন তাঁকে খুন করেছে সন্দেহ নেই। তবে সে ব্যক্তি যে কে হতে পারে, অনেক চিন্তা করেও স্থির করতে পারিনি।—তারপর হেসে বললেন, আমি যে নই, একথা অবশ্য হলফ করে বলতে পারি।

মণিময় সান্যালের সঙ্গে আপনাদেব মধ্যে কাব সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা ছিল, বলতে পারেন?

তাও বলতে পাবি না! আমার সঙ্গে আলাপ বলতে গেলে সেদিনেব। বছর খানেকও হয়নি। রুগী হিসেবেই প্রথমে সাক্ষাৎ। তারপর অবশ্য আলাপ জমে ওঠে। কার সঙ্গে তাঁর বেশি দহরম মহরম ছিল, সে খোঁজ আমি নিইনি।

বাসব বুঝতে পারছে লোকটি অতি ঘোড়েল। এইভাবে কথাবার্তা বলেই তাকে বিদায় দিতে চায়। কিছু জানা থাকলেও পেট পরিষ্কাব করবার পাত্র নয়।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মর্ণিমা—নামটা ভালই রেখেছেন।

কথার বাঁক এইভাবে ঘুরতে দেখে ডাঃ সেন কেমন থতিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে অবশ্য বললেন, ও, মর্ণিমার কথা আপনাকে কেউ বলেছে বুঝি? নাম আমি দিতে যাব কেন? বার্মিজরা নামকরণ করেছে ড্রিঙ্কটার।

অনেকেব ধারণা কিন্তু অন্যরকম। এই মর্ণিমাব আবিষ্কর্তা নাকি আপনিই।

কি বলতে চাইছেন বলুন তো? খুনের সঙ্গে মর্ণিমাব কি সম্পর্ক আছে, জানতে পারি কি?

হয়তো কোন সম্পর্কই নেই। অনেকের আরো ধারণা, ওই পানীয়র বিশেষ এক আকর্ষণ আছে। আপনি সকলকে প্রলুব্ধ করেন মর্ণিমা খাবাব জন্য। উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য আয়েব পথ প্রশস্ত করা।

রাজীব সেন আর নিজেকে চাপতে পারলেন না। প্রায় চিৎকার করে বললেন, হাউ ডেয়ার ইউ আর! অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মনে রাখবেন।

সীমা বজায় রেখে সব কাজ সব সময় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। চোরাই মদেব কারবার করার শাস্তি পেনালকোডে আছে, এ কথা আমি আপনাকে স্মরণ রাখতে বলছি। চলি এখন।

বাসব ডাঃ সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে বেশ চটিয়ে দেওয়া গেছে। ভয়ও পেয়েছেন। বাসব আর কোথাও না গিয়ে আস্তানায় ফিরে এল।

সোমনাথ উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

দেরি দেখে মনে হচ্ছিল, আপনি রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছেন!

ইচ্ছে থাকলেও তো রিক্সাওয়ালারা পথ হারাতে দেবে না! প্রাথমিক কাজকর্ম মোটামুটি শেষ হল, এবার তদন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে পা দেবে। এখন একটা কাজের কথা বলুন তো?

কথা পরে হবে, আগে জলযোগ সেরে নিন। বেশ খিদে পেয়েছে আমার—শুধু আপনার অপেক্ষায় বসেছিলাম।

ভারি অন্যায়। খেয়ে নিলে পারতেন।

সোমনাথ রামজীকে জলখাবার দিয়ে যেতে বলল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে জলযোগ শেষ হল।

এবার বলুন?

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, আপনার বড়মামার কাগজপত্র—যেমন ধরুন, পুরোনো চিঠি, কি অফিসের কাগজ, বা ওই ধরনের আর কিছু—এ সমস্ত কি নষ্ট করে ফেলেছেন?

উনি নিজের কাগজপত্র রাখতেন ওই স্টিল আলমারিটায়—উত্তর দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো আলমারিটা দেখিয়ে বলল, রাখতেন। তিনি মারা যাবার পর আমি ওসবে হাত দিইনি—একই ভাবে আছে।

চমৎকার! নষ্ট না করে ফেলে একটা কাজের কাজ করেছেন। পরে আলমারির কাগজপত্র দেখা যাবে। এখন চলুন, মণিময় সান্যালের বাড়িতে আরেকবার ঘুরে আসি।

স্নিগ্ধাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করবেন।

না। মণিময় সান্যালের হিসেবপত্র, ডায়েরী ইত্যাদি খুঁজে দেখতে চাই।

ওসব কি আর বাড়িতে আছে? পেট্রোল পাম্পে পাবেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, আপনি ছেলেমানুষ। যে ব্যবসাদার পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে চোরাকারবার করে, তার আসল হিসাবপত্র চোখের সামনে থাকতে পারে না, বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রাখা আছে। চলুন।

আপনি এখানে পা দিয়ে পর্যন্ত ছুটোছুটি করছেন। কাল গেলে হত না। এখন একটু বিশ্রাম করুন বরং।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার দিকেই আমার সব সময় লক্ষ্য থাকে। আমি বিন্দুমাত্র পরিশ্রান্ত নই। চলুন কাজটা শেষ করে আসি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে মণিময় সান্যালের বাড়ি পৌঁছল। স্নিগ্ধার কাছ থেকে জানা গেল, জামাইবাবু কোথায় কারবারের কাগজপত্র রাখতেন সে বলতে পারে না। তবে নিজের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে কি সমস্ত লেখালেখি করতেন, জানলা দিয়ে সে দেখেছে। বাসব স্নিগ্ধা ও সোমনাথকে কথাবার্তা বলার সুযোগ দিয়ে মণিময়ের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আসবাবের চাপে ঘরের হাওয়া গুমোট নয়। টেবিলের ওপর গোটা কয়েক পত্রিকা ছাড়া আর কোন খাতা বা বই চোখে পড়ল না। একটা আলমারি আছে বটে, তাতে নানা ধরনের পুতুল ঠাসা। ঘরের লাগোয়া ক্লোকরুম। হ্যাঙ্গারে সারি সারি জামা-কাপড় ঝুলছে। একধারের দেয়ালে একটা সিন্দুক গাঁথা রয়েছে। সিন্দুকের মধ্যে ওর অভিষ্ট বস্তু আছে কিনা কে জানে।

বাসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল।

তোশক গদি তুলে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হলে সিন্দুক খোলবার ব্যবস্থা করবে। চাবি বাড়িতেই নিশ্চয় কোথাও আছে। মণিময়ের চাবি সব সময় কাছে রাখার অভ্যাস থাকলে পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। বাসব খাটের তোশক দুটো নেড়েচেড়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল। কিছু পাওয়া গেল না। মাথার ধারের গদি তুলতেই পরিশ্রম সার্থকতার রূপ নিল।

মোটা বাঁধানো খাতা রয়েছে একখানা। বাসব পাতা উল্টে দেখে বুঝল, তার কাজের পক্ষে সহায়ক হবে। খাতাটা সঙ্গে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

স্নিগ্ধা ও সোমনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। বললে, কাজ হল?

সোমনাথের প্রশ্নে বাসব বলল, মনে হচ্ছে যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি। ফিরবেন নাকি এখন?

হ্যাঁ, চলুন।

পরের দিন সোমনাথের কলেজ রওনা হবার আগে পর্যন্ত বাসব বিজনবাবুর আলমারির মধ্যেকার কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখল। সন্দেহজনক তেমন কিছু পেল না। শুধু একখানা চিঠিব লাইনগুলো কেমন বেসুরো। চিঠিখানা লেখা হয়েছে 'জীবনলাল সাতরামদাসে'র প্যাডে।

প্রিয় বিজনবাবু,

আপনাকে বিশ্বাস করে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম, তা এইভাবে বানচাল করে যে আপনি চলে যাবেন, আমি তা ভাবতে পারিনি। তবে জেনে রাখুন, বাজারে ও-মাল ছাড়তে গেলেই বিপদে পডবেন। ফিরে এলে আপনার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারি। মাইনে অনেক বাড়িয়ে দেব। অন্যথায় আমাব লোক আপনার পিছনে লেগে থাকবে জানবেন। স্বস্তিতে থাকা আপনাব পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়বে।

অবিলম্বে উত্তর দিন।

সাতরামদাস আগ্রবাল

সোমনাথ কলেজ যাবার সময় বাসবকে থানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

অন্য একটা তদন্ত সেরে ইন্সপেক্টব সবে অফিসে ফিরেছিলেন। বাসবকে দেখে প্রায় স্বাভাবিক গলায প্রশ্ন কবলেন, কাল থেকে দেখা নেই, ব্যাপার কি? কাজ কিছু এগুলো?

কিছু এগিয়েছে বৈকি। রিভলবাবেব সন্ধান পেয়েছেন?

এখনও পাইনি।

আমার মনে হয় কি জানেন, রিভলবাব ওখানেই কোথাও আছে। আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে মাত্র।

চিন্তিত গলায় মিরানী বললেন, আরেকবার সার্চ করতে বলেছেন?

আমার তো তাই ইচ্ছে। এখনও যাওয়া যেতে পারে।

আমার আপত্তি নেই।

আপনাকে আরো গোটা দুয়েক কাজ করতে হবে। কার্মনচকের দু'নম্বর টুরিস্ট লজের বাবুর্চি ইব্রাহিমকে এখানে ডাকিয়ে আনুন। আর, ডাঃ রাজীব সেনের বাড়ি আর চেম্বারের ওপর পাহারা বসান। তিনি বা তাঁর স্ত্রী কোন কিছু যাতে সরাতে না পারেন সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়।

সেকি?—মিরানী আশ্চর্য হলেন।

আপনাকে সব কথা পরে বলব। এখন চলুন।

মণিময় সান্যালের প্রাইভেট চেম্বারে দুজনে প্রবেশ করল। বাসব বলল, এ ঘরখানা

আমি আবার ভালভাবে দেখছি। টেবিলের দেবাজগুলিও দেখব। ওখানে অবশ্য রিভলবার পাওয়া যাবার সম্ভাবনা নেই। দেখি, যদি অন্য কোন সূত্রটুত্র পাওয়া যায়। এই ঘর ঘটনার কেন্দ্রস্থল বলে বেশি ট্রেস দেওয়া হয়েছে। সে তুলনায় পাশের অফিস ঘরকে আমরা কিঞ্চিৎ উপেক্ষা করেছি। আপনিও ঘরখানা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করুন।

কোন কথা না বলে মিরানী পাশের ঘরে গেলেন।

বাসব চেয়াব সরিয়ে, কার্পেট তুলে—দেখা জায়গায় আবার রিভলবারের সন্ধান চালাতে লাগল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! অগত্যা টেবিলের দেরাজগুলো নিয়ে পড়ল সে। দুদিকে তিনটে তিনটে ছ'টা দেরাজ আছে। এক এক ধারের দেরাজ তিনখানায় উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। নানা আকারের পেট্রোল কোম্পানির পুস্তিকা ও পোস্টারে ভরা। অন্যধারের দুখানা দেরাজ পাওয়া গেল, ভাউচার বুক ও গোটা তিনেক লম্বা খাতা। সব ওপরের দেরাজখানা এবার খুলতেই বাসবের পরিশ্রম সফল হল। না, রিভলবার সেখানে নেই। থাকার কথাও নয়। স্টেশনারী কিছু জিনিসপত্রর সঙ্গে পাওয়া গেল, এক ফুটের কিছু কম লম্বা একটা কাঠের টুকরো। অনেকটা কোন ছোট আসবাবের পায়ার মত। হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই বাসবের চক্ষুস্থির।

একি !!!

ঠিক এই সময় পাশের ঘর থেকে অর্থহীন আনন্দধ্বনি ভেসে এল। ইন্সপেক্টর সাফল্য লাভ করেছেন মনে হয়। বাসব দৌড়ে এল অফিস ঘরে। মিরানী তখন মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রুমাল দিয়ে মুড়ছেন রিভালবারটা। বাসবকে দেখেই সহর্ষে বললেন, পাওয়া গেছে! ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যে ছিল।

ওর থেকে ফিঙ্গার প্রিণ্ট আজই তোলবার ব্যবস্থা করবেন। তাহলে ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই রকম, পুলিশকে ফোন করবার জন্য প্রাইভেট চেম্বার থেকে সকলে এঘরে আসবার পরই প্রত্যেকের চোখ বাঁচিয়ে হত্যাকারী রিভলবার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। পরে কোন সময় নিয়ে যাবে, এই ছিল তার প্ল্যান। সে ভাবতেই পারেনি, আপনারা ও ঘরের মত এ-ঘরখানাকেও সীল করবেন।

আপনি কোন নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন নাকি?

সেই কাঠের পায়ার মত টুকরোটা বাসবের পকেটেই ছিল। বলল, না ; কিছু পেলাম না। তবে আপনি যা পেয়েছেন, তাতেই তদন্তের শেষ সীমায় পৌঁছনো যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সোমনাথ কলেজ থেকে তিনটের সময় ফিরল। বাসবের খোঁজ করতেই রামজীর কাছ থেকে জানা গেল, খাওয়া-দাওয়ার পর যে সে বিজনবাবুর ঘরে ঢুকে থেকে দরজা বন্ধ করেছে, এখনও বেরোয় নি। সোমনাথ ভেবে পেল না এতক্ষণ ঘরের মধ্যে সে কি করছে।

বাসব বেরিয়ে এল আরো মিনিট পনেরো পর। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। বলল, এক্সট্রা তালা আছে?

তালা! না তো!

বাজার থেকে এখুনি একটা আনিয়ে দিন। ওই ঘর আমি তালা বন্ধ করে রাখতে চাই।

সোমনাথ অবাক হলেও কোন প্রশ্ন করল না। এক দিনেই বাসবের কার্যকলাপের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছিল। রামজীকে পাঠালো সঙ্গে সঙ্গে তালা কিনে আনতে। কাছেই দোকান, মিনিট দশেকের মধ্যেই তালা এল।

বাসব এতক্ষণ আর কোন কথা বলেনি, বসে বসে পাইপের ধোঁয়া ছেড়েছে। রামজীর হাত থেকে তালা নিয়ে বাসব বিজনবাবুর ঘরে লাগিয়ে চাবি নিজের পকেটে রাখল। বলল, আমাকে আজই কানপুর যেতে হবে। কি ট্রেন আছে বলুন তো?

সোমনাথ দ্বিতীয়বার অবাক হলঃ আপনি কানপুর যাবেন?

হ্যাঁ। মাত্র একদিন থাকব ওখানে। এখন কোন ট্রেন আছে?

ঠিক জানা নেই। টাইম-টেবল দেখতে হবে।

সোমনাথ টাইম-টেবল নিয়ে এসে দেখে বলল, তুফান এক্সপ্রেস রাত এগারোটা পাঁচে পাবেন। তারপর আছে বারোটা ছাব্বিশে আসাম মেল।

আসাম মেলই ভাল। শুনেছি, কম জায়গায় থামে। ভাল কথা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়ি থেকে কোথাও বেরুবেন না। এমন কি কলেজ কামাই করলেও ভাল হয়।

বাসব কানপুরে চলে যাবার পরের দিন ইন্সপেক্টর অনেকটা কাজ গুছিয়ে রাখলেন। কার্মনচক থেকে ইব্রাহিমকে আনানো হয়েছে। স্টেশনে যাবার পথে বাসব তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছে। হত্যাকারী যে তার চোখে আকার নিয়েছে সেকথা বলার পর, তাঁকে আরো কি কি করতে হবে তাও জানিয়েছে।

ইব্রাহিমকে জেরা করেছেন ইন্সপেক্টর মিরানী। ভয়ে সে বেচারা কেঁদে ফেলেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সে যা বলেছে তার সারমর্ম ইন্সপেক্টরকে হতবাক করে দিল। যাই হোক, তিনি বাসবের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে ওই লোকটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা তাঁকে করতে হয়েছে।

বাসব ফিরে এল পরের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটায়। সোমনাথের বাড়ি না গিয়ে স্টেশন থেকে চলে এল থানায়।

মিরানী কোয়ার্টারে ছিলেন। খবর পেয়েই চলে এলেন। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। ইব্রাহিম কি বলেছে তাও শুনল বাসব।

সকলকে ডেকেছেন তো?

মিরানী বলল, আপনার কথামত সকলকে সোমনাথবাবুর বাড়িতে ডেকেছি। সময় দিয়েছি বেলা সাড়ে আটটা।

ওই সময় দিয়ে ভালই করেছেন। আচ্ছা, রিভলবারের মালিক বুঝতে পারে নি তো, আপনি তারই লাইসেন্স সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

আমি সরকারী নথিপত্র দেখছি। বাইরের লোক কি ভাবে বুঝবে বলুন? চা আনব?

দরকার নেই। আমি চলি। আপনি সময় মত চলে আসুন।

সাড়ে আটটা বাজতে বাজতে সকলে চলে এলেন সোমনাথের বাড়িতে। সকলেই নিজের ব্যবসাপত্র ক্ষতি করে এসেছেন। মুখ কিন্তু কারুর বেজার নয়। যেন কোন মহৎ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

বাসব বিজনবাবুর ঘরে সকলের বসার ব্যবস্থা করল। নিজের হাতেই ছোট ছোট আসবাবগুলো একধারে সরিয়ে রেখেছে। এর দরুণ যে জায়গা হয়েছে, সেখানে অনেকগুলো চেয়ার পাতা হয়েছে। পার্থ চক্রবর্তী, পরিমল মুখার্জি, দীপক, সোমনাথ, ডাঃ সেন, পামেলা ও স্নিগ্ধা চেয়ারগুলো অধিকার করেছে। ইন্সপেক্টর এসে বসলেন খাটের ওপর।

বাসব সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আপনাদের কেন ডাকা হয়েছে, তা কেউ জানেন না। আপনাদের কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হল, এ-জন্য আমি দুঃখিত। যাই হোক, যা বলতে চাই তা তাড়াতাড়ি বলে সকলকে ছেড়ে দেব। আপাতদৃষ্টিতে মণিময় সান্যালের হত্যা অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এর নেপথ্যে আছে এক দীর্ঘ কাহিনী। অবশ্য সেই কাহিনীর সঙ্গে সান্যালের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি দৈবাৎ জড়িয়ে পড়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছেন। আমি এখন হত্যার নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা করতে চাই। এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম ও মাথা ঘামাতে হয়েছে, তা আপনারা নিশ্চয় অনুমান করেছেন। কাহিনীর সূত্রপাত কয়েক বছর আগে। কানপুরেব 'জীবনলাল সাতরামদাস' একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। নানা কারণে জীবনলাল ও সাতরামদাস—এই দুই পার্টনারের মধ্যে যখন বিবাদ ঘন হয়ে এসেছে তখন সোমনাথবাবুর মামা বিজনবাবু এই প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। আবার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চোরাপথ দিয়ে কিছু সোনা সংগ্রহ করেছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের দুই ডিরেক্টার। সোনার পরিমাণ কম নয়। আড়াই মনের কিছু বেশি। সাতরামদাস তাঁর প্রিয়পাত্র বিজনবাবুর সাহায্যে জীবনলালের চোখে ধুলো দিয়ে ওই সোনা আত্মসাৎ করলেন। চোরাই সোনা—কাজেই সমস্ত বুঝেও পুলিশের সাহায্য নিতে পারলেন না। তিনি তক্কে তক্কে রইলেন মাল উদ্ধার করার জন্য। সাতরামদাস সোনা লুকিয়ে রাখার ভার বিশ্বস্ত বিজনবাবুর ওপর দিলেন। মনে হয় এই কাজ করে দেবার দরুণ মোটা টাকার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন তাঁর জন্য। যাই হোক, আজকের পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করতে যাওয়ার অর্থ হল নিজেকে প্রবঞ্চনা করা। বিশ্বাসের পরিপূর্ণ সুযোগ নিলেন বিজনবাবু। চাকরিতে হঠাৎ ইস্তফা দিয়ে সোনা নিয়ে চলে এলেন এখানে। সাতরামদাস ফাঁপরে পড়লেন। চিঠি লিখে ভয় দেখালেন, কিন্তু কোন ফল হল না।

ব্যাঙ্কে ওই বিপুল পরিমাণ সোনা রাখা যাবে না, পুলিশ সন্দেহ করবে। অথচ বাড়িতে স্টিল আলমারীব মধ্যেও রাখা যাবে না ; সাতরামদাসের লোক যে কোন রাত্রে এসে হামলা চালাতে পারে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে—বাড়িতেই থাকবে, অথচ কেউ সন্দেহ করতে পারবে না কোথায় আছে। চমৎকার একটা প্ল্যান বার করলেন তিন। অবশ্য একা কাজটা করা সম্ভব নয়। সোনা লুকিয়ে ফেলা হল। এরপর

বিজনবাবু আরেক ধাপ ওপরে উঠলেন। তিনি বোধ হয় ভেবে দেখলেন, তাঁর সাহায্যকারী টাকা খেয়ে সোনা কোথায় লুকোন আছে বলে দিতে পারে কাউকে। সুতরাং তাকে বাঁচিয়ে রাখা অর্থহীন। সময় নষ্ট না করে সাহায্যকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন কার্মনচকে। তারপর কৌশলে তাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নিষ্কণ্টক হলেন।

সোমনাথ অস্ফুট গলায় বলল, সেকি! বড়মামা খুন করেছিলেন?

হ্যাঁ। সেদিন এই কাহিনীই আপনারা পরিমলবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলেন। আমরা ইব্রাহিমের কাছ থেকে নাম সমেত আরো বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করেছি। আবার পুরোন কথায় ফিরে আসা যাক। সাতরামদাস নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, সোনা উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজনবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাঁর আরো সুবিধা হল। কারণ তিনি জানেন, বাড়িটা কোনরকমে হাতাতে পারলেই হল—মাল ওখানেই কোথাও পোঁতা আছে নিশ্চয়। তাঁর নিযুক্ত লোক সোমনাথবাবুর কাছে এল লোভনীয় দরে বাড়ি কেনার প্রস্তাব নিয়ে ; সোমনাথবাবু রাজী হলেন না। তাঁকে রাত্রে ভয় পর্যন্ত দেখানো হল। ইতিপূর্বে সাতরামদাস তাঁর একজন বাঙালি কর্মচারিকে এখানে পাঠিয়েছিলেন কাজেব সুবিধার জন্য। মজার কথা, সোমনাথবাবু কিন্তু এই বিপুল সোনার কথা জানেন না। বিজনবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ার দরুণ কিছু বলে যেতে পারেননি।

পাইপে মিক্সচার দেওয়াই ছিল। বাসব ধরাল। সকলে একমনে শুনছিলেন। সকলের দৃষ্টি সতর্ক—শেষ পর্যন্ত কি হয় জানবার জন্য উৎকণ্ঠা রয়েছে মনে হয়।

বাসব পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে ধোঁয়ায় নিজের মুখ প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধোঁয়া সরে যাবার পর আবার বলতে আরম্ভ করল, এবার মূল ঘটনায় আসা যাক। কার্মনচকেই সোমনাথবাবুর সঙ্গে স্নিগ্ধা দেবীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মণিময় সান্যাল কিন্তু বিষযটিকে ভাল চোখে দেখলেন না। অত্যাচার অসহ্য হওয়ায স্নিগ্ধা দেবী এ-বাড়িতে পালিয়ে এলেন। মণিময় শাসালেন সোমনাথবাবুকে। আবার তাঁর অনুপস্থিতিতে এসে স্নিগ্ধা দেবীকে মারধোব করলেন এবং এই সময় তিনি দৈবাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন এক স্বর্ণভাণ্ডার। তিনি অবশ্য জানতেন না এই সোনার পূর্ব ইতিহাস। মণিময় লোভী ব্যক্তি—এই বিপুল সম্পদ হাতাবার এক পরিকল্পনা করলেন। বলা বাহুল্য, সোনা লুকোতেও যেমন, তেমনি সরাবার সময়েও একজনের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিল।

মণিময় এমন একজনের সাহায্যপ্রার্থী হলেন, যে বাইরে কখনই বিষয়টি প্রকাশ করবে না। কাবণ দুজনে একসঙ্গে চোরাই মালের কারবার করেন। সাহায্য চাওয়াটাই মণিময়ের পক্ষে কাল হল। যেমন হয় আর কি! বিজনবাবু যা করেছিলেন, এই সাহায্যকারীও অনেকটা সেই রকম কাজ করে বসল। অর্থাৎ অংশীদার রেখে লাভ কি? সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন একাই সমস্ত সোনা নেওয়া যাক। সুতরাং মণিময়বাবুকে খুন হতে হল।

হত্যাকারীকে এখনো আমরা অনুমান করতে পারিনি। আজ আপনাদের এখানে ডেকে পাঠাবার উদ্দেশ্য হল, সত্যি যদি খুন সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা জেনে থাকেন,

তাহলে আমাদের বলুন। হত্যাকারীকে আর বুক ফুলিয়ে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়।

বাসব নিজের বক্তব্য শেষ করে সকলের মুখের দিকে তাকাল। সবাই নির্বিকার মুখে বসে আছেন ; কারুর কিছু বলার ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। কেউ কিছু বলবে, এ আশা অবশ্য করা হয়নি।

পার্থবাবু, আপনিও চুপ করে থাকবেন?

পার্থ চক্রবর্তী ভ্রূ-কুঁচকে বললেন আমি আবার কি বলব?

সাতরামদাস আপনাকে পাঠিয়েছেন সোনার সন্ধানে। রেডিওর দোকান খাড়া করে ব্যবসাদার সেজে থাকলেও, অনেক বিষয়ই তো আপনাকে খোঁজ রাখতে হয়!

আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জী—

তাই নাকি? কানপুরে গিয়ে সাতরামদাসের সঙ্গে আমি দেখা করেছি ; তখনই আমার সব জানা হয়ে গেছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, ডাক্তার ও মিসেস সেনের ওপর দৃষ্টি রেখেছেন তো? ওঁরা মদ চোলাই করেন?

রাজীব সেন কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

এই সময় স্নিগ্ধা বাসবের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমার কথাটা ইন্সপেক্টরকে জানিয়েছেন?

ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম! স্নিগ্ধা দেবী নিজের দিদির পক্ষে পেট্রোল পাম্প চালাতে চান। ঘর দুটো সীল করে রাখার তো আর দরকার নেই। সীল তুলে নিয়ে, পাহারা হটিয়ে দেবার যদি ব্যবস্থা করেন, তাহলে আজই কাজ আরম্ভ হতে পারে। হাইওয়ের ওপর পেট্রোল স্টেশন, সাধারণ মানুষেরও অসুবিধা হচ্ছে।

মিরানী বললেন, বেশ। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত ক্লিয়ার করে দিচ্ছি।

সোমনাথ বলল, মিস্টার ব্যানার্জী, সে আড়াই মন সোনা এই বাড়িতেই আছে বললেন। তার সন্ধান পেয়েছেন কি?

পেয়েছি বৈকি! এই ঘরেই আছে।

এই ঘরে!! সকলে অবাক হয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর, আর্মি পুলিশের ব্যবস্থা করেছেন কি?

হ্যাঁ, তারা গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে একধারে রাখা স্তূপাকার ছোট ছোট আসবাবের মধ্যে থেকে একটা টুল তুলে নিয়ে বলল, বিজনবাবু মাল লুকিয়ে রাখার কি চমৎকার পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়।

চাড় দিয়ে সে জয়েণ্ট থেকে টুলের একটা পায়া খুলে ফেলল।

এই দেখুন—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, পায়ার উপরিভাগে গোল হয়ে সোনা জমাট বেঁধে রয়েছে।

বাসব আবার বলল, টুলের চারটে পায়াই ফাঁপা। ফাঁপা অংশে সোনা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই টুলটায় নয়, এঘরে যত আসবাব আছে, তার প্রত্যেকের

পায়ায় সোনা পাওয়া যাবে। আড়াই মন সোনা রাখতে বেশি জায়গা লাগবে বৈকি! আপনারা বুঝতেই পারছেন, এই চোরাই সোনা এখন সরকারী তহবিলে জমা হবে। আর্ম পুলিশের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে তাই।

কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সকলের জোড়া জোড়া চোখ আসবাবগুলির ওপর নিবদ্ধ। বাসব সকলকে সেই অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ট্রেনের ধকল ছাড়াও অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এবার সে ঘুমোবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে বহু পূর্বে। 'হাইওয়ে পাম্প স্টেশন' আগেকার মতই কর্মব্যস্ত! স্নিগ্ধা ও সোমনাথ বিকেলে এসেছিল। কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে গেছে। কর্মী চারজন অনেক দিনের। তাদের দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ আছে।

ক্রমে এগারোটা বাজল। বন্ধ হয়ে গেল পাম্প-স্টেশন। আবার সকাল ছ'টায় খুলবে। তিনজন কর্মী যে-যার বাসায় চলে গেল। একজন রয়ে গেল। এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন মণিময়। প্রতি রাত্রে পালা করে একজনকে থাকতে হবে এখানে। অনেক দামী জিনিস আছে। কেউ যদি কিছু নিয়ে পালায়, তাই এই সাবধানতা।

এ ক'দিন পুলিশ পাহারা ছিল। কাউকে থাকতে দেয়নি। চুরির সম্ভাবনাও ছিল না। আজ পুলিশ চলে গেছে, কাজেই পূর্ব ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে। পাম্প-স্টেশনের কাছটা বেশ নির্জন। রাস্তার অপর পার গাছপালায় ভরা। পাঁচশো গজের মধ্যে কোন বাড়িঘরও নেই।

তিনজন কর্মী চলে যাবার পর, রাস্তার অপর প্রান্তের একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে এল। গায়ে ভারি ওভারকোট, মাথার ফেল্ট হ্যাট মুখের দিকে অনেকটা নামান। কোটের তোলা কলার ও হ্যাটের দরুণ মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাম্প-স্টেশনে একজন ছাড়া এ তল্লাটে আর কেউ নেই। তবু লোকটি এধার ওধার সতর্কতার সঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে পাম্প-স্টেশনের চৌহদ্দির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ-দরজায় করাঘাত করল।

কর্মীটি তখন শোবার আয়োজন করছে; করাঘাতের শব্দে সাড়া দিল সে। কোন সহকর্মী কোন কারণে ফিরে এসেছে, এই ধারণা হল তার। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই হকচকিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বোঝার আগে—কিছু বলার আগেই আঘাত নেমে এল তার মাথার ওপর। সামান্যতম শব্দ করার সুযোগ না পেয়েই সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আগন্তুক তার দেহ ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এগিয়ে চলল টেবিলের দিকে। টেবিলের কাছে পৌঁছে ঝুঁকে তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বার করল। দ্রুত হাতে ভেতরকার কাগজপত্র সরিয়ে কি যেন খুঁজল।

ঠিক সেই সময়—

দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, রিভলবারটা ওখানে নেই মিস্টার রায়। বৃথা পরিশ্রম করছেন।

আগন্দুক ঝটিতে মুখ ফিরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাসব ও ইন্সপেক্টব মিরানী।

হত্যাকারী হিসেবে আপনাকে অনেক আগেই চিনতে পারা গেছে, গ্রেপ্তারও করা যেত। তবু টোপ ফেলে ছোট্ট একটা পরীক্ষা চালালাম। দেখা যাচ্ছে, সেই টোপ আপনি গিলেছেন দীপকবাবু!

দীপক ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে অনেকটা। দৃঢ় গলায় সে বলল, এ ঘরে এখন ঢুকছি বলেই যে আমি মণিময় সান্যালের হত্যাকারী, তা প্রমাণ হয় না—

মৃদু হেসে বাসব বলল, কাঁচা কাজ করতে অভ্যস্ত আমি নই। ওই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যে রিভলবার পাওয়া গেছে, তাতে আপনার ফিঙ্গারপ্রিণ্ট ছিল। তাছাড়া রিভলবারের লাইসেন্স আপনার বাবার নামে। আপনার বাবার রিভলবার অন্য কারুর পক্ষে ব্যবহার করা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইন্সপেক্টর, মিঃ সান্যালকে হত্যা করার অপরাধে আপনি দীপকবাবুকে গ্রেপ্তার করুন—

আমি...আমি...কিন্তু...

কোর্টে নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। তবে কি জানেন পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু আপনার বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে রয়েছে। লোভ মানুষকে এই ভাবেই তলিয়ে দেয়। ব্যবসাপত্র ও সান্যালের সহযোগিতায় চোরাকারবার করে রোজগার ভালই করছিলেন ; তবু সোনার সন্ধান পাবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হয়ে পড়লেন—একা আপনার সমস্ত চাই। যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ইন্সপেক্টর, নিজের কাজ সারুন। আমি এবার চলি।

জন ছয়েক কনেস্টবল দরজার গোড়ায় তখন জড় হয়েছে। মিরানী দীপকের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আপনার বন্ধু দীপক রায় যে হত্যাকারী, প্রথমে আমি আন্দাজ করতে পারিনি। পরিমল মুখার্জি ও পার্থ চক্রবর্তীর মধ্যে আমার সন্দেহের পেণ্ডুলাম তখন হেলছে দুলছে। তাছাড়া আরেকটি বিষয় আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল, খুনের সঙ্গে আপনার বাড়ি বেশি দামে কিনতে আসা ও পরিমল মুখার্জি কার্মনচকে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। রামজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানপুর থেকে বিজনবাবু এমন কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, যা চুরি যাওয়ার জন্য সব সময় শঙ্কিত থাকতেন। কোন দিকে কূল পাচ্ছি না দেখে মণিময় ও বিজনবাবুর গোপনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করার মনস্থ করলাম। সুফল পাওয়া গেল। জানা গেল মণিময়ের সঙ্গে চোরাকারবার করতেন দীপকবাবু। একজনের পেট্রোল পাম্প আছে, আরেকজনের আছে মোটর মেরামতের গ্যারেজ। আমার সন্দেহ দানা বাঁধল। এই সমস্ত গোপন কারবারে মন কষাকষি লেগেই থাকে। তবে কি রাগে অন্ধ দীপকই মণিময়কে খুন করেছেন?

বাসব থামল। জনবিরল ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে স্নিগ্ধা ও সোমনাথের সামনে বসে সে বলছিল। ডাউন অমৃতসর মেল প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট। ওই ট্রেনেই বাসব

কলকাতা ফিরে যাবে। তাকে আজ দুপুরে আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিরানী। সারাদিন ওখানেই ছিল। সোমনাথ মোটে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায় নি। সময় হাতে পাওয়ায় স্টেশনে এসে ধরে বসল, দীপককে কিভাবে সন্দেহ করা হল জানবার জন্য।

বাসব পাইপ ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, মণিময়ের প্রাইভেট চেম্বার দ্বিতীয়বার সার্চ করে রিভলবার ও সোনা-ভর্তি টুলের ভাঙা পায়াটা পেলাম। আমার চিন্তা এবার অন্য খাতে বইতে লাগল! বিজনবাবুর ঘর পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম প্রত্যেকটি আসবাবের পায়ায় সোনা ভরা আছে। এই সোনার জন্যই তাঁর এত সতর্কতা ছিল। তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে একখানা ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠিও পেয়েছিলাম। সেই চিঠি নিয়েই গেলাম কানপুর। সাতরামদাস প্রথমে কোন কথাই ভাঙতে চায় না। শেষে মোক্ষম চাল চাললাম। সোনাভর্তি ভাঙ্গা পায়াটা দেখিয়ে বললাম, সমস্ত সোনা কোথায় আছে একমাত্র আমিই জানি। পুলিশকে না জানিয়ে সমস্ত সোমা আপনাকে উদ্ধার করে দিতে পারি যদি আমাকে হাজার কুড়ি টাকা দেন। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন। বললেন সব কথা। একথাও জানালেন পার্থ চক্রবর্তী তাঁর লোক, প্রয়োজন পড়লে চক্রবর্তীর সাহায্য আমি পেতে পারি।

যাবার আগে ইন্সপেক্টরকে তিনটে কাজ শেষ করে রাখতে বলেছিলাম। এক, ইব্রাহিমকে আনিয়ে জেরা করা। দুই, আপনাদের প্রত্যেকের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট নেওয়া ছিল—রিভলবার থেকে তোলা ফিঙ্গার প্রিণ্টের সঙ্গে আপনাদের কারুর ফিঙ্গার প্রিণ্ট মেলে কিনা দেখা। তিন, দীপকবাবুর বাবার নামে রিভলবারের লাইসেন্স আছে কিনা। এই কাজগুলি ভালভাবেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন ইন্সপেক্টর এবং পরিষ্কার বুঝতে পারা গিয়েছিল দীপকবাবুই হত্যাকারী। তখনই অবশ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেত, তবু আমি তাঁকে নেড়েচেড়ে দেখতে চাইলাম। আপনি জানেন, আগে থেকে স্নিগ্ধা দেবীকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল, পাম্প-স্টেশন থেকে পুলিশ পাহারা তুলে নেবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্য। দীপক দেখলেন চমৎকার সুযোগ। রিভলবার এখনও ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যেই আছে। পুলিশের হাতে পড়লে এতক্ষণ তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন। সুতরাং ওটা উদ্ধার করে আনার চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে। ফাঁদ যে পাতা হল তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তারপর ধরা পড়ে গেলেন।

স্নিগ্ধা বলল, জামাইবাবুকে খুন করে সোনা সরাবার চেষ্টা তো তিনি করেন নি?

স্বাভাবিক। আমার অনুমান, সোনার সন্ধান দিয়ে মণিময়বাবু তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিকল্পনা ছকে নেন। সেই রাত্রে বাবার রিভলবার পকেটে নিয়েই ওখানে গিয়েছিলেন। কথাবার্তা সেরে সকলের সঙ্গে চলে যাবেন, এবং আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে কাজ সারবেন। তাঁর ভাগ্য ভাল, দ্বিতীয়বার আসার প্রয়োজন পড়ল না। সোমনাথবাবু ওখানে পৌঁছলেন যেন নিজের ঘাড়ে দোষ নেবার জন্য। সেই বিহ্বল মুহূর্তে তিনি আলো নিভিয়ে দিয়ে কাজ সারলেন। সোনা তিনি সরাননি কেন বলছেন? সোমনাথবাবু যখন ও-সম্পর্কে কিছু জানেন না, তখন ব্যস্ততা দেখিয়ে লাভ কি? খুনের হাঙ্গামা ঝিমিয়ে পড়ার পর কাজে নামবেন এই ছিল বোধ হয়

ইচ্ছা। সোমনাথবাবুর বাড়িতে অবাধ গতি তাঁর। সুযোগ একটা করে নেবেনই। যেমন ধরুন বিয়ের পর আপনারা হনিমুনে গেলেন ভাল, নইলে উনিই আপনাদের কোথাও ঘুরে আসবার পরামর্শ দিতেন। চাকর ও দারোয়ান ঠিকমত বাড়ি দেখাশুনা করছে কিনা তার খবরদারীর ভার নিতেন। তারপর আপনাদের অনুপস্থিতিতে ওই ছোট আসবাব দুটো-একটা করে মোটরের কেরিয়ারে পুরে অন্যত্র পাচার করতে অসুবিধা হত না তাঁর।

আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করার স্পর্ধা আমার নেই বাসববাবু। তবু যা করলেন তার তুলনা হয় না।

সোমনাথের কথায় বাসব হাসল।

এই সময় ঘণ্টা পড়তে লাগল বাইরে।

ট্রেন আসছে। এবার প্ল্যাটফর্মে যাওয়া যেতে পারে।

স্নিগ্ধা চোখের ইসারায় কি যেন সোমনাথকে বলল।

সোমনাথ পকেট থেকে একটা মোড়া কাগজ বার করে সসঙ্কোচে বলল, এই চেকটা যদি নেন, তাহলে আমরা খুশি হব।

বাসব ওর হাত থেকে চেকটা নিয়ে দেখে বলল, বিলক্ষণ। চমৎকার অ্যামাউণ্ট। ভবিষ্যৎ জীবনে আপনারা সুখী হোন, কামনা করি। কুলীটা আবার কোথায় গেল? কুলী—কুলী—

বিবর্ণ বুলবুল

বছব ত্রিশেক আগে শামসেরনগরের কেউ নাম শোনেনি।

মোগলসরাই থেকে ঠিক পঁয়ষট্টি মাইল দূরে—উত্তরপ্রদেশেব দিকে নয়, বিহারের মধ্যেই অবস্থান এই জনপদের। এই অতিবিখ্যাত জায়গায় সিজনের সময় দূর-দূর থেকে লোক আসে হাওয়া বদল করতে।

অথচ মাত্র ত্রিশ বছর আগে এখানে জনপদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। গভীর অরণ্য গ্রাস করেছিল অঞ্চলটিকে। মানুষ হিংস্র জন্তুর ভয়ে সযত্নে পরিহার করে চলত এধার।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আকাশ-ছোঁয়া গাছগুলি কাটা পড়তে লাগল। অরণ্যে আসতে লাগল দ্রুত পরিবর্তন। তারপর ধীরে ধীরে আধুনিক এক নগর গড়ে উঠল।

এই প্রায়-অসম্ভব ব্যাপারের সার্থক রূপদাতা হলেন দৌলত রোহাতগী।

গত মহাসমরের ক'বছর ঠিকেদারি ও লোহার ব্যবসা করে তিনি যে কত টাকা রোজগাব করেছিলেন, তার চোখ-ধাঁধানো হিসাব বলতে গেলে তাঁর নিজেরও জানা ছিল না।

বিচিত্র খেয়ালের মানুষ এই দৌলত রোহাতগী। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন—আর ঠিকেদারি নয়, এবার গঠনমূলক কিছু করা দরকার। এমন কিছু কববেন যা সহজে কেউ করতে পারে না।

রোহাতগী বেনারসের রামাপুরা অঞ্চলের অধিবাসী. কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বাড়ি বসে যখন চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তখনই জানতে পারলেন মনোমত খবরটা।

সাহাবাদ জেলায় সরকার কাচের একটি কারখানার কাজ শেষ করে এনেছেন। মাল পরিবহনের সুবিধার জন্য লাইন পাতাও হয়ে গেছে। সরকার চান ওই অঞ্চলে নগর-বাজার গড়ে উঠুক। সংলগ্ন জংলা জায়গাটি যাতে কাজে লাগানো যায়, তাই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

মন দিয়ে সংবাদপত্রের প্রকাশিত টেণ্ডারের অন্যান্য খুঁটিনাটির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন রোহাতগী। পরের দিনই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এঁকেবেঁকে পাহাড় চলে গেছে একধার দিয়ে। পরপর কয়েকটি জলপ্রপাতের জল ছোট একটি নদীর আকার নিয়েছে। সেই ধারা গিয়ে মিশেছে মাইল পঁচিশেক দূরে প্রবাহমান গঙ্গায়।

জঙ্গলে অবশ্য দামী বা নামী গাছ নেই বললেই চলে। না থাক, রোহাতগীর তাতে কিছু যায় আসে না। জায়গাটি যে স্বাস্থ্যকর অনুভব করেছেন, এতেই তিনি পুলকিত।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

মাস দুয়েকের কিছু বেশি সময় লেগেছিল সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে নিতে। জঙ্গল পরিষ্কার করে প্ল্যান অনুসারে প্লটে প্লটে জমি ভাগ করতে সময় লাগল

আরো আট মাস। তারপর নগরসভ্যতা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল এখানে। বছর তিনেকের মধ্যেই শামসেরনগর জমে উঠল। নিজের জনকের নামেই রোহাতগী এই জনপদের নামকরণ করেছিলেন।

এই শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। সরকার পরিচালিত কাচের কারখানা ছিলই, তারই কাছাকাছি সিমেণ্টের এক বিশাল কারখানা পত্তন করেছেন রোহাতগী। সেখানে শিল্পনগরীর ভাবধারা উগ্র রকমের প্রকট।

আবার শহরের অন্য অঞ্চলে—যেধার দিয়ে পাহাড় চলে গেছে, সেখানকার নির্জনতা, সেখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী মনকে সুদূর লোকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই প্রান্তেই বাস করেন শহরের অভিজাত ও ধনশালী ব্যক্তিরা।

এখানকার ছ'তলা হোটেলটির মালিক হলেন কলকাতা থেকে আগত এক ভদ্রলোক। হাওয়া বদল করতে যাঁরা আসেন, তাঁদরে কাছে এটি একটি লোভনীয় আস্তানা। হোটেল মারিনার সুনাম ক্রমেই দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে।

চাকরিতে নিয়োগপত্র পাবার পর এখানে পা দিয়েই কিন্তু সুবীর বাংলো পায়নি। পনেরোটা দিন তাকে হোটেল মারিনাতেই কাটাতে হয়েছিল।

সুবীর সান্যাল উত্তর-কলকাতার এক পড়তি ঘরের ছেলে। প্রথম দিকে বেশ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। পয়সাওয়ালা এবং স্নেহপ্রবণ এক মামা না থাকলে কখনোই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতে পারত না। সৌভাগ্যক্রমে পাশ করে বেবোবার পর ওকে বসে থাকতে হয়নি। মাইনে কম হলেও চাকরি পেয়ে গিয়েছিল এক জায়গায়।

বেশ সুখেই দিন কাটছিল। হোক মাইনে কম, হাজার হাজার বেকার ইঞ্জিনিয়ারের মত বাড়ি বসে বাপের অন্ন তো আর ধ্বংস করতে হচ্ছে না।

সুবীর তখন জানে না, কত বড় সৌভাগ্য তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এরপর দৈনিকপত্রের বিজ্ঞাপন তাকে কিভাবে শামসেরনগরে টেনে নিয়ে গেল তার ক্লান্তির ইতিহাস বর্ণনা না করে এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে যে, সে এখন এখানকার 'ওল্ড গোল্ড সিমেণ্ট কোম্পানি'র একজন পদস্থ কর্মচারি।

রাত কাঁটায় কাঁটায় একটা কুড়ি।

রিস্টওয়াচের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সুবীর ড্যাসবোর্ডের দিকে তাকাল। গাড়ির গতি এখন চল্লিশ মাইল। বাংলোয় পৌঁছতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। ঠাণ্ডায় শরীর শিরশির করছে। চারধারের কাচ তোলা রয়েছে, তবু কোথা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে কে জানে!

এখন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ মাত্র। রক্ত জমাট করা হিমের সিংহ-ভাগ এখনও বাকি। উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্যে সুবীর হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে, নির্জন রাস্তা নির্জীব পাইথনের মত পড়ে রয়েছে। এত রাত্রে উষ্ণ বিছানা থেকে দূরে থাকা সুবীরের কখনোই পছন্দ নয়। কিন্তু কি করবে? নিতান্ত চাপে পড়েই তাকে যেতে হয়েছিল।

গত রবিবারের কথা।

বেলা তখন আটটা হবে। বাংলোর সামনেকার ছোট্ট বাগানে মিষ্টি রোদ্দুর ছেয়ে রয়েছে। গড়ানে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সুবীর একটা পত্রিকা নাড়াচাড়া করছিল। অর্থাৎ গল্প বা উপন্যাসের প্রতি তার একাগ্রতা নেই, সে চিন্তা করছিল অন্য কিছু।

.একটানা ছ'দিন কাজ করার পর আজ ছুটি। ভালই লাগছে। কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে যে ভাল লাগছে তা নয়, ভাল লাগছে আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঝিকির সঙ্গে কাটাতে পারবে। আজই বলবে সেই চরম কথাটা। অর্থাৎ আর নয়, অনেক হয়েছে—এবার তাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়া উচিত।

ওদের অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হলেন গোবিন্দগোপাল সরকার। ঝিকি তাঁরই মেয়ে। স্থানীয় কলেজ থেকে বি.এ-র বেড়া পার হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেছে। দেখতে যে অপরূপ সুন্দরী তা নয়, তবে এমন একটা মিষ্টি ভাব আছে যা মনকে আকৃষ্ট করে।

ঝিকির সঙ্গে দৈবাৎই আলাপ হয়ে গিয়েছিল সুবীরের। এ হল এক বছরের পুরোনো ঘটনা।

সেই পরিচয় ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে।

মেয়ের মনের ভাব কি বা সে কোন্ পথ ধরে চলেছে, একথা যে গোবিন্দবাবুর অজানা ছিল, তা নয়। তবে ইচ্ছা করেই তিনি বাধা দেননি। কেন দেবেন? সুবীরেব মত সুপাত্রকে জামাই হিসেবে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা!

সুবীর পত্রিকাটি একপাশে রেখে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আরো চিন্তা-ভাবনা করবে, সে অবকাশ কিন্তু আর পেল না। লক্ষ্য করল, গেট পেরিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছেন হোটেল মারিনার সুবিখ্যাত প্রোপ্রাইটার কাম-ম্যানেজার অমিয় ভৌমিক।

বয়স বোধহয় এখনো পঁয়তাল্লিশ ছাপিয়ে যায়নি। চওড়া হাড় বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। ব্যাকব্রাস করা চুলের দু'পাশে সামান্য রুপোলী আভা। এখনো বুঝতে পারা যায়, এককালে মুখ-চোখ জেল্লাদার ছিল। নিখুত ও-দেশী পোশাকে নিজেকে মুড়ে এনেছেন।

একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন সুবীরের দিকে, সুপ্রভাত—সুপ্রভাত মিস্টার সান্যাল!

মৃদু হেসে সুবীর বলল, সুপ্রভাত। আসুন, বসুন। বেশ বুঝতে পারছি, বিনা প্রয়োজনে সাত-সকালে আসেননি—

বলাই বাহুল্য। আজ সন্ধ্যেবেলা আমার হোটেলে দয়া করে আসতে হবে ছোটখাট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

অনুষ্ঠান! উপলক্ষ্যটা কি?

হোটেলের অ্যানিভার্সারি। মারিনার মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যেও এই অনুষ্ঠান বলতে পারেন।

মারিনা ডিকোস্টা নামে একটি মেয়েকে এককালে দারুণ ভালবাসতেন অমিয়

ভৌমিক, একথা সুবীরের অজানা ছিল না। তখন উনি কলকাতায় থাকতেন। দু'জনের জীবন বাঁধা পড়বে যখন ঠিক, তখনই সেই গোয়ানিজ মেয়েটি মারা গেল। ভীষণ আঘাত পেলেন ভৌমিক। শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়েই কাটালেন কিছুদিন। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। কি সূত্রে যেন এখানে এসে, মারিনার নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এই হোটেল।

নিশ্চয় যাব। আর কাকে কাকে বললেন?

মোটামুটি সকলকেই বলছি। রোহাতগী সাহেব যাবেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, আপনার তিনিও উপস্থিত থাকছেন।

তিনি! কার কথা বলছেন?

অবুঝ হবার চেষ্টা করবেন না মশাই। স্বকন্যা গোবিন্দ সরকার আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আপনি যাবেন, আর শ্রীমতী সেখানে থাকবেন না, তা কি হয়! তাই তো—

কথা শেষ না করেই তিনি সজোরে হেসে উঠলেন।

সুবীর বলল, আপনি রসিক ব্যক্তি।

আরো মিনিট পনেরো কথাবার্তা বলে চা খেয়ে অমিয় ভৌমিক উঠলেন।

বেলা বারোটা পর্যন্ত অলসভাবেই কাটিয়ে দিল সুবীর। এই ঠাণ্ডায় প্রতিদিন স্নান করার কথা তো ভাবাই যায় না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে যখন বসল, তখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে একটা। এই ফিয়েটখানা মাস ছ'য়েক হল কিনেছে সুবীর। দামের অর্ধেক অবশ্য কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

বাংলো থেকে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে পৌঁছতে মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগল না। আগেকার গাছপালা কিছু রেখে দিয়ে মনোরম পার্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রেমিক--প্রেমিকাদের এটি একটি আদর্শ মিলনকেন্দ্র। যে কোন সন্ধ্যায় এখানে এলেই তার সারবত্তা বুঝতে পারা যায়।

পার্কের দক্ষিণ দিকে যে ছোট গেট আছে, তারই সামনে গাড়ি থামাল সুবীর। বড় পাকুড় গাছটার তলায় যে বেঞ্চ আছে, তাতেই দু'জনে গিয়ে বসবে—এই রকম স্থির হয়ে আছে। একটা বাজতে এখনো কয়েক মিনিট বাকি আছে, রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সুবীর গেট পেরিয়ে ভেতরে এল।

ঝিকি নির্দিষ্ট বেঞ্চেই বসে রয়েছে।

ওকে দেখেই অনুযোগের সুরে বলল, কতক্ষণ বসে আছি বলো তো?

হেসে সুবীর বলল, তুমি যদি সকাল থেকে এখানে বসে থাকো, সে অপরাধ কি আমার? আমি কিন্তু ঠিক সময়ে এসেছি।

এত মিনিট সেকেণ্ড দেখে সব করা যায় না।

যায় না বুঝি! বলে সুবীর ঝিকির কাছ ঘেঁষে বসল।

একটু সরে বসে ঝিকি বলল, এই—অসভ্যতা করবে না বলছি! ভুলে যেও না আমরা পার্কে বসে আছি।

থাকলেই বা! ধারে-কাছে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

তুমি বাপু আজকাল ভীষণ হ্যাংলা হয়ে পড়ছ।

হ্যাংলামি নয় ; বুঝছ না কেন, ভাল-মন্দ খেয়ে আজকাল স্বভাবটা একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে।

হাসি চেপে ঝিকি বলল, তা হোক। তবু এখন বাড়াবাড়ি করবে না।

বেশ, তাই হবে ম্যাডাম। আমার মত ইয়েস ম্যান তুমি আর পাবে না।

জানতে পারি কি, ইয়েস ম্যানটি এই ভরদুপুরে আমাকে এখানে আসতে বলেছে কেন? ছুটির দিন যে একটু বিশ্রাম করব, তারও উপায় নেই।

বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি জেনে দারুণ দুঃখিত। কিন্তু এখন যে আমি তোমাকে ডেকেছি একটা জরুরী কথা বলতে। তার আগে বলো, হোটেল মারিনার পার্টিতে আজ যাচ্ছ কি না?

যাবার ইচ্ছে বিশেষ ছিল না। সকালে মিসেস মিরানীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি পীড়াপীড়ি করছেন—যেতেই হবে।

মিসেস মিরানী...মানে, শামসেরনগরের বিউটি কুইন?

কথায় কথায় তিনি তোমার কথাও তুললেন। খুব প্রশংসা করছিলেন। তোমার মত স্মার্ট ছেলে নাকি এখানে একটিও নেই।

বলো কি! এ তো রীতিমত ভাবনার কথা! মিসেস মিরানী না হয় বিবাহিতা মহিলা, কিন্তু হালচাল দেখে মনে হয়, কিছু কুমারী মেয়েও আমার দিকে তাক করে বসে। তার মানে...

তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। জরুরী কি কথা আছে বলছিলে, এবার বলবে কি?

বাঃ, বলব না মানে?

তারপর একটু থেমে ঝিকির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সুবীর বলল, তুমি আমাকে চটপট বিয়ে করে ফেলো।

ঝিকি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছ?

কত সহজভাবে কথাটা বললে!

না বলে উপায় কি! দেখছ তো চারধারের রকম-সকম, কে কখন আমার গলায় ঝুলে পড়বে! তার চেয়ে—

এবার ঝিকি হেসে ফেলল।

ভাবছি তোমার আবেদন মঞ্জুর করব কিনা। এবার বলো তো, পার্টিতে আমি যাব কি না কেন জানতে চাইছিলে?

কেন আবার! অমিয় ভৌমিক আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে সকলকে বলবে, এঁদের শিগগীরই বিয়ে হচ্ছে।

সত্রাসে ঝিকি বলল, না, না, অমিয় ভৌমিককে এত সমস্ত কথা তুমি বলতে দেবে না। বুঝছ না কেন, ওখানে বাবা থাকবেন—

থাকলেই বা। তাঁর ষোল আনা মত আছে।

থাক। তবুও না। ভারি লজ্জা করবে আমার।

লজ্জা তো নারীর ভূষণ ঝিকি। যাক, তোমার যখন এত আপত্তি, তখন ও ব্যাপারটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু এবার যে তোমার বলতেই হবে, কবে থেকে তুমি আমার বাংলোতে থাকতে আরম্ভ করছ?

সুবীরের দিকে আরো সরে গিয়ে ঝিকি বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! এ সমস্তর আমি কি জানি? বাবা দিন স্থির করবেন, না—

তাই .তা! আচ্ছা, তোমাদের বাড়িতে পাঁজি আছে?

কি বলতে গিয়েও ঝিকি হেসে ফেলল।

আরো ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব করার পর ওরা উঠল ওখান থেকে।

হোটেল মাবিনার নিখুঁত বর্ণনা না দিয়ে, এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে— এটি একটি আধুনিক হোটেলের হুবহু প্রতিচ্ছবি। সন্ধ্যা হবার মুখেই অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলেন। এঁরা এই শহরেরই গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইভনিং স্যুট পরিহিত অমিয় ভৌমিক হাসিমুখে সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

বিরাট স্টুডিবেকার থেকে এ সময় নামলেন দৌলত রোহাতগী। বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। চেহারায় কিন্তু জরার চিহ্ন নেই। বেশ শক্ত-সমর্থ। চোয়ালের হাড়েব কাঠিন্য দেখে মনে হয়, তিনি মেজাজের লোক।

সময়োচিত সম্ভাষণ করে ভৌমিক তাঁকে হলে নিয়ে চললেন। এই সময় সুবীর এসে পড়ল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখা হয়ে গেল মিসেস মিরানীর সঙ্গে। প্রগাঢ় যৌবনা এই বিউটি কুইন যে-কোন পুরুষের মনে হেলায় হিল্লোল এনে দিতে পারে। উঁচু মহলের অনেক পুরুষের সঙ্গে আছে তাঁর নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা। এই কারণেই প্রচুর দুর্নাম তাঁর।

এঁর স্বামী আমীরচান্দ মিরানী একজন শিক্ষিত এবং অতি সজ্জন প্রকৃতির মানুষ। একজন সয়েল সায়েন্টিস্ট। দিল্লী থেকে ওঁকে পাঠানো হয়েছে শামসেরনগরের বাইরের কিছু অংশ পরীক্ষা করে দেখতে। ওখানে কি পরিমাণ তামা মাটির তলায় থাকতে পারে, তার একটা মোটামুটি হিসেব উনি তৈরি করবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মত মানুষ উচ্ছলস্বভাবা স্ত্রীকে সংযত করে রাখতে পারেননি। স্বাভাবিক কারণেই তিনি হীনমন্যতায় ভুগছেন।

মিষ্টি হেসে মিসেস মিরানী বললেন, হ্যালো মিস্টার সান্যাল, আপনার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না!

ফ্যাক্টরিতে ভীষণ কাজের চাপ চলেছে। মিস্টার মিরানী এলেন না?

শরীর ভাল নেই। জানেন তো উনি হাইপ্রেসারের রুগী?

শুনেছিলাম যেন! চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সুবীর ভেতরে চলেগেল। একবার কাঁধ নাচিয়ে নিয়ে মিসেস মিরানী অনুসরণ করলেন তাকে।

নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে আজ হলটিকে। অতিথিরা প্রায় সকলেই এসে পড়েছেন। কেতাদুরস্ত বয়রা ঠাণ্ডা ও গবম পানীয় পবিবেশন করে গেছে। সকলের হাতে হাতে গেলাস।

সুবীরকে দেখে ডাঃ দুলাল চৌধুরী এগিয়ে এলেন। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। অল্প কিছুদিন হল ভদ্রলোক এখানে এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই দারুণ পসার হয়েছে তাঁর। এ ছাড়া সদালাপী ও রসিক হিসেবেও তাঁর বেশ সুনাম হয়েছে পরিচিত মহলে।

সুবীরের কাঁধে অল্প একটু চাপ দিয়ে তিনি বললেন, মহিলাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মনে হচ্ছে?

পাগল হয়েছেন! বাইরে দেখা হয়ে গেল।

উনি কিন্তু আপনার সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড। দিন কয়েক আগে আমার চেম্বারে এসেছিলেন। সাগ্রহে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

আরেকজনের মুখ থেকেও এই রকম কথা শুনলাম। ওঁরই পেছনে তো লোক ছুটোছুটি করে শুনেছি। উনি আবার—

মৃদু হেসে ডাঃ চৌধুরী বললেন, এদিকে খুব সেয়ানা। যারা ছুটোছুটি করে, তাদের কাছ থেকে কিভাবে টাকা আদায় করতে হয়, তা উনি ভালই জানেন। আবার মনের খোরাকও তো চাই। তা হয়ত আপনার মত একজনকে—

আমি মিস্টার মিরানীর কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক এ সমস্ত বরদাস্ত করেন কি করে?

হয় ভদ্রলোক এক নম্বর গবেট, নয়ত স্ত্রীকে এইভাবে রোজগার করতে উৎসাহ দেন! এখন ওঁর প্রধান মক্কেল কে জানেন?

কে?

শামসেরনগরের সেরা মানুষ যিনি। আমি আপনার কর্তার কথা বলছি।

বলেন কি? বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল সুবীর। আপনি মিস্টার রোহাতগীর কথা বলছেন? তিনি তো বুড়ো মানুষ!

হলেই বা! অনন্ত যৌবন পুরুষের অভাব নেই মিস্টার সান্যাল। চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া থাকলে আপনি এত অবাক হতেন না।

কথা বলতে ও শুনতে থাকলেও সুবীরের চোখ ঘুরছিল হলের চারধারে। ঝিকিকে আবিষ্কার করা এবার সম্ভব হল। কোণের দিকে দাঁড়িয়ে সে একজন মহিলার সঙ্গে গল্প করছিল। এখনও সে ওকে দেখতে পায়নি বোধহয়।

সুবীর অন্যমনস্কভাবে বলল, আপনি ডাক্তার হয়ে যখন বলছেন, তখন অবশ্য আমাকে ব্যাপারটা মেনে নিতেই হচ্ছে। তবে—

ওর কথা শেষ হবার আগেই বেঁটেখাটো, ফিটফাট এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। ইনি মিস্টার রোহাতগীর একান্ত সচিব। কাজের লোক হিসাবে এঁর বিশেষ সুনাম আছে। ছায়ার মত ঘুরতে থাকেন কর্তার সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন, এই যে মিস্টার ভার্মা। আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।

ভার্মা ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, তাই নাকি? কোন কথা আছে নাকি?

জরুরী কথা ছিল। একান্তে বলতে চাই। সুবীরবাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন—

বিলক্ষণ। আপনারা কথা বলুন। আমি ওধারে যাই একটু।

ভার্মা বললেন, আমি যেজন্যে এখানে এলাম, সেকথাটা এবার সেরে নিই। মিস্টার সান্যাল, আপনাকে স্যার ডাকছেন।

সুবীর কিছু না বলে মিস্টার রোহাতগী যেখানে বসেছিলেন, সেই দিকে পা চালাল। ঝিকির পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখাচোখি হল দু'জনের। তার চোখের তারায় শাসনের ইশারা। অর্থাৎ এখানে কোনরকম বাড়াবাড়ি করবে না।

মৃদু হেসে সুবীর বড়কর্তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। রোহাতগী তখন অমিয় ভৌমিকের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন।

আমাকে ডেকেছেন স্যার?

মনে হল তিনি চমকে উঠলেন।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তোমাকেই খুঁজছিলাম! ডিনারের পরই চলে যেও না যেন!

কোন কাজ—

না, না, কাজ কিছু নেই। ব্রীজ খেলব ভাবছি। গোটা ছ'য়েক রাবার শেষ করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, কি বলো ভৌমিক?

সবিনয়ে অমিয় ভৌমিক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আরেকজন লোক তো চাই। ফোর্থ ম্যান হিসাবে আপনি কাকে চাইছেন?

লালা হংসরাজকে বলুন।

বলা যেতে পারে। আমি দেখছি।

বিচিত্র খেয়ালের অধিকারী এই প্রচণ্ড ধনী ব্যক্তিটি। ব্রীজ খেলার প্রতি তাঁর যে প্রচণ্ড ঝোঁক আছে, তা নয়। তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। সুবীরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আরো কয়েকবার খেলেছেন এখানে-ওখানে। নিজের প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত মধুর।

রোহাতগীর সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে সুবীর সরে এল।

সরে আসতেই হল। কারণ, শরীরে বিচিত্র হিল্লোল তুলে মিসেস মিরানী তখন ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দক্ষিণ দেওয়ালের ধার ঘেঁষে যে হাই ব্যাক চেয়ারটা ছিল, তাতেই গিয়ে বসল সুবীর। ঝিকি উপস্থিত রয়েছে, অথচ কথা বলা যাচ্ছে না—ভীষণ খারাপ লাগছে ওর।

আরও কিছুক্ষণ পরেই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ হল। অর্থাৎ কয়েকজন অতিথি হোটেল মারিনার দীর্ঘজীবন কামনা করে দু'চার কথা বললেন। দুটি মিলনান্তক গানের সুর বাজিয়ে শোনাল হোটেলের অর্কেস্ট্রা। আর মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই ডিনারের ডাক পড়বে আশা করা যায়।

এই সময় সুবীর লক্ষ্য করল, মিস্টার রোহাতগী চাপা গলায় অমিয় ভৌমিককে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ভৌমিক হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক

পরে রোহাতগীও সেই পথে অদৃশ্য হবার পর সুবীর দ্রুত চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

হলে মিসেস মিরানী নেই।

ডাঃ চৌধুরী কাছেই ছিলেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। সুবীর মৃদু হাসল।

ক্রমে ডিনারের সময় হল। তখন কিন্তু মিসেস মিরানী ছাড়া আর সকলকেই দেখা গেল টেবিলের ধারে। মাপা মাপা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ডিনার শেষ হল এক সময়ে।

অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। শুধু রয়ে গেলেন চারজন ব্রীজ খেলোয়াড়।

খেলা বেশ জমে উঠল। কিন্তু তিনটি রাবারের বেশি এগোনো সম্ভব হল না। জরুরী ফোন এল ফ্যাক্টরি থেকে। কি এক যান্ত্রিক গোলযোগ নাকি হয়েছে ওখানে। সুবীর এখানে আছে, নাইট সিফটের ফোরম্যানের তা জানা ছিল, তাই সে ফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছে। রোহাতগীর মুখে কিন্তু চিন্তার ছায়া পড়ল না। তিনি জানেন পরিস্থিতি যত গোলমেলেই হোক না কেন তাঁর দক্ষ কর্মচারিরা তা সামলে নিতে পারবে।

সুবীর বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল।

মৃদু হেসে রোহাতগী বললেন, বেশি দায়িত্বশীল হবার ঝামেলা অনেক। অবকাশ যাপনের স্বাধীনতাও থাকে না।

লালা হংসরাজ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ঠিক বলেছেন।

বিকল যন্ত্রটিকে ঠিক মত চালু করে কারখানা থেকে বেরোতে সুবীরের প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লেগে গেল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে সবে কিছুদূর এগিয়েছে, লক্ষ্য করল থানা-ইনচার্জ সাইকেলে চড়ে বিপরীত দিক দিয়ে আসছেন। এত রাত্রে কোথা থেকে তদন্ত সেরে ফিরছেন?

সুবীর গাড়ি থামিয়ে বলল, হ্যালো ইন্সপেক্টর! কোথা থেকে?

সাইকেল থেকে নেমে জাঁদরেল প্রকৃতির ওমপ্রকাশ বললেন, রাউণ্ডে বেরিয়েছিলাম। আপনি—?

কারখানা থেকে ফিরছি। আপনাব দাপটে তো শহরের সমস্ত চোর-ছ্যাঁচড় টিট হয়ে গেছে। রাত জেগে আর রাউণ্ড দিচ্ছেন কেন?

দিতে হয়। চোর-ডাকাত ছাড়াও, রাতের অন্ধকারে আরো অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই তো কিছুক্ষণ আগেই একজন পরীর দেখা পেলাম।

পরী—?

ওমপ্রকাশের গম্ভীর-মুখে গূঢ় হাসি দেখা দিল।

এই শহরের মক্ষিরাণী। মিসেস মিরানীকে দেখলাম পাম অ্যাভিনিউ দিয়ে চলেছেন। একা।

একদম একা। অভিসার সেরে ফিরছেন বোধহয়! আমি তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেছিলাম। রাজি হলেন, না। আপনাকে আর আটকাব না। চলি!

ওমপ্রকাশ সাইকেলে চড়লেন।

সুবীর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

...এতক্ষণ ভাবতে থাকলেও সুবীর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েনি। সংযত হাতেই স্টীয়ারিং চালিত হয়েছে। কারখানা থেকে ওর বাংলো অনেকখানি। তবে আশার কথা অধিকাংশ পথই পার হয়ে এসেছে। শামসের গার্ডেনের পাশ দিয়ে এখন গাড়ি চলছে। শহরের সেরা পার্ক। বড় বড় বিন্দু বিন্দু আলোর মেলা চোখ ভরে দেখতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ সুবীরের দৃষ্টি পড়ল ডান ধারের একটা বাড়ির ওপর। হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গরম ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিঃ মিরানী। ব্যাপার কি? এত রাত্রে তিনি ওইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?

সুবীরকে আবার গাড়ির গতি কমাতে হল।

মিরানী ওকে দেখতে পেয়েছিলেন। এগিয়ে এলেন তিনি।

এত রাত্রে গেটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

চিন্তিত গলায় মিঃ মিরানী বললেন, আমার স্ত্রীর জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তিনি এখনও ফেরেননি। আপনি তো পার্টিতে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ও ক'টায় বেরিয়েছিল বলুন তো?

সুবীর গাড়ির চাবি বন্ধ করল। মহিলাটি যে ডিনার না সেরেই হোটেল মারিনা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ আগে যে ইন্সপেক্টর তাঁকে পাম অ্যাভিনিউ ধরে এগোতে দেখেছেন, সেকথাও বলতে পাবল না, বলা যায় না মায়া হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্যে।

আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।

ডিনার শেষ হয়েছিল ক'টায়?

প্রায় দশটায়।

এখন দেড়টা। এতক্ষণ ও আছে কোথায়?

চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। মনে হয় কোন বান্ধবীর বাড়ি আটকে পড়েছেন। এখুনি হয়ত এসে পড়বেন।

এসে পড়লেই ভাল। যাই বলুন মিস্টার সান্যাল, মেয়েমানুষের পক্ষে এতটা বেপরোয়া হওয়া ঠিক নয়।

সুবীর চুপ করে রইল। একথার সে কি উত্তর দেবে?

তিনি আবার বললেন, আসুন, ভেতরে গিয়ে একটু বসি। এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক।

এত রাত্রে!

তা হোক। একলা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। আসুন—

প্রবল অনিচ্ছা নিয়েই গাড়ি থেকে নামল সুবীর। তারপর মিরানীর পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর।

ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। অতিথিদের এখানেই আপ্যায়ন করা হয় অনুমান করা গেল। ভদ্রলোকের মনের অবস্থা বিবেচনা করে ওকে এখানে আসতে হল। সোফায় বসল সুবীর।

আমি কফি করে নিয়ে আসি।

আপনি কেন? কাউকে বলুন না!

চাকরটা ঘুমোচ্ছে। ওকে আর জাগাব না। আপনি বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফি করে নিয়ে আসছি।

মিরানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিরসমুখে বসে রইল সুবীর। মাঝরাতে একি ঝামেলা! এরকম অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে আগে বুঝতে পারলে অন্য পথ দিয়ে বাসায় ফিরত। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

পাক্কা পনের মিনিট পরে মিরানী দু'কাপ কফি হাতে করে ফিরে এলেন।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুবীর বলল, চমৎকার কফি বানিয়েছেন।

সেকথায় কান না দিয়ে মিরানী বললেন, আপনি স্ত্রী-স্বাধীনতা পছন্দ করেন?

মাত্রা বজায় থাকলে পছন্দ করি।

আমার স্ত্রী মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। অথচ দেখুন, আমি ছিলাম রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে। কিন্তু উঁচুদরের চাকরিই আমাকে সাহেব করে তুলল। স্ত্রীকে দিলাম অবাধ স্বাধীনতা। তখন—

ওকথা থাক মিস্টার মিরানী।

থাকবে কেন? তখন বুঝতে পারিনি অবস্থা এমন দাঁড়াবে। লজ্জায় কোন সমাবেশে এখন যেতে পারি না। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলি।

এবার আমি উঠব।

উঠবেন?

হ্যাঁ। প্রায় দুটো বাজে।

কথা শেষ করেই সুবীর সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। কথা যে-ধারে ঘেঁষে চলেছে, তাতে কোন মন্তব্য না করাই ভাল।

কিন্তু কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারবে? মিরানী এলেন গেট পর্যন্ত। কি যেন বলতে গিয়েও বললেন না। শুভরাত্রি জানিয়ে সুবীর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

মিরানী এবার অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমি কি পুলিশে খবর দেব?

আরো কিছুক্ষণ দেখুন, তারপর না হয়—

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তখনও যদি না ফেরে, পুলিশে খবর দিতেই হবে।

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল সুবীরের। সাড়ে তিনটের পর নিজেকে বিছানার কোলে সঁপে দিতে পেরেছিল। কাজেই ঘুম ভাঙতে দেরি হবেই। প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় কারখানায় পৌঁছয়। আজ আর তা সম্ভব হল না। তবে আন্দাজ দশটার সময় নিশ্চয় পৌঁছতে পারবে।

দ্রুত প্রাতঃক্রিয়া সেরে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল।

রবিবার বা ছুটির দিন ছাড়া সকালে দৈনিকপত্র পড়ার সুযোগ হয় না। আজ

সে সুযোগ পাওয়া গেছে। দৈনিকে চোখ বোলাতে বোলাতেই প্রাতঃরাশ শেষ করল। চাকরকে ডেকে এক বালতি জল রেখে আসতে বলল গ্যারাজের কাছে। তারপর বারান্দা থেকে নেমে এল বাগানে। আজ নিজের হাতেই গাড়িটা ধোয়া-মোছা করবে।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বাগানে একটা চক্কর মেরে গ্যারাজের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে জলের বালতি রেখে গেছে চাকরটা। নিজের গাড়ির পরিচর্যা মাঝে মাঝে নিজের হাতে করা ভাল। ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে চাবি বার করে সুবীর তালা খুলল। তারপর পাল্লা দুটো সরিয়ে দিল হাট করে।

গাড়িটা গ্যারাজের বাইরে নিয়ে এলেই পরিষ্কার করতে সুবিধে হবে। স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসতে যাবার আগেই মনে হল, পেছনের সীটের ওপর কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। গ্যারেজেব ভেতর তেমন আলো প্রবেশ করে না। আবছা ভাব। ভাল করে দেখে বুঝতে পারল, ভ্যানিটি ব্যাগ।

বিচিত্র ব্যাপার! তার গাড়িতে ভ্যানিটি ব্যাগ এল কোথা থেকে?

ব্যাগটা কার, হাতে নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখার আগ্রহ নিয়ে পেছনের দরজাটা খুলতেই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল সুবীর। পা-দানির অল্প-পরিসর ফাঁকে মিসেস মিরানীর আড়ষ্ট দেহ পড়ে রয়েছে। শাড়িটা রক্তে মাখামাখি। রক্তের রঙ অবশ্য এখন লাল নেই, শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে।

খুন !!!

কিন্তু তার গাড়ির মধ্যে মৃতদেহ এল কিভাবে?

সুবীরের শরীরে ঘামের বন্যা নামল। দুরন্ত ভয় আশঙ্কা শরীরের মধ্যে পাক দিতে আরম্ভ করেছে। এ কি দুর্বিপাকের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল সে? ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। পুলিশ নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে খুন সে-ই করেছে। তাদের দোষ দেওয়া যাবে না। পরিস্থিতি আঙুল উঁচিয়ে বলছে, সুবীর সান্যালই হত্যাকারী।

নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে সুবীর শিউরে উঠল। শোচনীয় মানসিক আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য নিজের শরীরকে দ্রুত কয়েকবার ঝাঁকানি দিল। আশু কর্তব্য হল ব্যাপারটাকে জানাজানির হাত থেকে রক্ষা করা। কোনরকমে টলতে টলতে বেরিয়ে এল গ্যারাজ থেকে। দরজায় তালা লাগিয়ে শোবার ঘরে যখন পৌঁছল তখন সে হাঁপাচ্ছে।

খাটের ওপর বসে পড়ে মনকে দৃঢ়ভাবে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল। মৃতদেহ কি উপায়ে এবং কখন গাড়ির মধ্যে এল তা জানা বিশেষ দরকার। হোটেল মারিনায় কিছু ঘটেনি। কারণ, ডিনারের আগেই মিসেস মিরানী ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তার অনেক পরে ইন্সপেক্টর তাঁকে জীবিত অবস্থায় পাম অ্যাভিনিউয়ে দেখেছেন।

তবে?

পরমুহূর্তে মনের আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তবে কি মিঃ মিরানীর বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে যখন ভেতরে গিয়েছিল, তখনই মৃতদেহ চালান করে দেওয়া হয়েছে? নিশ্চয় তাই। কিন্তু ওই সময় যে ওখানে সে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে যাবে,

তা তো আগে থেকে স্থির ছিল না? এ তো সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার! তবে—?

একটা সন্দেহ এবার মনের মধ্যে প্রবলভাবে পাক দিয়ে উঠল। তবে কি স্ত্রীর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মিঃ মিরানী তাঁর রক্তে হাত বাঙিয়েছেন? নিশ্চয় তাই!

মৃতদেহ অন্যত্র চালান করে না দিলে সন্দেহমুক্ত হতে পারবেন না। হযত পার্কেই ফেলে আসবার ইচ্ছে ছিল। তাই বোধহয় গেটের সামনে গিয়ে চারিদিক ভাল করে দেখে নিচ্ছিলেন। এমন সময় তাকে দেখতে পেয়ে অন্য এক সুযোগের সন্ধান পেলেন তিনি। কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে একরকম জোর করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কফি তৈরি করে ফিরে আসতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল। আর সময় নেই, ওই সময়ই তিনি মৃতদেহ গাড়ির মধ্যে রেখে এসেছেন।

ভাবতে ভাবতে সুবীরের মাথা গরম হয়ে উঠল।

পুলিশকে সমস্ত কথা বললে কি রকম হয়? মিঃ রোহাতগীরও সহযোগিতা নেওয়া চলতে পারে। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁর প্রভাবে সন্দেহমুক্ত হওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

এদিকে ঘরে যে আরেকজন এসে উপস্থিত হয়েছে, গভীর চিন্তায় তন্ময় থাকার দরুণ সুবীর বুঝতে পারেনি। ঝিকি কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠল।

একি! তুমি?

কি এত ভাবছ বসে বসে?

তুমি এ সময় কিভাবে এলে ঝিকি?

কারখানায় ফোন করেছিলাম। শুনলাম, তুমি যাওনি। তখন আমাকেই এখানে আসতে হল। কাল পার্টিতে কথাবার্তা বলিনি, বাবুর হয়ত রাগ হয়েছে। আগে কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জন করত। এখন দিনকাল পাল্টে গেছে—বাধাদেরই এখন কৃষ্ণকে তুষ্ট রাখতে হয়।

ঝিকি কথা শেষ করে হেসে উঠল।

সুবীর কিছু বলল না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হয়েছে বল তো?

আমি দারুণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

কিসের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ? আমাকে সমস্ত খুলে বল—

সেকথা বলা যায় না। মানে—

আমাকেও বলা যায় না?

সুবীর ঝিকিকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল, না, না, এ আমি কি বলছি? তোমাকে ছাড়া সমস্ত কথা বলার আর তো আমার কেউ নেই! ঝামেলা নয়, আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।

কি বিপদে পড়েছ তাড়াতাড়ি বল। আমার কেমন ভয় করছে।

ঝিকিকে ছেড়ে দিয়ে সুবীর হাই-ব্যাক চেয়ারটায় গিয়ে বসল। তারপর বলে গেল

একে একে সমস্ত কথা। ঝিকি চেয়ারের হাতলে বসে বিবর্ণ মুখে শুনে গেল। এরকম বিপদেও মানুষ পড়ে!

কোনরকমে বলল, পুলিশকে এ সমস্ত কথা জানিও না।

না জানালে ডেডবডি যে গাড়ির মধ্যেই পচতে থাকবে!

তুমি বুঝতে পারছ না, মিস্টাব রোহাতগীও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না। পুলিশ তোমাকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু—

আমার কথা শোন লক্ষ্মীটি। পুলিশের কাছে কোনমতে তোমার যাওয়া চলবে না। তার চেয়ে—

তার চেয়ে কি?

আমি বলছিলাম, ডেডবডিটা কোথাও ফেলে এলেই তো হয়! যেমন, জঙ্গলের ধারেই ফেলে আসা যায়। ওখানে তো লোকজন যায় না।

জঙ্গলে বলছ?

সুবীর দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। ঝিকি ঠিকই বলেছে, পুলিশের আওতায় গেলে গোলমাল আরো বাড়বে। সুতরাং সন্দেহমুক্ত হবার জন্য প্রয়াস চালানোই ভাল। পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। জঙ্গলের ধারে ডেডবডি ফেলে এলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। পুলিশ তখন প্রকৃত হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াবার জন্য তৎপর হবে।

এরপর দুজনের মধ্যে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে গভীর আলোচনা আরম্ভ হল।

গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ইন্সপেক্টর ওমপ্রকাশ দারুণ গম্ভীর মুখে থানায় নিজের চেয়ারে বসে আছেন। মাঝে-মধ্যে চুরি-চামারি এখানে হয়, রাগারাগির দরুণ দু-চারটে খুন-জখমও যে হয় না, তা নয়। জটিল কেসের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানে যে কেসের মুখোমুখি ইন্সপেক্টর হয়েছেন, তা যেমন জটিল, তেমনিই রহস্যজনক। তাই তাঁর মুখে আষাঢ়েব ঘন মেঘ।

গতকাল সকালে মিঃ মিরানী এসে সংবাদ দিয়েছিলেন, গতরাত থেকে তাঁব স্ত্রীকে পাওযা যাচ্ছে না। অনুসন্ধান করে দেখবেন বলে ভদ্রলোককে বিদায় দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এ সম্পর্কে কিছু করার নেই। যে মহিলা রাত-বেরাত একলা ঘুরে বেড়ান, যাঁর অনেক পুরুষ সঙ্গী আছে, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত কোথাও গিয়ে কারুর সঙ্গে অবৈধ আমোদ চালাচ্ছেন। ক্লান্তি এলেই পাখি নীড়ে ফিরে আসবে।

কিন্তু আজ দুপুরে তাঁর সে ধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল। বেলা তখন দুটো। একজন ফোনে ইন্সপেক্টরকে জানাল, ময়নামারির জঙ্গলে একটি মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। সংবাদ-প্রদানকারী কিন্তু পরিচয় দিল না। একটু দ্বিধা করে সদলবলে ইন্সপেক্টর যাত্রা করলেন ঘটনাস্থলের দিকে। বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। মৃতদেহ পাওয়া গেল এবং চিনতে পারলেন তিনি মিসেস মিরানীকে।

নিজের হতবাক অবস্থাকে কাটিয়ে উঠেই ইন্সপেক্টর ঝড়ের বেগে তদন্ত আরম্ভ

করলেন। ঘটনাস্থল তোলপাড় করেও কোনও মূল্যবান সূত্রের সন্ধান পাননি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও টায়ারের দাগ দেখে শুধু এটুকু বুঝতে পারা যায় খুন এখানে হয়নি। মৃতদেহ অন্য কোথাও থেকে বয়ে এনে এখানে ফেলা হয়েছে।

একজন সাব-ইন্সপেক্টব ঘরে প্রবেশ করল। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। একে দিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছিল। এই উত্তেজনার কারণ কি? বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে নাকি? ওমপ্রকাশ বিস্মিত .দৃষ্টিতে তাকালেন।

মর্গ থেকে বেরিয়েই বাচ্চুর সঙ্গে দেখা হল বড়বাবুর।

ইনফর্মার বাচ্চু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ও একটা জবর খবর দিল।

কি রকম?

বনোয়ারি নামে একজন লোক কাঠ কাটতে প্রায়ই যায় জঙ্গলে। তার কাছ থেকে বাচ্চু খবর পেয়েছে, সে দেখেছে—একজোড়া মেয়ে-পুরুষ একটা বাদামি রঙের গাড়ির মধ্যে থেকে একটি মৃতদেহ বার করে ওখানে ফেলে দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ওমপ্রকাশ লাফিয়ে উঠলেন, বল কি? ব্যাটা আগে এসে আমাদের খবর দেয়নি কেন?

খবর দিতেই নাকি আসছিল। আমরা গিয়ে পড়ায় আর আসে নি। ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়।

এ এক মোক্ষম সূত্র। শহরে বাদামি গাড়ি আর ক'টা আছে বল না? কি নাম বললে লোকটার—বনোয়ারী? তাকে এখুনি হাজির করো। জেরা করলে আরো মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যাবে।

বাচ্চুকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাকে নিয়ে উপস্থিত হবে।

এতক্ষণে হাল্কা হলেন ইন্সপেক্টর ওমপ্রকাশ। এই জটিল কেসের সুরাহা করা যাবে মনে হচ্ছে। গোঁফের দু'পাশে কয়েকবার মোচড় দিয়ে হাই তুললেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সিগারেট ধরাবার জন্য।

গত রাত্রে সুবীরের ভাল ঘুম হয়নি। বিপদ কেটে যাবার পর মনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসাই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে প্রগাঢ় ঘুম হওয়ারই কথা, কিন্তু তা হয়নি। কারণ, মাথাব্যথা ওকে অস্থির করে তুলেছিল। শেষরাত্রি থেকে জ্বর-জ্বর বোধ করছে। সকাল হবার পরই ডাঃ চৌধুরীকে কল দিল।

ডাঃ চৌধুরী স্টেথিস্কোপ কোটের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আনিয়ে নিন।

সুবীর বিছানায় উঠে বসে বলল, সেদিন পার্টি থেকে ফেরার পথে বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছিল।

হতে পারে।

ডাঃ চৌধুরী প্রেসক্রিপশান লিখতে লাগলেন।

একটু থেমে সুবীর বলল, কি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল বলুন তো? মিসেস মিরানীর মত মহিলা খুন হবেন কে ভেবেছিল!

শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনা এখানে তো ঘটে না। মিঃ মিরানীর জন্যে দুঃখ হয়। কাল দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে।

কি বললেন?

বিশেষ কিছু বললেন না। ঝিম মেরে গেছেন।

আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

সন্দেহ করার মত লোকের অবশ্য অভাব নেই। ব্যাপারটা কি জানেন, নারীঘটিত ব্যাপারের ঈর্ষা অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। আর এই ঈর্ষাই সময় সময় মানুষকে খুনী করে তোলে।

চাকর এসে জানাল, দারোগাসাহেব এসেছেন।

সুবীরের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ইন্সপেক্টর এখানে কেন? কোন সূত্রে ওর কারসাজির কথা জানতে পেরেছেন নাকি? মুখের ভাব যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখেই ও তাঁকে এখানে আনতে বলল।

অসম্ভব গম্ভীর মুখ নিয়ে ওমপ্রকাশ ঘরে এলেন মিনিট কয়েকের মধ্যেই। ঘরে আরেকজনের উপস্থিতি তিনি আসা করেননি। তাঁর মোটা ভ্রূ-যুগল কুঁচকে উঠল। অবশ্য অনুরোধের অপেক্ষা না করেই বসলেন চেয়ারে।

সুবীর বলল, নিশ্চয় কোন প্রয়োজনে এসেছেন ইন্সপেক্টর?

প্রয়োজন বৈকি! তবে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে তৃতীয় কারোর উপস্থিত বোধহয় বাঞ্ছনীয় হবে না। আপনার সম্মানের কথা বিবেচনা করেই আমাকে একথা বলতে হল।

ডাঃ চৌধুরী উঠে পড়লেন।

আমি চলি।

আপনি যাবেন না, সুবীর বলল, ডাক্তার চৌধুরীর কাছে আমার কোন ব্যাপারে সঙ্কোচ নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা আরম্ভ করতে পারেন ইন্সপেক্টর।

বিরক্তিসূচক ভঙ্গি করে ওমপ্রকাশ বললেন, যদিও জানি তবু প্রশ্ন করছি, আপনার গাড়ির রঙ কি বাদামি?

হ্যাঁ।

আমি গাড়িখানা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

কেন বলুন তো?

ওই গাড়িতে মিসেস মিরানীর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে আমরা খবর পেয়েছি।

সুবীর থতিয়ে গেল। সন্দেহ তাহলে অমূলক নয়! প্রচণ্ড ভয়ে যেন দু'হাত দিয়ে ওকে সাপটে ধরল। কিন্তু এখন নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না। ভয়কে জয় করতে হবে যে কোন ভাবে।

এ সমস্ত কি বলছেন?

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে আপনার গাড়ি আর আপনার চেহারার বর্ণনা

আমরা পেয়েছি। সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি কে তাও আন্দাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

আপনার কথাবার্তা আমাকে উত্যক্ত করে তুলছে ইন্সপেক্টর। সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ না পেয়ে কোন ভদ্রলোককে হ্যারাস করলে তার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে পারে, একথা আপনার অজানা নয়। যাই হোক, চাবি দিচ্ছি। গ্যারাজ খুলে গাড়িটা গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সুবীর এগিয়ে গিয়ে হোয়াট নটের ওপব থেকে কী-কেসটা তুলে নিয়ে ওমপ্রকাশের হাতে দিল। তিনি চাবি পেয়েই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডাঃ চৌধুরী এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবাব কিছু বলা দরকার। কিন্তু এইরকম পরিস্থিতিতে কি বলা উচিত ভেবে পেলেন না।

সুবীরই নীরবতা ভঙ্গ করল, পুলিশ পেছনে লেগেছে, খুবই ভয়ের কথা হল!

দোষ যখন করেননি, তখন আর ভয়ের কি আছে?

তা বটে। তবে সময়-সময় তো অনেক নয় হয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাকে গ্রেপ্তার করে বসলেই তো ভবিষ্যতের দফা-রফা হয়ে যাবে।

একটু থেমে ডাঃ চৌধুরী বললেন, শুধু সন্দেহের বশে পুলিশ গ্রেপ্তাব করতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না। তবুও আপনি নিজের ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে রাখুন। মিস্টার রোহাতগীকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।

আপনি ঠিকই বলেছেন।

আরো মিনিট পনের পরে বিরসমুখে ফিরে এলেন ওমপ্রকাশ। গাড়িতে রক্তের দাগ পাবেন এবং সেই রক্ত পরীক্ষা করে জানা যাবে মিসেস মিবানীব শরীরে ওই গ্রুপের রক্ত ছিল এই রকম আশা কবেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও রক্তের দাগ বা সন্দেহজনক আর কিছু দেখতে তিনি পাননি।

কী-কেস ফিরিয়ে দেবাব সময় তিনি বললেন, আমাদের অনুমতি ছাড়া শহরের বাইরে যাবেন না। আমি পবে আসছি। আপনাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে।

এ আপনাদের জুলুম।

খুনের কেস তদন্ত করতে গেলে আমাদের অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। আবার স্মবণ করিয়ে দিচ্ছি, সন্দেহভাজনদের মধ্যে আপনি হলেন একজন। চলি এখন।

ওমপ্রকাশ পায়ের শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ চৌধুরী ও সুবীর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

দৌলত রোহাতগী নিজেই খাস কামরায় বসে দৈনিকপত্র পড়ছিলেন। বেলা বেশ চড়ে গেছে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা তাঁর অভ্যাস নেই, কাজেই দৈনন্দিন কাজকর্ম একটু দেরিতেই আরম্ভ হয়। ঘরে অবশ্য তিনি একা নেই। একান্ত সচিব রাজেন ভার্মাও রয়েছে। সে কি যেন লিখছে।

একসময় কাগজ মুড়ে পাশে রেখে রোহাতগী বললেন, শরীর ভাল বোধ করছি না। কলকাতা যাবার প্রোগ্রাম বাতিল করতে হবে।

রিজার্ভেসন ক্যানসেল করে দেব?

হ্যাঁ। আজই।

ইণ্টারকামে যান্ত্রিক শব্দ হল।

সুইচ অন করতেই ওধার থেকে কেয়ারটেকারের গলা ভেসে এল, মিস্টার রায়সুরানা দেখা করতে চাইছেন।

রামকিশোর রায়সুরানা ওল্ড গোল্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার। চমৎকার স্বভাবের এই ভদ্রলোক বিলিতি ডিগ্রীধারী। এঁকে একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে একরকম ভাঙিয়ে এখানে আনা হয়েছে।

রোহাতগী বললেন, পাঠিয়ে দাও।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই রায়সুরানা ঘরে প্রবেশ করলেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। প্রথম দর্শনেই কেমন যেন মনে হয়, কোন কারখানাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার জন্য এইরকমই একজনের প্রয়োজন।

আপনাকে এই সময় বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত স্যার। বিশেষ একটা প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় আমাকে এখন আসতে হল।

বসুন। কি ব্যাপার?

মিসেস মিরানীর মার্ডারের ব্যাপারে পুলিশ আমাদের স্যান্যালকে সন্দেহ করছে।

সেকি?

আমি সেই রকম রিপোর্ট পেয়েছি।

চিন্তিতগলায় রোহাতগী বললেন, বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ছেলেটিকে আমি ভালভাবেই জানি। তার পক্ষে এ সমস্ত ব্যাপারে জড়িত থাকা অসম্ভব।

আমিও তাই বিশ্বাস করি স্যার। এক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা সান্যালের বিশেষ প্রয়োজন। নইলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

সে কি কথা! আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব হবে, আমি করব কিন্তু পুলিশ তাকে সন্দেহ করছে কেন বলুন তো?

রায়সুরানা বললেন, কিছুক্ষণ আগে ইন্সপেক্টর ওমপ্রকাশ আমাকে ফোন করেছিলেন। পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এখানে আসছেন। আপনি সেদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

পার্টির সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?

ওই পার্টিতে যোগ দেবার পর আর মিসেস মিরানী বাড়ি ফেরেননি ; সান্যালের তখনকার গতিবিধি কি, এ সম্পর্কে পুলিশের আগ্রহ রয়েছে।

ওদিকে—

ফাঁকা অফিসার্স ক্যান্টিনে বসে সুবীর ও প্রকাশের মধ্যে কথা হচ্ছে। সুবীরের আগেকার জেল্লা নেই। ভয়-ভাবনায় সম্পূর্ণ মিইয়ে পড়েছে সে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রকাশ সমাদ্দার তারই মত একজন পদস্থ কর্মচারি। বেশ চটপটে আর প্রাণবন্ত বলে সকলেই ওকে পছন্দ করে।

কলকাতার টেলিফোন গাইড কারো কাছে আছে কিনা, জান?

মিস্টার রোহাতগীর কাছে থাকতে পারে। প্রায়ই কলকাতায় ফোন করেন তো। ভার্মার কাছে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। গাইড কি করবে?

আমি আর চুপচাপ বসে থাকতে চাই না। পুলিশ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দেবে, আমি আর ঝিকি ওখানে মৃতদেহ ফেলে এসেছি! তারপর আমি হত্যাকারী ছাড়া আর কি বল?

প্রকাশকে প্রকৃত ঘটনাটা বলেছিল সুবীর।

কিন্তু তার সঙ্গে টেলিফোন গাইডের সম্পর্ক কি?

আমার বাঁচার একমাত্র পথ হল প্রকৃত হত্যাকারীকে সকলের চোখের সামনে নিয়ে আসা। এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রাইভেট এনকোয়ারির ব্যবস্থা করতে চাই। বাসব ব্যানার্জীর নাম তুমি শুনেছ কিনা জানি না। এ লাইনের তিনি একজন অথরিটি বিশেষ। তাঁকে দিয়েই তদন্ত করাব ভাবছি। তাঁর ফোন নম্বরটা আমার প্রয়োজন।

এই সময় গোবিন্দবাবু এসে পড়লেন। তাঁরও এখন কোন কথা জানতে বাকি নেই। মেয়ের মুখ থেকেই শুনেছেন। ভাবী জামাতার আসন্ন বিপদে তিনি স্বাভাবিক কারণেই বিশেষ বিচলিত।

বললেন, এইমাত্র খবর পেলাম, ইন্সপেক্টর মিস্টার রোহাতগীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

শক্ত ঠাঁই। প্রকাশ বলল, কোন কর্মী সম্পর্কে পুলিশ তাঁকে মচকাতে পারবে না।

সুবীর গোবিন্দবাবুকে নিজের মনোবাসনা জানাল।

গোবিন্দবাবু বললেন, তিনি যদি এসে ব্যাপারটার সুরাহা করতে পারেন, তবে তাঁকে অবশ্যই আনতে হবে।

সুবীর বলল, ফোনে অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। যাব যে তারও উপায় নেই। পুলিশ আমাকে শহরের বাইরে যেতে দেবে না।

আমি কলকাতা যেতে পারি। বল তো আজ রাত্রের গাড়িতেই চলে যাই!

গোবিন্দবাবুর কথায় প্রকাশ ও সুবীর চমৎকৃত হল।

বেসরকারী তদন্ত সম্পর্কে এরপর আরম্ভ হল তিনজনের মধ্যে গভীর আলোচনা।

মিসেস মিরানীর হত্যাকাণ্ড এখন এক সপ্তাহের পুরনো ঘটনা।

ইতিমধ্যে ওমপ্রকাশ বেশ কয়েকবার জেরা করেছেন সুবীরকে। ঝিকিও বাদ যায়নি। দীর্ঘ বিরক্তিকর জেরার মুখে ওদের দুজনের মধ্যে কেউই ভেঙে পড়েনি। ওদের বক্তব্যের কোন হেরফের হয়নি—অর্থাৎ ওরা একই কথা বার বার বলছে, রক্তাক্ত ঘটনা সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না।

কলকাতায় গিয়ে গোবিন্দবাবু বাসবকে রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। মাত্র গতকাল রাত্রে শামসেরনগরে সে পা দিয়েছে। অনেকগুলি জটিল অপারেশন হাতে থাকায় শৈবাল এ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারেনি।

বাসবের ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটার পর। সুবীর তার ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছিল ওর। বাসব রাজি হয়নি। এই ধরনের তদন্ত করতে এসে কমন প্লেসে থাকাই বাঞ্ছনীয়। 'হোটেল মারিনা'কে ও পছন্দ করেছে। অমিয় ভৌমিক সাগ্রহে চারতলার একটি সুসজ্জিত ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আড়মোড়া ভেঙে বাসব বিছানা থেকে নেমে এল। ট্রেনের ধকলের দরুণ ঘুম বেশ গভীর হয়েছিল। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে নিয়ে পুবদিকের জানলার ধারে পাতা আরামদায়ক চেয়ারে বসল।

কাচের পাল্লার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, গভীর কুয়াশা চারধার একাকার করে দিয়েছে। বেলা চড়লে, কুয়াশা কেটে গেলে থানায় যাবে স্থির করল।

এখানে পা দেবার পরই সুবীরের মুখ থেকে বিস্তারিতভাবে সমস্ত কিছু শুনেছে বাসব। হোটেল মারিনায় পার্টি আরম্ভ হওয়া থেকে মৃতদেহ জঙ্গলে ফেলে আসা পর্যন্ত—এর মধ্যেকার সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা বেশ গুছিয়েই বলেছে সুবীর। মৃতদেহ কোথায় পড়ে আছে, সে-ই নিজের পরিচয় গোপন রেখে ফোন করে পুলিশকে জানিয়েছিল।

বাসব চিন্তিতভাবে ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে নেশার সরঞ্জাম বার করল। দ্রুতহাতে পাইপ সেজে নিয়ে সবে মাত্র দু-টান দিয়েছে, দরজায় করাঘাতের শব্দ হল। বাসব উঠে গিয়ে অর্গল উন্মুক্ত করতেই অমিয় ভৌমিক ঘরে প্রবেশ করলেন। হাসি-হাসি মুখ।

এই যে, উঠে পড়েছেন দেখছি! কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বিন্দুমাত্র না। এই রকম জায়গায় যে এত ভাল হোটেল থাকতে পারে আমি ভাবতেই পারিনি। অনেক বড় শহরের কান কেটেছেন আপনি।

আপনার সার্টিফিকেটে বড় খুশি হলাম। বেলা বাড়ছে। আপনার ব্রেকফাস্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করি গিয়ে।

ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অমিয় ভৌমিক বসলেন।

ঘন ঘন কয়েকবার পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, আপনার কাছ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা পাব এটা আশা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না?

নিশ্চয় না। সুবীরবাবু সন্দেহমুক্ত হোন আমি মনে-প্রাণে চাই।

গোটাকতক প্রশ্নের বেশ ভেবেচিন্তে উত্তর দিন। সেদিন পার্টিতে মিসেস মিরানী কার সঙ্গে এসেছিলেন?

একটু ভেবে ভৌমিক বললেন, আমি সকলকে অভ্যর্থনা করার জন্যে পার্লারে দাঁড়িয়েছিলাম। সুবীরবাবু আর মিসেস মিরানীকে কথা বলতে বলতে হলে ঢুকতে দেখেছি। তিনি কার সঙ্গে হোটেলে এসেছিলেন বলতে পারব না।

গেলেন কখন?

ডিনারের আগেই। আমিই তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম। বিশেষ প্রয়োজনেই তিনি চলে যাচ্ছিলেন।

তাহলে নিজের গাড়িতেই উনি এসেছিলেন?

মিস্টার মিরানীর নিজের গাড়ি নেই। মিসেস মিস্টার রোহাতগীর গাড়িতেই গিয়েছিলেন। ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে এসেছিল আর কি!

বাসব একটু থেমে বলল, সেদিন এসময় মিস্টার রোহাতগী আপনাকে চাপা গলায় কি যেন বলেছিলেন। আপনি হল থেকে বেরিয়ে যান। তারপর তিনি ও মিসেস মিরানী বেরিয়ে গিয়েছিলেন—ব্যাপারটা কি বলুন তো?

একটু হেসে ভৌমিক বললেন, এরি মধ্যে আপনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন দেখছি! কথাটা কি জানেন মহিলাটির স্বভাব-চরিত্র তো তেমন ভাল ছিল না। আর রোহাতগীসাহেব বুড়ো হলে হবে কি, জুতসই মেয়েমানুষ পেলে...বুঝলেন তো ব্যাপারটা! আমাকে একটা ঘর ঠিক করে দিতে বলেছিলেন। ঘরের ব্যবস্থা হতেই ওঁরা সেখানে চলে গেলেন আর কি!

তারপর আর মিসেস মিরানী হলে ফিরলেন না। রোহাতগীসাহেবের গাড়ি চেপে কোথায় যেন চলে গেলেন। এই তো?

আপনি ঠিকই বলছেন।

বাসব নিভে যাওয়া পাইপ আবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, সেদিন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ অনুপস্থিত ছিলেন কি?

একটু ভেবে ভৌমিক বললেন, যতদূর মনে পড়ছে, মিস্টার মিরানী ও রায়সুরানা ছাড়া আর সকলেই এসেছিলেন।

রায়সুরানা কে?

'ওল্ড গোল্ড সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি'র জেনারেল ম্যানেজার।

আপনাকে আর আটকে রাখব না। পরে হয়ত আবার এ প্রসঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে।

নিশ্চয়। একশোবার। এবার তাহলে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিই?

তাই দিন।

ভৌমিক বেরিয়ে গেলেন। বাসব বাথরুমে প্রবেশ করল।

বাসব থানায় পৌঁছলো বেলা দশটার সময়।

কুয়াশা কেটে গেলেও রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। সমস্ত আকাশ জুড়ে কেমন ছায়া-ছায়া ভাব। ভাগ্যক্রমে থানাতেই তখন ওমপ্রকাশ ছিলেন। বাসবের পরিচয় পাবার পরই তাঁর মুখে গাম্ভীর্য আরো ঘন হয়ে এল। বেসরকারী ভাবে তদন্ত করার অনুমতি নেওয়া হয়েছে তা তিনি জানতেন। এই লোকটির নামডাক আছে তাও শুনেছেন। তবু যেখানে তিনি হালে পানি পাচ্ছেন না, সেখানে বাইরের একজন এসে সমস্ত কিছুর সমাধান করে দেবে, এ কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কি?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মফঃস্বলের পুলিশ কর্মচারিরা সাধারণত বেসরকারী গোয়েন্দাদের সঙ্গে অসহযোগিতা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এ আমার অভিজ্ঞতার কথা। তবে প্রথমেই আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি, এই প্রদেশের পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা

আমাকে সম্মান করেন। এখানে তদন্ত করতে আসছি একথা তাঁদের জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি যদি প্রয়োজনীয় সাহায্য না পাই, তাহলে অবশ্যই তা আপনার পক্ষে সুখকর হবে না। যা-ই হোক, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা এখন দেখতে চাই।

রাগে নিস্‌পিস্‌ করতে লাগলেন ওমপ্রকাশ। তবে বুঝলেন এ শক্ত ঠাঁই। তাই মুখে আর কিছু বললেন না। উঠে গিয়ে লোহার আলমারি থেকে রিপোর্টটা বের করে এগিয়ে ধরলেন।

বাসব মন দিয়ে পড়ল। ঘোরপ্যাঁচ কিছু নেই। পয়েণ্ট আটত্রিশ বোরের দুটো গুলি শরীর ভেদ করেছে। মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে রাত বারোটা থেকে দেড়টা।

বাসব রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললে, মিসেসের ভ্যানিটি ব্যাগটা একবার দেখাবেন?

আমরা দেখেছি। কাজে লাগে ওতে এমন কিছু নেই।

তবু একবার দেখব।

ওমপ্রকাশ আবার উঠে গিয়ে আলমারি থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে এলেন। আধুনিক ডিজাইনের বড় আকারের দামী ব্যাগ বাসব খুঁটিয়ে দেখল। দামী কিছু প্রসাধন দ্রব্য, আয়না, চিরুণী, রুমাল—খুচরো আর নোট মিলিয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও আছে ব্যাগে। আর আছে রিঙে আটকানো চ্যাপ্টা ধরনের দুটো পেতলের চাবি।

ডি. এস. পি. কি এখন শহরেই আছেন?

আছেন। কেন বলুন তো?

এই চাবি দুটো আমি নিয়ে যেতে চাই। তাঁর অনুমতি না পেলে আপনি হয়ত দিতে চাইবেন না।

কি করবেন চাবি দিয়ে জানতে পারি কি?

চেষ্টা করে দেখব ও দুটো দিয়ে মিসেস মিরানীর বাক্স বা আলমারি খোলা যায় কিনা। আপনারা বোধহয় ও সমস্ত চেষ্টা করেননি?

জ্বলে উঠলেন ওমপ্রকাশ। তবে অসীম বলে নিজেকে সংযত করে বললেন, আলমারির মধ্যে হত্যাকারী লুকিয়ে আছে—এই কি আপনি বলতে চান?

ধরেছেন কিন্তু ঠিক! তবে হত্যাকারী নয়, হত্যাকাণ্ডের কিছু সূত্র বা হত্যার মোটিভের কিছু আভাস ওই সমস্ত জায়গায় পাওয়া গেলেও যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

আপনি অবশ্য নিজের মক্কেলের স্বার্থ অবশ্যই দেখবেন। তবে আমাদের যা জানবার, তা আমরা জেনেছি। মিস্টার সান্যাল যে এ ব্যাপারে জড়িত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এতদিন যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি, তখন আরো কয়েকদিন করবেন না আশা করি। অর্থাৎ আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত। চলি!

থানা থেকে বেরিয়ে বাসব একটা রিক্সায় চেপে বসল। ডি. এস. পি.'র বাংলোয় এখন একবার যাওয়া দরকার। তাঁকে এখন পাওয়া যাবে মনে হয়। চাবি দুটো হাতে না পেলেই নয়। অভিজ্ঞতা বলছে কাজে লাগার সম্ভাবনা প্রবল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাসব বিছানায় কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিল। ডি. এস. পি সাহেবকে

বাংলোতেই পাওয়া গিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গেই ওকে গ্রহণ করেছেন। সন্ধ্যার সময় চাবি দুটো পাঠিয়ে দেবেন কথা দিয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চতুর্দিক গুছিয়ে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। ইতিমধ্যে ফোনে মিঃ রোহাতগীর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পাকা হয়েছে। সন্ধ্যার সময় দুজনের কথা হবে।

বেলা চারটের সময় সুবীর এল প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসব বলল, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম। এঁকে কিন্তু চিনতে পারলাম না—

আমরা একই সঙ্গে কাজ করি। প্রকাশ সমাদ্দার। আমার বন্ধু।

নমস্কার-বিনিময়ের পর বাসব বলল, আপনিও সেদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন নাকি?

না। প্রকাশ বলল, অমিয় ভৌমিকের সঙ্গে ভাল আলাপ নেই। তিনি আমাকে কেন আমন্ত্রণ জানাবেন?

তা বটে। মিসেস মিরানীর সঙ্গে আলাপ ছিল? তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন?

এখানকার সোসাইটির প্রত্যেক ইয়ংম্যানের সঙ্গেই বোধহয় তাঁর আলাপ ছিল। সেই সুবাদে আমার সঙ্গেও ছিল কিঞ্চিৎ পরিচয়। ভদ্রমহিলা অসম্ভব পুরুষঘেঁষা ছিলেন। আবার একে-ওকে নাচিয়ে বেড়াতেও ভালবাসতেন।

ঈর্ষা অনেক সময় বিপদ ঘনিয়ে আনে, তাই নয় কি?

ঠিকই বলেছেন।

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, সুবীরবাবু, আপনার হবু শ্রীমতীর সঙ্গে যে একবার দেখা করতে চাই!

সুবীর মৃদু হেসে বলল, বেশ তো! কখন দেখা করবেন বলুন?

ধরুন, এখুনি।

এখুনি! চলুন।

বাসব তৈরিই ছিল। ঘরে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রকাশ বিদায় নিল। ঝিকিদের বাড়িতে ওর যাওয়া-আসা নেই। গাড়ি হোটেল কম্পাউণ্ড অতিক্রম করল। বাসব দাঁতে পাইপ চেপে ধরে এধার-ওধার তাকাচ্ছিল। একসময় বলল, শ্রীমতী আর মিস্টার মিরানীর বাড়ি কি একই রাস্তায়?

না কেন?

মিস্টার মিরানীর বাড়ির সামনে একটা পার্ক আছে বলেছিলেন না! আগে ওখানে চলুন। আলো থাকতে থাকতেই পার্কটা একবার দেখতে চাই।

সুবীর একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, পার্ক দেখবেন?

হত্যাকারী ডেডবডি নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করে থাকলে কোন মূল্যবান সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

আমি বলছি এ কাজ মিস্টার মিরানীর। আপনি তাঁকে একটু ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখুন।

আপনার অনুমান হয়ত ঠিক। তাঁকে নিশ্চয়ই নেড়েচেড়ে দেখব। তবু চারধার

একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আচ্ছা. সেদিন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আপনার ক'টার সময় দেখা হয়েছিল?

রাত তখন একটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছিল।

মিস্টার মিরানীর বাড়ির সামনে আপনি ক'টায় পৌঁছান?

প্রায় দেড়টা।

ইন্সপেক্টর মিসেস মিরানীকে আরো কয়েক মিনিট আগে দেখেছিলেন। তার মানে তিনি খুন হয়েছেন পৌনে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে। পাম অ্যাভিনিউ থেকে মিসেসের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে আসতে কতক্ষণ সময় লাগত?

সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেব কম লাগার কথা নয়। তবে একটা শর্টকাট রাস্তাও আছে।

কি রকম?

পাম অ্যাভিনিউ থেকে একটা গলি বেরিয়ে পার্কের কাছে শেষ হয়েছে। ওই পথ দিয়ে এলে মিনিট পনেব লাগবে।

ওই পথ দিয়ে মোটর চলাচল করে?

না। সুরদাস লেন বেশ সরু।

হুঁ! ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে।

গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছিল। পার্কের গেটের পাশে গাড়ি থামাল সুবীর। বাসব রাস্তায় পা দিয়েই উল্টোদিকে তাকাল। এখান থেকে মিঃ মিরানীর আবাসস্থলটিকে দেখাচ্ছে ছবির মত। সিমলা পাহাড়ের থাকে থাকে যে ধরনের বাড়ি দেখা যায়, তারই আদলে তৈরি। দুধারের কাছাকাছি বাড়ি দুটির ব্যবধান হল কমপক্ষেও একশো গজ করে।

ওরা পার্কে প্রবেশ করল। পার্ক না বলে একে অরণ্য-উদ্যান বলাই ভাল। অসম্ভব নির্জন। ফুলের কেয়ারির এখানে-ওখানে নীরবে ঘুরে ঘুরে চলেছে বাসব। এধার-ওধার খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এমন জায়গায় সে এসে দাঁড়াল, যেখানকার ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে মিরানীর বাড়ি পরিষ্কার দেখা যায়। এই জায়গার দূরত্ব গেট থেকে বেশি নয়। বাসব ঝোপের মধ্যে এবং আশপাশে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

সুবীর প্রশ্ন করল, কি খুঁজছেন?

ধরুন, মিরানী নয়, অন্য কেউ হত্যাকারী। তাহলে সে এখানে মৃতদেহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। তার ইচ্ছে ছিল হয়ত বডি ভিক্‌টিমের বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে ফেলে আসবে। এই সময় আপনি গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন।

খুন পার্কেই হয়েছে বলছেন?

পার্কে কখনোই নয়। একজন পরিচিত লোকই মিসেসকে খুন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যত পরিচিতই হোক, তার সঙ্গে গভীর রাতে তিনি পার্কে ঢুকতে কখনো রাজী হতেন না। খুন নিশ্চিতভাবে অন্য কোথাও হয়েছে। নাঃ, এখানে কাজে লাগে এমন কিছু পাওয়া গেল না। চলুন, সামনের বাড়িতে একবার ঘুরে আসা যাক।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা মিরানীর বাড়ির সামনে উপস্থিত হতেই গেটের মুখে

ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ডাক্তারি ব্যাগ হাতে গেট অতিক্রম করতে গিয়ে থামলেন। সুবীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। এবং অনুমান করলেন দ্বিতীয় ব্যক্তিটির পরিচয়।

মিস্টার মিরানী অসুস্থ নাকি?

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তো বিছানা নিয়েছেন। প্রত্যহই একবার করে দেখে যেতে হচ্ছে। মানসিক অস্থিরতা আর দুর্বলতার শিকার এখন উনি।

এঁর সঙ্গে এখনও তো আপনার পরিচয় হয়নি?

হেসে ডাঃ চৌধুরী বললেন, উনি কে বুঝতে পেরেছি। নমস্কার!

বাসব প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনিও সেদিনকার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন নাকি?

ছিলাম।

তবে তো মশাই আপনার সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করতে হয়!

বেশ তো। কখন আপনার সঙ্গে দেখা করব বলুন? মারিনায় আছেন তো?

হ্যাঁ। কাল সকালে আসুন না!

সম্মতি জানিয়ে ডাঃ চৌধুরী বিদায় নিলেন।

ওরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। ড্রইংরুমেই মিঃ মিরানীকে পাওয়া গেল। তিনি ডিভানের ওপর শুয়েছিলেন। শুয়েছিলেন না বলে নেতিয়ে পড়েছিলেন বলাটাই বোধহয় ঠিক। ওদের দেখে কোনরকমে উনি বসলেন। মুখের ওপর মলিন একটা পর্দা পড়ে রয়েছে যেন।

বাসবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুবীর বলল, আমার প্রতি আপনার বিরূপ মনোভাব থাকাই স্বাভাবিক। তবে বিশ্বাস করুন, আপনার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। আমাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ এ ব্যাপারে জড়িয়েছে।

ভারি গলায় মিরানী বললেন, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। তবে আমার স্ত্রীকে কেউ না কেউ খুন করেছে। আমি জানতে চাইছি এ কাজ কার?

বাসব বলল, সেটাই জানাবার চেষ্টা আমি করব। শুনলাম আপনার শরীর ভাল নেই! গোটা কয়েক প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কি?

বলুন?

সেদিন আপনার স্ত্রী একাই পার্টিতে গিয়েছিলেন, না কেউ এখানে এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল?

ট্যাক্সি করে একাই গিয়েছিল।

আপনি যাননি কেন?

গোলমাল বা ঝামেলা আমার তেমন ভাল লাগে না। তাছাড়া সেদিন শরীরও তেমন ভাল ছিল না।.

এবার অনন্যোপায় হয়ে একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার স্ত্রীর চালচলনের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা যে-কোন স্বামীর পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। অথচ আপনি সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছিলেন। এর কারণ কি?

প্রায় এক মিনিট ভ্রূ-কুঁচকে চুপচাপ রইলেন মিরানী। তারপর বললেন, উগ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার আমি ঘোর বিরোধী। আমার স্ত্রী যে চিরকাল এমন ছিলেন, তা নয়। মাত্র বছর দুয়েক ধরে তাঁর স্বভাব এমনি পাল্টে গিয়েছিল। আমি যে সংযত করার চেষ্টা করিনি, এমন নয়। আসল কথাটা কি জানেন, শ্বশুরমশাইয়ের দৌলতেই আমার আজকের স্বচ্ছলতা, এই পদ। তাই অন্যান্য স্বামীর মত জোর করে বাধা দিতে সঙ্কোচ এসে পড়ত।

এখানে সবচেয়ে বেশি মেলামেশা তাঁর কার সঙ্গে ছিল বলতে পারেন?

যতদূর জানি রোহাতগীসাহেবের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বাসব এবার প্রশ্নের মোড় ফেরাল, আপনি ও আপনার স্ত্রী একই আলমারি বা বাক্সতে কাপড়-চোপড় রাখতেন?

হ্যাঁ।

চাবি কার কাছে থাকত?

কারুর কাছে নয়, দেরাজে থাকত। কেউ একজন বাড়িতে না থাকলে অন্যজন যাতে অসুবিধায় না পড়ে—তাই এই ব্যবস্থা।

সেই সমস্ত চাবি এখনো দেরাজে আছে?

হ্যাঁ। ইতিমধ্যে আমি আলমারিও খুলেছি।

অসুবিধা না হলে একবার আমাদের সামনে আলমারিটা খুলুন। আমি তাঁর জিনিসপত্র একটু নেড়েচেড়ে দেখব।

মিরানী উঠলেন। বাসব ও সুবীর তাঁকে অনুসরণ করল। ওরা শয়নকক্ষে গিয়ে উপস্থিত হল। আসবাবের ভিড় সেখানে নেই। আছে জোড়া খাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল আর আলনা। মিবানী ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজ থেকে চাবির গোছা বার করলেন।

বড় সাইজের স্টিলের আলমারি। খোলা হল। অনেকগুলো তাক। ওপরের তিনটে তাকে শাড়ি-ব্লাউজ ঠাসা। নিচের তিনটে মিরানীর জন্য নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর জামা-কাপড় বেশি নয়। শাড়ি-ব্লাউজ নামিয়ে কাগজপত্র বা কাজে লাগবে—এমন কিছু পাওয়া গেল না। তবে মাঝারি সাইজের স্টিলের একটা ক্যাশ-বাক্স তার মধ্যে ছিল।

মিরানী বললেন, এর মধ্যে আমার স্ত্রী গহনা রাখতেন।

বাক্সটা কিন্তু খোলা গেল না। গোছায় যে ক'টা চাবি আছে, তার একটাও লাগল না। জানা গেল, এর চাবি মিসেস মিরানী নিজের কাছেই রাখতেন। অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগে যে দুটো চাবি পাওয়া গেছে, তার একটা নিশ্চিত ভাবে এর। পরে চাবি এনে বাক্সটা খুলে দেখলেই হবে।

কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগের দ্বিতীয় চাবিটা কোথাকার?

আরো দু'চার কথার পর ওখান থেকে ওরা বিদায় নিল।

এর অল্পক্ষণ পরেই পৌঁছল গোবিন্দবাবুর বাড়ি। তিনি ছিলেন না। ঝিকি অবশ্য ছিল। সুবীরের বিপদই তাকে অসম্ভব ম্লান করে রেখেছে। কথাবার্তা বলে বাসব কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারল না।

ওখানে একটু দেরিই হয়ে গেল। এবাব হোটেলে ফেরাব পালা। আজ আর রোহাতগীর সঙ্গে দেখা করবে না। হোটেলে ফিবে টেলিফোনে সেকথা জানিয়ে দিলেই চলবে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে রাত ন'টার সময় কারও সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

দশটা বাজার কয়েক মিনিট পরে 'রোহাতগী প্যালেসে' পৌঁছল বাসব। এখন সরাসরি হোটেল থেকে আসছে না। মিসেস মিরানীর ভ্যানিটি ব্যাগে পাওয়া চাবি দুটো সকালেই পুলিশ অফিস থেকে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর বাসব মিরানীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। অনুমান ঠিকই, একটা চাবি দিয়ে স্টিলের বাক্সটা খুলতে অসুবিধা হল না। বাক্সের মধ্যে গয়না ছাড়াও গুণে দেখা গেল হাজার ন'য়েক টাকা রয়েছে। সবগুলো একশো টাকার নোট। তাছাড়া একটা কাগজের মোড়ক পাওয়া গেল। মোড়কের মধ্যে ছিল হাল্‌কা সবুজ রঙের কিসের একটা গুঁড়ো।

নোটের তাড়া দেখে বিস্ময় বোধ করলেন মিবানী। এত টাকা তার স্ত্রী কোথা থেকে যে সংগ্রহ করেছিলেন, অনেক মাথা খাটিয়েও তা তিনি বুঝতে পারলেন না। সবুজ গুঁড়োর মোড়কটা পকেটস্থ করে ওখান থেকে বেরিয়ে রিক্সায় চেপে 'রোহাতগী প্যালেসে' পৌঁছতে বিশেষ কোন অসুবিধার মুখোমুখি হতে হল না বাসবকে।

রিক্সা থেকে গেটের সামনে নেমে বাসব মুগ্ধ হয়ে গেল। বৈভব আর রুচি একসঙ্গে মিলে-মিশে গেলে যা সৃষ্টি হয়, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'রোহাতগী প্যালেসে।' কম করেও দু'বিঘার ওপর বিস্তৃত ক্লকটাওয়ার যুক্ত বিশাল প্রাসাদ। সিমেন্ট বা চুনের নাম-গন্ধ নেই, সমস্তটাই মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া। অতি যত্নে লালিত ফুলের বাগান প্রাসাদের চারধারে বৃত্ত রচনা করেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে সুরকি-ঢালা পথ আছে, আছে টেনিস লন, কৃত্রিম পাহাড়, সুইমিং পুল ও আরো অনেক কিছু।

পোর্টিকোয় উপস্থিত হবার পরই একজন বেয়ারা তার সামনে এসে দাঁড়াল। বাসব তার হাত দিয়ে নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিল ভেতরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহকর্তার সেক্রেটারি রাজেন ভার্মা এসে তাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানাল। রোহাতগী তখন বিশাল ড্রইংরুমের সোফায় শরীর ডুবিয়ে বসেছিলেন।

বাসবকে বসতে অনুরোধ করে তিনি বললেন, কাল আমি আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।

আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত। কাল এক জায়গায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, তাই আর আসতে পারলাম না।

স্বাভাবিক। আপনি কাজ নিয়ে এসেছেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা এখানে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। কি খাবেন বলুন? হট ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করি? ভ্যাট সিক্সটি নাইন—হোয়াইট হর্সও স্টকে আছে।

মৃদু হেসে বাসব বলল, এই অবেলায় আর সাঁতরাতে চাই না। এক কাপ চা বা কফি হলেই যথেষ্ট হবে।

রোহাতগী সেক্রেটারিকে ইশারা করলেন।

বলুন এবার, কি জানতে চান? আমার একজন কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারি এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে—কম পরিতাপের কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমারই উচিত ছিল আপনাকে নিয়োগ করা।

আশা করি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দেবেন—

নিশ্চয়ই।

আমি প্রথমেই পার্টি প্রসঙ্গে আসতে চাই। পার্টি যখন জমজমাট, তখন আপনি মিসেস মিরানীকে নিয়ে হোটেলের অন্য কোন ঘরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ—

সঙ্কোচ করবার কিছু নেই—হাসবার চেষ্টা করে রোহাতগী বললেন, আমার চরিত্র নিয়ে প্রচুর কথা-চালাচালি আজকাল হচ্ছে জানি। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, আমার যা বয়স তাতে ও সমস্ত খাপ খায় না।

কিন্তু সেদিন—

সেদিন আমি তাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিছু গোপনীয় কথা সে আমায় বলতে চেয়েছিল। তাই—

সেই কথাগুলো আমায় বলবেন কি?

একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন রোহাতগী। তারপর বললেন, ওই কথাগুলো শুনে খুনের তদন্তে আপনার কি উপকার হবে জানি না। শ্রীমতী বুলবুল সেদিন আমায় বলেছিল, আপনার সন্দেহ ঠিক। কারখানা নিশ্চিতভাবে নষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম, কারা একাজ করতে চলেছে তুমি বুঝতে পেরেছ কি? সে বলেছিল, একজন লোকই আপনার প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছে। যা করবার সে একাই করবে। আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে সেই লোকের নাম প্রকাশ করব। এরপর আমি অনেক পীড়াপীড়ি করলাম, কিন্তু বুলবুল সেই লোকের নাম প্রকাশ করল না।

মিসেস মিরানীর নাম বুলবুল?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি যা বললেন, তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরিষ্কার করে বলুন।

তাহলে অনেক কথাই বলতে হয়। এখানকার ওল্ড গোল্ড সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি আমি প্রতিষ্ঠা করেছি, শুনেছেন বোধহয়! বর্তমান বাজারে এই ফ্যাক্টরির সিমেণ্টের প্রচণ্ড চাহিদা। এটাই হয়েছে কাল। এই অঞ্চলের শ'খানেক মাইলের মধ্যে আরো কয়েকটি কারখানা আছে। আমার সিমেণ্ট তাদের বাজার খারাপ করে দিয়েছে। পড়ে পড়ে আর কে মার খেতে চায়, বলুন? ক্রমে আমি নানা সূত্রে খবর পেলাম, আমার কর্মচারিদের টাকা খাইয়ে ওরা হাত করেছে। ওদের উদ্দেশ্য হল, ওল্ড গোল্ডের সুনাম যে-কোনভাবে নষ্ট করা। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিছু পদস্থ কর্মচারিকেই যে ওরা হাত করেছে সন্দেহ নেই। তাদের চিনে ওঠা চাই। এই সময় বুলবুল মিরানীর কথা মনে পড়ল। সে সহজেই সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে। তার সাহায্যে খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে। তাকে ডেকে সরাসরি প্রস্তাব করলাম। শুনলে অবাক হবেন, সঙ্গে সঙ্গে

বাজি হয়ে গেল। তবে দাবী করল দশ হাজাব টাকা। আমি বললাম, যদি তুমি খুঁজে বার করতে পার কারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, তাহলে ওই অঙ্কের টাকা নিশ্চয় দেব।

তারপর?

সে লেগে গেল কাজে। আমি অবশ্য তাকে দু' হাজার টাকা আগাম দিয়েছিলাম। পার্টির দিনে তার কথা শুনে মনে হয়েছিল, সে সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি জানা গেল না। তার আগেই সে খুন হয়ে গেল।

ডিনারে যোগ না দিয়েই সেদিন তিনি চলে গিয়েছিলেন কেন বলতে পারেন?

আমাকে বলেছিল, বিশেষ প্রযোজনে ওকে চলে যেতে হচ্ছে কাল সকালে ভাল সংবাদ দিতে পারবে।

আপনার সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হয়নি?

দেখা অবশ্য আর হয়নি। তবে ফোনে কথা বলেছিল।

কি রকম?

এই সময় কফি এসে পড়ল। সঙ্গে কিছু খাদ্যবস্তু।

রোহাতগী বললেন, নিন, আরম্ভ করুন। হোটেল থেকে ফেরার কিছুক্ষণ পরে ফোন পেয়েছিলাম বুলবুলের। কোন দল নয়, একটি মাত্র লোকই আমার কারখানার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কবছে—এই কথা জানবার পর সে বলেছিল, সেই লোকটাকে সে চিনতে পেরেছে। তবে দশ হাজাবে আর হবে না। টাকার অঙ্ক আরো বাড়াতে হবে।

আপনি কি বললেন?

আমি রাজি হলাম। তাকে চলে আসতে বললাম আমার বাড়িতে। সে বলল, এত রাত্রে আর নয়। সকালে আসছে।

অর্থাৎ সেই বিশেষ ব্যক্তিটির নাম তখন তিনি করতে চাননি। ক'টায় ফোন পেয়েছিলেন মনে আছে?

একটার সামান্য কিছু পরে।

সেদিন মিসেস মিরানী আপনাব গাড়ি চড়েই হোটেল ত্যাগ করেছিলেন। কেথায়, গিয়েছিলেন, আপনি জানেন?

আমি অবশ্য খোঁজ নিইনি। তবে ড্রাইভার সুখলাল আপনাকে বলতে পাববে। তাকে ডাকব কি?

ডাকলে ভাল হয়।

রোহাতগী ইণ্টারকামের নব অন করলেন, রাজেন, সুখলালকে এখানে একবার আসতে বল।

বাসব কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে পাইপ ধরাল। ওর কপালের ভাজে ভাজে চিন্তা। গৃহকর্তাও সিগার ধরালেন। কয়েক মিনিটেব মধ্যেই সুখলাল বিনীত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল। নিরেট গঠনের প্রৌঢ় ব্যক্তি।

ইনি তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

গত পনেরো তারিখের সন্ধ্যাবেলায় মিসেস মিরানীকে নিয়ে তুমি কোথাও গিয়েছিলে?

বাসবের প্রশ্নের উত্তরে সুখলাল জানাল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায়?

এই পাড়াতেই এসেছিলাম।

কার বাড়ি?

কারোর বাড়ি নয়। পাম অ্যাভিনিউয়ের মোড়েই বুলবুল মেমসাহাব নেমে গিয়েছিলেন।

সেখানে বা কাছাকাছি কোন লোক দাঁড়িয়েছিল?

কাউকে দেখিনি।

সুখলালকে বিদায় দিয়ে বাসব বলল, পাম অ্যাভিনিউয়ে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মধ্যে কে কে থাকেন?

থাকেন অনেকেই। যেমন, লালা হংসরাজ, ডাক্তার চৌধুরী, আমার কারখানার জি.এম. রায়সুবানা, প্রকাশ সমাদ্দার।

একটু চুপ করে থাকার পর বাসব বলল, সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন উঠলাম। আবার দেখা হবে।

রোহাতগী ওকে পার্লার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে বাসব পাম অ্যাভিনিউ ধরেই এগলো। জন দুয়েক পথচারির কাছে খোঁজ-খবর নিতেই ডাঃ চৌধুরীর চেম্বাবেব সন্ধান পেতে অসুবিধা হল না। রোহাতগী প্রাসাদ থেকে দূরত্ব চারশ' গজের বেশি নয়।

চেম্বারেই ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। ওয়েটিংহলে অনেক রোগী অপেক্ষা করছে। দেখে-শুনে মনে হয়, এই শহরের অন্যতম ব্যস্ত চিকিৎসক তিনি। তাঁর একজন সহকারির মারফৎ বাসব নিজের আগমন-সংবাদ পাঠাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাচের দরজা সরিয়ে চেম্বারথেকে বেরিয়ে এলেন ডাঃ চৌধুরী।

কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন!

একটু হেসে বাসব বলল, এখন নয়। কোন্ সময় আপনি ফ্রি থাকবেন বলুন? আমি সেই সময় আসব।

ডাঃ চৌধুরীও হাসলেন।

ফ্রি বলতে যা বোঝায়, তা বোধহয় এ জীবনে আর হতে পারব না। এরই মধ্যে সময় করে নিতে হবে। ভেতরে আসুন।

বাসব তাঁর পিছু পিছু চেম্বারের মধ্যে গেল। সুদৃশ্য এবং আধুনিক। সেখানে একজন বৃদ্ধ রোগী বসেছিলেন। ডাক্তার তাঁকে প্রেসক্রিপশন ও প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে বিদায় করে বললেন, বলুন এবার!

আমি তো শুনতে এলাম!

কি শোনাব বলুন? সত্যি কথা বলতে কি খুনটাব সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

খুনেব সম্পর্কে না হয় কিছু না জানলেন, কিন্তু যে খুন হল তার সম্পর্কে তো আপনার অনেক কথা জানা আছে! সেই কথাই আমি শুনতে চাই।

বাসব পাইপ ধরাল। ডাঃ চৌধুরী সিগারেট ধরালেন।

দেখুন, শ্রীমতীর সঙ্গে আমার ভাল রকমই আলাপ ছিল। অ্যাজমাব টেংগুসি ছিল

তাঁর। প্রায়ই আসতেন। মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ইশারা-টিসারা যে মাঝে মধ্যে করেননি, তা নয়। আমি অবশ্য আমল দিইনি। চিকিৎসকদের মেয়েলি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। তবে হৃদয় বলে যে তাঁর কিছু নেই, এ সংবাদ আমার জানা ছিল। মোটা টাকা খরচ করতে পারবে, এমন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে তাঁর বাঁধত না। আসলে টাকা রোজগারই ছিল তাঁর মূল কথা।

ইদানিং তিনি কার কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলতে পারেন?

কেন পারব না? মালিক থেকে কর্মচারি সকলকেই তিনি খুশি করেছেন। যেমন, রোহাতগীসাহেব, রায়সুরানা, প্রকাশ সমাদ্দার। সুবীরবাবুর ওপরও তাঁর নজর ছিল। তাছাড়া লালা হংসরাজ, গোবর্ধন দাসের মত ব্যবসাদার—

আপনি তো ব্যস্ত মানুষ এত সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলেন কিভাবে? মহিলা নিজেই বলতেন নাকি?

না। তাঁর পিছু পিছু ছায়ার মত ঘোরার সময় যে নেই তা তো বুঝতেই পেরেছেন। আমাকে সংবাদ দিত গণপত।

সে কে?

আমার একজন রোগী। সাইটিকায় ভুগছে। প্রথম জীবনে হেন কাজ নেই, যা সে করেনি। এখন সে দালালি করে। এখানকার অনেক কেষ্ট-বিষ্টুরই ওর ওখানে যাতায়াত আছে। ফবেন গুডস্ থেকে মেয়েমানুষ পর্যন্ত কমিশন পেলে সবই সে সংগ্রহ করে দিতে পারে।

এই বিচিত্র জীবেব সঙ্গে মিসেস মিরানীর যোগাযোগ ঘটল কিভাবে?

তা বলতে পারব না। তবে ইদানিং কোন স্বার্থের খাতিরে শ্রীমতী যে গণপতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গণপত তাঁর মক্কেলদের কথাই আমায় বলত—কিন্তু ওর কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা তিনি নিচ্ছেন, সেকথা বলতে চাইত না।

হুঁ! গণপতের সঙ্গে একবার দেখা করা যায় না?

কেন যাবে না? দেখছি! সুবোধ—

কাচের দরজা ফাঁক করে একটি ছোকরা মুখ বাড়াল।

দেখ তো 'চায় ঘরে' গণপত আছে কিনা! না থাকলে, রামকিশোরকে বলে এস, সে এলেই যেন আমার কাছে চলে আসে।

দশ মিনিট পরে খবর পাওয়া গেল, আজ এখনও সে চায়ের দোকানে আসেনি। এলেই দোকানদার রামকিশোর তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।

বাসব একপ্রস্থ ধন্যবাদ' জানিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল। হোটেলে ফিরল ডি. এস. পি.র অফিস ঘুরে। বুলবুল মিরানীর স্টিলের বাক্সর মধ্যে যে সবুজ রঙের গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছিল, তার মোড়কটা দিয়ে এল বিশেষজ্ঞদের, যাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন বস্তুটা কি!

সারাটা দুপুর বাসব চিন্তা করে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। বিকেলে চা খাবার

সময়ও চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেল না। বুলবুল মিরানীর ভ্যানিটি ব্যাগে পাওয়া দ্বিতীয় চাবিটা কোথাকার, কারখানায় গণ্ডগোল পাকাবার জন্য যে তৈরি হচ্ছে, সে কে—আসন্ন গণ্ডগোলটাই বা কি ধরনের এবং ওই সবুজ গুঁড়োটা কিসের—মিসেসের স্টিলের বাক্সে যত্ন করে রাখা ছিল কেন—এই প্রশ্নগুলি ওকে অসম্ভব উতলা করে তুলেছে।

অবশ্য হত্যার মোটিভ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা খাড়া করা গেছে। যে লোক কারখানায় গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে, সে কোনক্রমে জানতে পেরেছিল বুলবুল মিরানীর কাছে তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কাজেই রোহাতগীসাহেব বা আর কেউ কিছু জানার আগেই মিসেসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল এবং হত্যাকারী পাম অ্যাভিনিউয়ের ধারে কাছেই থাকে। ইন্সপেক্টর মিসেসকে যখন দেখেন, তারপরই হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন এমন কিছু বলা হয়েছিল, যার দরুণ হত্যাকারীর নির্বাচিত জায়গায় যেতে তিনি দ্বিধা করেননি। মিসেসকে পরপারে পাঠাতে আর কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর তাঁর দেহ নির্জন সুরদাস লেন দিয়ে বয়ে পার্কে নিয়ে আসা হয়। সেখানে আরো সুযোগ অপেক্ষা করছিল। সুবীর সান্যাল গাড়ি রেখে মিরানীর সঙ্গে ভেতরে চলে যাবার পর মৃতদেহ গাড়িতে চালান করে দিতে কোনই অসুবিধা হল না। এতে রক্তাক্ত পরিস্থিতিটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করার ব্যবস্থা পাকা করা হল।

কিন্তু বুলবুল মিরানী হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন ডিনারের কিছুক্ষণ আগেই। রাত একটা পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময় তিনি ছিলেন কোথায়? তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রায়সুরানা আর প্রকাশ সমাদ্দার পার্টিতে যোগ দেননি। এই দুজনের মধ্যে কারো সঙ্গে ওই দীর্ঘ সময় কেটেছিল কি, না অন্য কোথাও ছিলেন? এই ঘোরাল প্রশ্নের উত্তর বাসবকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেতে হবে।

এই সময় অমিয় ভৌমিক ঘরে এলেন।

এই যে অমিয়বাবু, অবসর থাকলে আসুন একটু গল্প করা যাক।

তাই তো এলাম। কাজের কতদূর?

এগোচ্ছে। আচ্ছা, আপনার পরিচিতদের মধ্যে কার কার রিভলবার আছে বলুন তো?

রোহাতগীসাহেব আর লালা হংসরাজের যে আছে, তা জানি। আর কারোর কথা বলতে পারব না।

এখানকার চোরাবাজারে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় নাকি?

মৃদু হেসে ভৌমিক বললেন, স্মাগল্ গুডসে সারা দেশটাই ভরে গেছে। চোরাবাজারে কি পাওয়া যায় না বলুন?

তা বটে। রায়সুরানা এখানে কতদিন আছেন?

বোধহয় বছর দেড়েক। আগে অন্য কোন সিমেণ্ট কারখানায় কাজ করতেন। বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ওঁকে এখানে আনা হয়েছে।

আর প্রকাশ সমাদ্দার?

তাঁর কথা বলতে পারব না। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই।

কথাবার্তা আর বেশিদূর এগলো না বেয়ারা এসে একটা খাম দিল বাসবের হাতে।

ডাঃ চৌধুরী লিখেছেন, গণপতের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তাকে পাঠালাম। নেড়েচেড়ে দেখুন।

লোকটা কোথায়?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাঠিয়ে দাও।

আপনার কাছে লোক এসেছে। আমি এখন তাহলে উঠি—

অমিয় ভৌমিক বেরিয়ে যাবার পরই গণপত ঘরে ঢুকল। ডিগডিগে রোগা লোকটা অসম্ভব লম্বা। মাজা মাজা গায়ের রঙ, রক্তাভ চোখ আর ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়, সুরার সেবা সে অবিরাম করে চলেছে। বয়স বছর যাটেক হবে।

ডাক্তারসাহাব আমাকে পাঠালেন।

বসো। আমি কি কাজের ভার নিয়ে এখানে এসেছি, নিশ্চয় শুনেছ?

ডাক্তারসাহাব আমাকে সব কথা বলেছেন।

আমি তোমার সাহায্য চাই গণপত। প্রত্যেকটি প্রশ্নের যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে মনে হয় বুলবুল মেমসাহেবের খুনের হিল্লে হতে পাবে।

চোখ কপালে তুলে গণপত বলল, এ আপনি কি বলছেন স্যার? আমি তো কিছুই জানি না। বুলবুল মেমসাহাবের ফাই-ফরমাস খেটে দিতাম, এই পর্যন্ত।

কি ধরনের ফাই-ফরমাস, আগে তাই না হয় শুনি?

এই ধরুন, কোন একটা হুকুম করলেন, আমি তামিল করলাম। বিনা পয়সায় অবশ্য আমাকে খাটাতেন না।

কি ধরনের হুকুম—সেটাই তো আমি জানতে চাইছি।

গণপত ইতস্ততঃ করতে লাগল।

বাসব উঠে গিয়ে ফোনে নিচের কাউণ্টারের সঙ্গে কি কথা বলল, তারপর ফিরে এসে আবার বসল নিজের কোচে।

তুমি বলতে না চাইলে কিভাবে কথা বার করতে হয়, তা আমার অজানা নেই। নানারকম গোলমেলে কাজ এতদিন ধরে তুমি করেছ। একটা অজুহাতে পুলিশ তোমাকে গারদে পুরতে পারে। তারপর ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে বুঝতেই পারছ। অবশ্য আমি তত দূর যাব না। আমার—

বেয়ারা হুইস্কির বোতল, গেলাস আর সোডা রেখে গেল।

গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বাসব বলল, এ জিনিস তুমি এখানকার বাজারে পাবে না। অতি উপাদেয়। তাছাড়া এখুনি একটা একশো টাকার নোটও তোমাকে দেবার ইচ্ছে আছে।

চকচকে চোখে গণপত গেলাসে সোনালি নেশা পড়তে দেখছে। তার দুই ঠোঁটের মধ্যেকার ফাঁক বেড়ে চলেছে ক্রমেই। সোডা মেশাবার অপেক্ষায় কিন্তু রইল না সাপটে ধরল গেলাস, তারপর সমস্তটা শেষ করল এক নিঃশ্বাসে।

এসব জিনিস তারিয়ে তারিয়ে খেতে হয়। তুমি তো—

পাকা নেশাখোর সাব, গেলাস আর সোডার দরকার হয় না। বোতল ভবা থাকলেই হল। টাকাটা আমায় সত্যি দেবেন?

নিশ্চয়। তোমার কথায় যদি উপকার হয়, আরো দুশো টাকা দেব। বোতলটা আগে শেষ করে নাও, তারপর কথা হবে।

গণপত নির্জলা লিকার দ্রুত গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ঢেকুব তুলল। মনে প্রশান্তি আর তৃপ্তি দুই-ই এসেছে বোধহয়। পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বার করে মুখ মুছে নিয়ে বলল, একটা সিগারেট হবে সাব?

কাছে নেই। আনিয়ে দেব?

মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে গণপত বিড়ি ধরাল।

এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে, কি বল? বুলবুল মেমসাহেবের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল কি সূত্রে?

আমি যে অনেক রকম কাজ করতে পারি সেটা বোধহয় উনি কারোর কাছে শুনেছিলেন। ডাক্তার সাহেবের ওখানে আমাদের দেখা হত সাব। একদিন বললেন, 'আমার কিছু কাজ করে দেবে? তোমায় টাকা দেব।' আমি রাজি হলাম।

কি করতে বললেন?

সিমেন্ট কারখানার ম্যানেজারের ওপর নজর রাখতে বললেন। রাতে-বেরাতে কোথাও যান কিনা, কার সঙ্গে এখন বেশি দহরম-মহরম, এই সব। আমি খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। মেমসাহাব মাঝে-মধ্যে আমাকে কুড়ি-পঁচিশ টাকা করে দিতেন। তারপর—

তারপর কি হল?

বড় এক বোতল হুইস্কি উদরস্থ করার পরও গণপতের নেশা হয়েছে বলে মনে হল না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথা বলে চলেছে।

দিনকুড়ি আগেকার কথা, বললেন, অন্য ধরনের একটা কাজ করতে হবে। একশো টাকা দেব। টাকা পেলে তো আমি সবই করতে পারি। একটা বন্ধ ঘর দেখিয়ে বললেন, ওই তালার চাবি তৈরি করিয়ে দিতে হবে।

ঘরটা কি সুরদাস লেনের কাছাকাছি।

আপনি জানেন দেখছি!

তোমার একবারও মনে হয়নি, অন্যের ঘরের একটা চাবি উনি কেন তৈরি করিয়ে নিতে চাইছেন?

আমাদের এত কথা মনে করলে চলে না। এ তো ঘরের চাবি, একজনকে পরের সিন্দুকের চাবি বানিয়ে দিয়েছিলাম সাব। মোমের ছাপ বুলবুল মেমসাহাবই দিয়েছিলেন। চাবিওয়ালাকে দিয়ে চাবি তৈরি করিয়ে নিতে মোটেই অসুবিধা হল না।

বাসব পকেট থেকে একটা চাবি বার করে বলল, দেখ তো এইটে কিনা?

চাবিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজিত গলায় বলল, এই চাবিটাই! কিন্তু আপনি কোথায় পেলেন?

তারপর কি হল বল?

আর কিছু জানি না। এবার আমায় টাকাটা দিন সাব।

নিশ্চয় দেব।

পার্স পকেটেই ছিল। বাসব একশো টাকার একটা নোট এগিয়ে ধরল।

ঘরটা নিশ্চয় কোন বাড়ির সংলগ্ন। বাড়িটা কার?

নোটটা সযত্নে মুড়তে মুড়তে গণপত বলল, ওটা রোহাতগীসাহেবের বাড়ি। কেউ থাকে না। গুদাম। ওই ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে। বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকে।

কিসের গুদাম?

সিমেন্টের।

এবার একটু থেমে চাপা গলায় বলল, যদি একহাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে খুনীর সন্ধান বলে দিতে পারি।

বল কি ! তুমি—?

হ্যাঁ, সাব।

দেব। নাম বল।

একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। আগে তো এ সমস্ত ভেবে দেখিনি। আপনার কথা শোনার পর মনে হচ্ছে... এখন থাক। কাল বলব।

বেশ। এখন তুমি যেতে পার।

কিছুটা উত্তেজিতভাবেই গণপত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাসব দ্রুত লং-কোট গায়ে চাপিয়ে নিল। তারপর ল্যাভেটরির পেছন দিককার স্পাইরেল দিয়ে নেমে এল নিচে। সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও পড়েছে চেপে।

হোটেলের পেছন দিকে জনসমাগম না থাকাই স্বভাবিক। বাসব সদরে না গিয়ে এধারের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিদের যাতায়াতের পথ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। প্রকাশ্যে নয়, গাছের আড়াল তাকে নিতে হয়েছে। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, গণপত প্রধান গেট পেরিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে আসছে।

ক্রমে সে বাসবকে পেরিয়ে গেল। নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হবার পর বাসব অনুসরণ করল তাকে। মোড়ের একধারে রিক্সাস্ট্যাণ্ড। সেখানে এসে গণপত একটা রিক্সায় চাপল। বাসবও আর একটা রিক্সায় চেপে অনুসরণ করল। পথচারি বেশি না থাকলেও আপ ও ডাউনে প্রচুর মোটর ও অন্যান্য যান চলাচল করছে।

অনেক পথ মাড়িয়ে গণপত রোহাতগী প্যালেসের কাছে এসে নামল। গেটের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানকে কি বলল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

বাসব কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করল। নিজের করণীয় সম্পর্কে দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখ পড়ল রাস্তার অপর পারের ডাক্তারখানার ওপর। রাস্তা পেরিয়ে বাসব ওখানে গিয়ে পৌঁছলো। জানা গেল, পঁয়ত্রিশ পয়সা দিলেই ফোন করতে দেওয়া হয়। রিসিভার তুলে নিয়ে যোগাযোগ করল ডি. এস. পি.-র সঙ্গে। এখান থেকে রোহাতগী প্যালেসের গেট দেখা যাচ্ছে এটাই আশার কথা।

ডি এস. পি বাংলোতেই ছিলেন। ফোন ধরলেন।

হ্যালো.. আমি বাসব বলছি...সবুজ গুঁড়োর রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন...

.. ...

বলেন কি...হাই এক্সপ্লোসিভ...

... ...

বস্তুটা কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তা নিয়ে পরে চিন্তা করলেও চলবে... আমি পাম অ্যাভিনিউর ন্যাশনাল ফার্মেসির সামনে অপেক্ষা করছি... টাউন ইনচার্জকে ইনস্ট্রাক্ট করুন এখুনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন...

বিশেষ প্রয়োজন...ছেড়ে দিচ্ছি,...

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পয়সা দিয়ে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এলেও দূরে কোথাও গেল না। একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টেনে চলল। গণপতের এখনও দেখা নেই।

আধ ঘন্টাটাক এইভাবে কেটে যাবার পর ইন্সপেক্টর উদয় হলেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ছায়া এখন আর নেই। কেমন যেন সন্ত্রস্ত ভাব।

বাসব কোন ভূমিকা না করে প্রশ্ন করল, রোহাতগী সাহেবের সিমেন্টের গুদাম কোথায় জানেন?

কাছেই। ওই যে বড় গাছটা দেখতে পাচ্ছেন—ওর সামনে।

আমি একজনকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি। সে যে প্যালেসের মধ্যে ঢুকে যাবে ভাবতে পারিনি। তার অপেক্ষায় আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। গুদামের পেছন দিকে এবার যেতে হবে। আপনিও আসুন।

ইন্সপেক্টর কিছুই বুঝলেন না। অবশ্য বাসবকে অনুসরণ করলেন।

গুদামের পেছন দিকে পৌঁছে দেখা গেল, সেই ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। অপর্যাপ্ত আলোও এখানে নেই। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। বাসব চাবি বার করে তালাটা খুলল। বাঁ-হাতে ওর টর্চ।

এই ঘরটা সার্চ করা দরকার। আমি ভেতরে যাচ্ছি। আপনি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিন। যতক্ষণ না আমি নক করছি, কাছাকাছিই কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করুন।

হতভম্ব ইন্সপেক্টর কথামত কাজ করার জন্য তৎপর হলেন।

ঘরের তালা বন্ধ করে ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে বাসব যখন ঘাসজমির ওপর পা দিল, তখন ঘড়িতে ঠিক পৌনে ন'টা। আধঘন্টাটাক ঘরের মধ্যে ছিল। টোকা শুনে *ইন্সপেক্টর তালা খুলে দিলেন। পাঁচিলের সঙ্গে গা মিশিয়ে আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।*

ইন্সপেক্টর, এখুনি একটা জিপ চাই।

কোথায় যাবেন?

দূরে কোথাও নয়। পালের গোদা কে আমি বুঝতে পেরেছি। সাকরেদ এবং তস্য সাকরেদদের সঙ্গে সে বোধহয় এখন মিটিং-এ বসেছে। আমাদের দেরি না করে একবার সেখানে যাওয়া দরকার।

কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে থানায় ফোন করলেই এখুনি জিপের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আসুন—

দুজনে পাম অ্যাভিনিউ ধরে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র—

সুবীর স্যান্যালের গাড়ি—

ইন্সপেক্টরের কথায় বাসব কাছাকাছি এসে পড়া গাড়িটার দিকে তাকাল। তারপর হাত তুলে থামার ইশারা করল। সুবীর দুজনকে দেখতে পেয়েছিল। ইশারা না করলেও ব্রেক নিত।

কোথায় চলেছেন?

কর্তার বাড়ি।

এই সময়?

ফোন পেলাম, রোহাতগীসাহেব বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চাইছেন।

কে ফোন করেছিল? নিজেই?

না, তাঁর একজন কর্মচারি।

ভ্রূ-কুঁচকে চিন্তিত গলায় বাসব বলল, আমার ছকে তো ব্যাপারটা গড়াচ্ছে না দেখছি! কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আসুন—

বাসব পেছনের সীটে গিয়ে বসল। ইন্সপেক্টরও বসলেন।

কোথায় যাব?

আপনার বাংলোয় চলুন।

বিস্মিত গলায় সুবীর বলল, আমার বাংলোয়—!

রোহাতগীসাহেব তো এসময় আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না, কারণ...মনে হচ্ছে এই সময় আপনাকে কেউ বাংলো থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চেয়েছে। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে দেখা দরকার।

গাড়ি দ্রুত ধাবিত হল।

বাংলোর সামনে এসে দেখা গেল গেট পুরোপুরি বন্ধ নেই। একটা পাল্লা আধখোলা অবস্থায় রয়েছে। বাইরেই গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল তিনজন। গেটের আধখোলা অবস্থা সন্দেহের উদ্রেক করছে।

আপনার চাকর কোথায়?

রান্নাঘরে থাকবার কথা।

গেট পেরিয়ে তিনজনকে বেশিদূর এগোতে হল না, ঝাউগাছটার কাছে কি একটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। ইন্সপেক্টর আগে দৌড়ে গেলেন। বাসব ও সুবীর ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দেহ চিৎ করে দেবার পরই বাসবের টর্চ ঝলসে উঠল।

গণপত!!!

তাব জামা রক্তে জবজব করছে। গুলি বুকেব মধ্যে কোথাও আটকে আছে মনে হয়। একনজরেই বুঝতে পারা যায় বেঁচে নেই। পুণপত যেন রহস্য নাটকের এক চরিত্র অভিনেতা। হঠাৎ মঞ্চে এল, আবাব চমক লাগিয়ে অদৃশ্যও হল হঠাৎ।

আবার মৃতদেহ? সুবীর ভয়ে নীল হয়ে গেছে।

আমাদের কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করলে চলবে না ইন্সপেক্টর। সময় বয়ে যাচ্ছে।

সে কি! এখানে যে—

সমস্ত ব্যবস্থা সুবীববাবুই করবেন। থানায় রিং করুন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ কিন্তু পাহারা দেবেন। আপনার গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

অসহায় সুবীরকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বাসব গেটের দিকে ছুটল।

কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও ইন্সপেক্টর ওর পিছু নিলেন।

দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে' গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগল না। পোর্টিকোয় তখন আরেকখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইন্সপেক্টর চিনতে পারলেন রোহাতগীসাহেবেব মার্ক-টু।

বাসব বলল, ভেতরে আমরা যাব না। বাগানের দিক থেকেই অনুসন্ধান চালান ভাল। অফিসঘর আর শোবার ঘর দুটোই একতলায় আমি জানি।

ওখানে কি ওদের পাওয়া যাবে?

সম্ভাবনা আছে। ওখানে সন্ধান না পেলে, পরে আবার বিষযটি নিয়ে তলিয়ে ভাবা যাবে।

পোর্টিকো মোটেই নির্জন নয়। লোকজন আসা-যাওয়া করছে। গাড়ি ঢুকছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে কারো দিকেই কারো নজর নেই। শীতকাল না হলে অবশ্য ইন্সপেক্টর দর্শনীয় হয়ে উঠতেন। কালো ওভারকোটে তাঁর ইউনিফর্ম ঢাকা পড়ে রয়েছে।

বাগানের দক্ষিণ দিকে এসে দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় কান লাগিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল। কাচের জানলা দিয়ে দেখা গেল অফিসঘরে কেউ নেই। আরও একটু এগিয়ে শোবার ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল। খালি। এবার বাসব বেশ চিন্তায় পড়ে গেল।

চাপা গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, ওদিকে একটা আউট-হাউসের মত রয়েছে। আলো জ্বলছে যখন, নিশ্চয় ওখানে কেউ আছে।

দুজনে এধারের নির্জন বাগান পেরিয়ে আউট-হাউসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। ভেতরে যে কথাবার্তা হচ্ছে, বারান্দায় পা দেবার পরই বুঝতে পারা গেল। দরজা ঘেঁষে দাঁড়াতেই কানে এল—

বিশ্বাস করুন, এ সবের আমি কিছুই জানি না। মাঝে মধ্যে লোকটাকে দেখতাম এই পর্যন্ত—মোটেই আলাপ ছিল না।

একই কথা তুমি বার বার বলে চলেছ, এইভাবে রাত কাবার হয়ে যাক, তা আমি চাই না। লোকটা গেছে—তুমিও যাবে। আমি নিজের মানসম্মানকে ভালবাসি। তোমার মত মারাত্মক সাক্ষীকে—

আমায় বিশ্বাস করুন—প্লিজ!

না, আর আমি তোমায় সময় দেব না—

ঠিক এই সময় নাটকীয় এক ঘটনার অবতারণা হল। ইন্সপেক্টর ও বাসবের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে দরজা মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল। ঘরে যে দুজন উপস্থিত ছিল, তাদের পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

বাসব পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল। বলল, ক্ষমা করবেন অমিয়বাবু। এইভাবে ছাড়া ঘরে প্রবেশ করার আর কোন উপায় ছিল না।

উৎকণ্ঠায় দম প্রায় আটকে আসার মত হলেও, নিজেকে সহজ করে নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন অমিয় ভৌমিক। তারপর কোনরকমে বললেন, এর মানে কি? কি চাই আপনাদের?

তিনটে খুন করলে তিনবার ফাঁসি হয় না জানি। তবু তৃতীয় খুনটা যাতে না হয়, তাই আমাদের এই অনধিকার চর্চা।

কি সমস্ত যা-তা বলছেন!

দৌলত রোহাতগীর সেক্রেটারি রাজেন ভার্মা দেওয়াল ঘেঁষে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আচমকা আপনার হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবার দিয়েই যে বুলবুল মিরানী এবং গণপত খুন হয়েছে, তা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া আপনার অ্যাসিস্টেণ্ট—ভয়ে যিনি নীল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্রধান সাক্ষী হিসাবেই হয়ত পুলিশ তাকে উপস্থিত করবে কোর্টে। তবে মশাই, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হবে। এক ঘণ্টা আগেও বুঝতে পারিনি, আপনিই এই কর্মকাণ্ডের নায়ক। ও কি করছেন—না, না, সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াবেন না। অতি সতর্ক আমার সঙ্গীটি, এক হাত খেল দেখিয়ে দিতে পারেন।

উদ্যত রিভলবার হাতে ইন্সপেক্টর অমিয় ভৌমিকের দিকে ছুটে গেলেন। বাসব ঝটিতে গিয়ে দাঁড়াল রাজেন ভার্মার সামনে। দুজন আসামীর কারো মুখে আর কোন কথা নেই। এত বড় কাণ্ড যে এখানে ঘটে গেল, সকলেরই তা অজানা। ব্যস্ত হোটেল মারিনা অপেক্ষা করছে স্তম্ভিত হয়ে যাবার জন্য।

পাইপে দীর্ঘ টান দিয়ে বাসব বলল, বুলবুল মিরানীর টাকার প্রতি তীব্র মোহ ছিল। পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে বা অন্য যে কোন উপায়ে হাতে টাকা এলেই হল। এদিকে রোহাতগীসাহেব বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অসম্ভব বাড়বাড়ন্তে অন্যান্য সিমেণ্ট কোম্পানির চোখ টাটিয়ে উঠেছিল। ওল্ড গোল্ডে তারা গোলমাল বাধাতে চায়, এ সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। কি ধরনের গোলমাল এবং কারা এ কাজ করবে, তা জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। রোহাতগীসাহেব এ কাজে বুলবুল মিরানীকে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। মহিলাটির সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা আছে, কাজেই তার পক্ষে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ হবে।

হোটেলে বসেই কথা হচ্ছিল। ঘরে ঝিকি আর সুবীর উপস্থিত রয়েছে। তাদের

অনুরোধেই বাসব দুটি রক্তাক্ত ঘটনার নেপথ্য কাহিনী বলছে। আজকের রাত্রের ট্রেনেই ওর কলকাতা ফিরে যাবার কথা।

মিসসকে কেউ সন্দেহ না করলেও, তিনি কোনক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন রাজেন ভার্মা এ ব্যাপারের মধ্যে আছে। এবং সিমেণ্টের গুদামের পেছনে যে ঘর আছে, সেখানে গোপনে ওর যাতায়াতও আছে। ওই ঘরে কি থাকে জানবার জন্য গণপতের সাহায্যে একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিলেন। ঘরের মধ্যে সকলের অজানতে ঢুকেও ছিলেন, নইলে তাঁর স্টিলের বাক্সর মধ্যে সবুজ গুঁড়ো থাকার কোন মানে হয় না। যাই হোক, মিসেসের গুপ্তচরবৃত্তির কথা কিন্তু চাপা রইল না। এরপর ষড়যন্ত্রকারীরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। গুলিতে প্রাণ দিলেন বুলবুল মিরানী। অবশ্য আমি এখনও বুঝতে পারিনি, সেদিন পার্টি থেকে বেরিয়ে তিনি এত রাত পর্যন্ত পাম অ্যাভিনিউয়ে ঘোরাফেরা করেছিলেন কেন? নিশ্চয় হত্যাকারীকে সুযোগ দেবার জন্য নয়।

আমার মনে হয় ভদ্রমহিলাকে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে বোধহয় ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ হত্যাকারী তাঁকে বলেছিল, রোহাতগীসাহেবের কাছে সমস্ত চেপে গেলে প্রচুর অর্থ দেওয়া হবে। অমুক জায়গায় অমুক সময় উপস্থিত থাকলে আজই দেওয়া হবে টাকাটা। তিনি গিয়েছিলেন এবং মারা পড়েছেন। এবার তদন্তের কথায় আসা যাক। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই ডাঃ চৌধুরীর সহযোগিতা না পেলে আমি কখনই এত তাড়াতাড়ি সফল হতে পারতাম না। তিনি গণপতের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই গণপত আরেক লোভি চরিত্র। আমার কথাবার্তা শোনার পর সে বুঝতে পেরেছিল, খুনের ব্যাপারে রাজেনের হাত আছে। কারণ সে বোধহয় রাজেনকে গুদামের পেছন দিকের ঘরে যাতায়াত করতে দেখেছিল। তার লোভি মন নেচে উঠল। সে খুনীর সন্ধান দিলে আমার কাছে টাকা পাবে, এই কড়ার করিয়ে নিয়ে 'রোহাতগী প্যালেসে' গেল রাজেনের কাছে। অর্থাৎ তাকে বলল বোধহয়, ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছি, আমাকে এত টাকা না দিলে সমস্ত ফাঁস করে দেব। দুদিক থেকে টাকা আদায় করার ফন্দি।

আমি অবশ্য গণপতের পিছু পিছু গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কার সঙ্গে দেখা করতে গেল তখনো বুঝতে পারিনি। ওখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইন্সপেক্টরকে ডাকিয়ে গুদামের পেছন দিকের ঘরে গেলাম। মিসেস মিরানীর ভ্যানিটি ব্যাগে চাবি পাওয়া গিয়েছিল। সেই চাবির সাহায্যেই ঘরের মধ্যে ঢোকা সম্ভব হয়েছিল। একটা টেবিল আর গোটাকয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাব ছিল না। টেলিফোন ছিল টেবিলের ওপর, আর এককোণে বড় বড় আট-দশটা প্যাকেট রাখা ছিল। প্যাকেটের ওপর ঠিকানা লেখা আছে মারিনা হোটেলের। এর মানে প্যাকেটগুলো আগে ওখানে এসেছে, তারপর এখানে এনে রাখা হয়েছে। একটা প্যাকেট ছিঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল সবুজ মিহি গুঁড়ো। এই গুঁড়োর সন্ধান আমি আগেই মিসেস মিরানীর আলমারিতে পেয়েছিলাম। তিনি নিশ্চয় এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি একথাও জানতে পেরেছিলাম এই গুঁড়ো ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা চলে।

সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে এল এবার। শুধু মাত্র গোলমাল বাধানো নয়, ওস্ড

গোল্ডের অংশ বিশেষকে উড়িয়ে দেবারই পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে উদ্যোক্তাদের হয়ে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন অমিয় ভৌমিক। এবং তাঁকে সহযোগিতা করছে রাজেন। ইতিমধ্যেই ওই ঘর থেকে রোহাতগীসাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানতে পেরেছিলাম, রাজেন একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে মোটরে চেপে কোথায় যেন বেরিয়েছে, আজ সে থাকছে না—লালা হংসরাজের বাড়িতে নেমন্তন্নে যাচ্ছে। বুঝলাম, নাটকের শেষ দৃশ্য হোটেল মারিনাতেই অভিনীত হবে। ওখানে যাবার পথেই আপনার সঙ্গে দেখা এবং আপনার কম্পাউণ্ডে গণপতের মৃতদেহ আবিষ্কার। তার মত বিরক্তিকর চরিত্রকে সরানো দরকার ছিল। পরিস্থিতি ক্রমেই দারুণ ঘোরাল হয়ে উঠছে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত রাজেনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তখন দারুণ বিপাকে পড়তে হবে—এই সমস্ত ভেবে অমিয়বাবু সাকরেদটিকেও সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু আমরা গিয়ে পড়ায় তাঁর সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

একটানা এতখানি বলার পর বাসব থামল।

ঝিকি ও সুবীর তন্ময় হয়ে শুনছিল।

ঘরে প্রায় মিনিট দুয়েক পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর সুবীর বলল প্রশংসার কথা বলে আপনাকে ছোট করার সাহস আমার নেই। শুধু একটা প্রশ্ন আছে। অমিয় ভৌমিকের স্বার্থ কি?

সেই সনাতন স্বার্থ। ওল্ড গোল্ডের বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয় তাঁকে প্রচুর টাকা দিয়েছিল। আপনি কিছু জানতে চান?

একটু হেসে ঝিকি বলল, আমার কিছু জানবার নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি।

এই সময় দৌলত রোহাতগী ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই তিনজনে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঝিকির একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল।

রোহাতগী বললেন, এতক্ষণ দেখা করতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার কাণ্ডকারখানায় আমি অভিভূত। অনেক লোকসানের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন। এই সামান্য—

কথা শেষ না করেই চেকটা বাড়িয়ে ধরলেন।

আপনি কেন? আমাকে তো নিয়োগ করেছেন মিস্টার সান্যাল।

তা ঠিক। তবে আমি পেমেণ্ট করলে সুবীর কিছু মনে করবে না। চেকটা নিন দয়া করে—

বাসব এক নজর দেখে নিল, বেশ ভাল সংখ্যাই সাজিয়েছেন রোহাতগীসাহেব। চেকটা পকেটে রেখে, এতক্ষণ পরে নিভে-যাওয়া পাইপটা আবার সে ধরাল।

শুক নয় শারি নয়

প্রায় নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নির্মল সিগারেট ধরাল।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

আর দিন পনেরো পর থেকে রক্ত জমাট করা যে শীত পড়বে তার সূচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানকার শীতের খ্যাতি বা অখ্যাতি অনেকের জানা থাকায় ওই ঋতু শেষ হওয়ার মুখে সকলে আসে এখানে হাওয়া বদল করতে।

তখন মালিচকে নানা প্রদেশের নানা শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায়। পাহাড়-ঘেরা উপ-শহরটির তখন সে এক বিচিত্র রূপ। বলতে গেলে ঝাঁঝার আর কোন আকর্ষণ আগের মত চেঞ্জারদের মনকে নাড়া দেয় না। প্ল্যাটফর্মের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার পাক মেরে নির্মল প্রায় সিগারেটটা শেষ করে আনল। টুকরোটা লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকাল রিস্টওয়াচের দিকে।

একটা বাহান্ন!

একটা চল্লিশে ট্রেন আসার কথা। খবর নিয়ে জানা গেছে, নর্থবিহার এক্সপ্রেস আড়াইটের সময় আসবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ মিনিট লেট। ভীষণ বিরক্তিবোধ মনকে চেপে ধরে যদি নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন না আসে। বিশেষে গভীর রাতে যদি অপেক্ষা করতে হয়।

বিরক্তি আর ক্লান্তি দুইই নির্মলকে সাপটে ধরেছে। সে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল। ভগবান জানেন আড়াইটের সময় গাড়ি আসবে কিনা। এরকম তো প্রায়ই দেখা যায়, এনকয়ারীতে এক ঘণ্টা লেটের কথা বললেও গাড়ি এল আরো অনেক পরে।

নির্মল তাকাল এদিক-ওদিক।

গভীর রাত যেন অন্ধকারের চাপে ঝিমিয়ে রয়েছে। ইয়ার্ডের এখানে-ওখানে মিটমিট করছে গোটাকয়েক আলো। দূরে সিগন্যালের লাল চোখ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মও ভাল করে আলোকিত নয়। কেমন আবছা ভাব। আপ ও ডাউনের মাঝামাঝি লাইনের উপর একসারি বক্স-ওয়াগানের লেজুড় নিয়ে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়াচ্ছে। ওয়াগানগুলো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে জুড়ে দেবার বর্তমান কোন তাগিদ নেই মনে হয়।

নির্মল বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না।

ভীষণ মশার উপদ্রব। মনের মধ্যে বিরক্তির চাপ ক্রমেই বাড়ছে। রমেনের কি কাণ্ডজ্ঞান, এই মাঝরাতের গাড়িতে আসার কোন মানে হয়? তুফান এক্সপ্রেসে এলে এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হত? কিউলে ট্রেন বদল করতে হত এই পর্যন্ত, কিন্তু সুবিধার মধ্যে দিনে দিনেই পৌঁছনো যেত।

নির্মল পায়ে পায়ে চাকাওয়ালা টি-স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিরক্তির সঙ্গে আলস্যও শরীরকে ক্রমেই আঁকড়ে ধরছে। এককাপ চা খেলে আলস্য কেটে যেতে

পাবে। গনগনে উনুনেব উপর বিবাট কেটলিতে জল ফুটছে। ছোকবা স্টল-কিপাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। নির্মল গিয়ে উপস্থিত হতেই দ্রুত হাতে এক কাপ চা তৈরি কবে এগিয়ে ধরল।

নির্মল সবে পেযালায় ঠোঁট ঠেকিয়েছে—

—ডাক্তারবাবু, আপনি—?

মুখ ফেরাতে হল না। এক কালো-কোলো নাদুস-নুদুস চেহাবাব ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে একগাল হাসি।

—একি, বাধাকান্তবাবু যে? আপনি এখানে?

—দরকার পড়লে আসতেই হয।

—কোথাও যাচ্ছেন তাহলে। কলকাতায নাকি?

রাধাকান্ত দত্ত ব্লক অফিসের বড়বাবু। বলিয়ে-কইয়ে এবং খাইয়ে হিসাবে পরিচিত মহলে তাঁর খ্যাতি আছে। একবার নাকি এক খাওয়ার আসরে মাঝারি সাইজের একটা পাঁঠার অর্ধেক সাবড়ে দেবার পব, একান্নটা পান্তুয়া খেয়েছিলেন।

—কলকাতায নয়। দুপুরে চিঠি পেলাম, ভাগনের খুব শবীর খাবাপ। তাই আসানসোল যাচ্ছি। আপনি?

—কোথাও যাচ্ছি না। এক বন্ধু এই গাড়িতে আসছে।

আক্ষেপেব সুরে বাধাকান্ত বললেন, আপনার গাড়িতে এলে কত ঝামেলা এড়ানো যেত বলুন তো?

মৃদু হেসে নির্মল বলল, আজ যে আপনি আসানসোল যাবেন তাতো আমাব জানা ছিল না। এলেন কিসে?

—আর বলেন কেন, সেই ছ্যাক্‌ড়া বাসে।

—ইদানিং তো আপনাকে বাজারের দিকে একেবারেই দেখি না। ব্লক অফিসেব চৌহদ্দির বাইরে পা বাড়ানো ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

—অফিসে যে কাজের চাপ চলেছে বলার নয়। চশমাটা ঠিক লাগছে না। আপনাব কাছে একবার যাওয়া দরকার কিন্তু সময় পেলে তবে তো যাব।

—আসানসোল থেকে ফিরে আসার পর চেম্বারে একদিন আসুন। চোখটা ভাল করে দেখে দেব। চা খাবেন?

—চা থাক। একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বরং খাওয়ান। আপনার স্ত্রীর শুনেছি রান্নার চমৎকার হাত। আপনি চা খান। আমি বরং টিকিটটা গিয়ে কাটি। ভুঁড়ি দুলিয়ে রাধাকান্ত টিকিট ঘরের দিকে চলে গেলেন। চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে, অদূরের বেঞ্চে আবার গিয়ে বসল নির্মল। সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান দেবার পর মনে পড়ে গেল বছর চারেক আগেকার একটি দিনের কথা। এখানে আসার সেই প্রথম দিন।

রুজি-রোজগাবের সন্ধানে নির্মল সেদিন এসে পা দিয়েছিল ঝাঝা স্টেশনে। অবশ্য ওর গন্তব্যস্থল ছিল আরো মাইল দশেক দূরের মালিচক। কলকাতা থেকে অবশ্য সরাসরি ও এখানে আসেনি। আরো বছর তিনেক আগে এসেছিল এই জেলার সদর মুঙ্গেরে।

ওখানে যাবার ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়। অল্প বয়সে পাশ করে বেরুবার কিছুদিন পর থেকেই একজন ভাল চোখের ডাক্তার হিসাবে পরিচিত মহলে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু কলকাতায় জমিয়ে বসতে পারছিল না। ঠিক এই রকম সময় বাল্যবন্ধু রমেন এক প্রস্তাব দিল।

—বিহারে যেতে রাজী থাকতো বল? প্র্যাকটিস্ জমে উঠবে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

—বিহারের কোথায়?

—মুঙ্গের।

—মুঙ্গের!

—জায়গা ভাল। ওখানে অনেক বাঙ্গালী জেনারেল ফিজিশিয়ান থাকলেও চোখের ডাক্তার একজনও নেই। পেশেন্টদের ছুটতে হয় পাটনায়। তুমি যদি গিয়ে পড় তাহলে কত সুবিধা হয়।

রমেন কিছুদিন হল বারাউনি অয়েল রিফাইনারিতে যোগ দিয়েছে। ওই তৈল নগরের সদর হল মুঙ্গের। কাছেই। যখন তখন গেছে। সুতরাং ওই শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তার।

কথাটা মনে লাগল নির্মলের।

মাসখানেকের মধ্যেই ও চলে এল মুঙ্গেরে। রমেন মিথ্যে বলেনি—বেশ জায়গা। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। চেম্বারের জন্য ভাল জায়গাই পাওয়া গেল। অনেক ভেবেচিন্তে চেম্বারের নামকরণ করল 'রেটিনা'। জোর কদমে না হলেও মোটামুটি ভালভাবেই চলতে লাগল 'রেটিনা'।

এইভাবে কেটে গেল তিন বছর।

ইতিমধ্যে নির্মলকে বলেছিল কয়েকজন, মালিচকে গিয়ে প্র্যাকটিস্ করতে। ওখানে মুঙ্গেরের চেয়ে পসার নিশ্চয় বেশি হবে। এই সময় দেবব্রত চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথাবার্তা হল ওই প্রসঙ্গে। সর্ব বিষয়ে উৎসাহী ওই ভদ্রলোক দেবব্রত নয়, দেবু চ্যাটার্জী হিসাবেই খ্যাত। পেশায় লাইফ ইন্সিওরেন্সের ফিল্ড অফিসার। আগে মুঙ্গেরের যত্রতত্র তাঁকে স্কুটারে ধাবমান অবস্থায় দেখা যেত, এখন কিছুদিন থেকে অবশ্য মালিচক ওঁর কর্মকেন্দ্র।

অনেক যুক্তিতর্ক-সহযোগে দেবু চ্যাটার্জী নির্মলকে যা বোঝালেন তার সার কথা হল, মুঙ্গেরে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। মালিচকে লোকে মুঠোমুঠো ধুলো সোনা করে ফেলছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর কথাই ধরা যেতে পারে, এখানকার চেয়ে এক বছরে উনি দ্বিগুণ লাইফ সংগ্রহ করেছেন কর্পোরেশনের জন্য ওখানে। তাছাড়া শহরটি বাঙ্গালীপ্রধান। প্রাকৃতিক পরিবেশও অনবদ্য।

শেষ পর্যন্ত নির্মল নিজের 'রেটিনা'কে এনে ফেলল মালিচকে। এভাবে ও দ্বিতীয়বার নিজের কর্মকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করল। রজনীপুরা অর্থাৎ শহরের কেন্দ্র স্থলেই এখন ওর অবস্থান। দেবু চ্যাটার্জী কিছু ভুল বলেননি, ব্যবসা দারুণ জমে উঠেছে। তরুণ চিকিৎসক নির্মল চ্যাটার্জী স্থানীয় সমাজের এখন বিশিষ্ট চরিত্র।

মালিচকে আসার কিছুদিন পরই ও বিবাহ পর্বটা চুকিয়ে নিয়েছে। কতদিন আর একা একা দিন কাটান যায়। কলকাতার গরচা রোডের হাস্যময়ী সন্ধ্যা ব্যানার্জী ওর নব-পরিণীতা বধূ।

নির্মলের চিন্তাস্রোতে এই সময় বাধা পড়ল।

ট্রেন আসছে।

চিন্তায় এমন তন্ময় হয়েছিল যে, কখন ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়েছে শুনতে পায়নি।

প্রায় যাত্রীহীন প্ল্যাটফর্ম, তবু কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। প্রবল শব্দ তুলে যন্ত্রদানব এসে দাঁড়াল। প্রথমে প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলোর দরজা ধাক্কাধাক্কি করল নির্মল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অর্থাৎ রমেন প্রথম শ্রেণীতে নেই।

এরপর ট্রেনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি কামরা খুঁজেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মাত্র দশ মিনিট স্টপেজ এখানে। নির্দিষ্ট সময়েই ট্রেন স্টেশন ছাড়ল। বিরক্তির ভাবে নুয়ে পড়া মন নিয়ে নির্মল বেরিয়ে এল প্ল্যাটফর্ম থেকে। মাঝরাতে ওকে স্টেশনে টেনে এনে রমেন এধরনের রসিকতা করল কেন ভেবে পেল না ও।

নির্মল এসে উঠল নিজের ফিয়েটে।

গত বছর এই গাড়িখানা নির্মল কিনেছে। ঘুমন্ত ঝাঝাকে পাশ কাটিয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে এসে পড়ল হাইওয়ের উপর। দিনের বেলা এই পথ অত্যন্ত নয়ন-রঞ্জক। দু'পাশের সারি সারি দেবদারু আর বাওবাব গাছগুলি যখন ধাবমান গাড়ির পিছনে সরে সরে যায় তখন এই দৃশ্যের বর্ণাঢ্যতা মনকে নাড়া দিতে থাকে।

এখন অবশ্য পরিষ্কারভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম আকাশে হেলে থাকা চাঁদের মরা আলোয় চারিধারে অস্পষ্টতা এসেছে। থমথমে পরিবেশের উপর ঝিঁঝির ঐকতান কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পাচ্ছে না।

মালিচক পর্যন্ত এই টানা রাস্তা অত্যন্ত নির্জন হওয়ায় গভীর রাতে মোটরের যাতায়াত অত্যন্ত কম। শীতকালে আরো কম। নানা প্রয়োজনে নির্মলকে অবশ্য রাতে-বেরাতে এই পথ দিয়ে কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। সন্ধ্যাও ছিল একবার সঙ্গে। অন্ধকারের নগ্ন রূপ দেখে আর নাম-না-জানা পোকাদের ডাক শুনে শ্রীমতীর সে কি ভয়।

ড্যাশবোর্ডের আলোয় নির্মল দেখল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে স্পীডোমিটারের কাঁটা ওঠা-নামা করছে। গাড়ির গতি আরো একটু বাড়িয়ে দিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি পৌঁছানো দরকার। অসুস্থ শরীর নিয়ে সন্ধ্যা জেগে বসে আছে। ডাক্তারের নির্দেশ হল, ওকে এখন ভাল রকম রেস্ট দিতে হবে। কিন্তু—

নির্মল একটু আনমনা হয়ে পড়ল। ছেলে না মেয়ে—কি হবে কে জানে! কথায় বলে প্রথমে মেয়ে হলে বাপের আয়ু বৃদ্ধি করে। তা হোক, তবু ছেলে হলেই ভাল হয়। নাম রাখবে নীলয়। বেশ মানানসই হবে।

আনমনা হয়ে পড়লেও ওর দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই সামনের দিকে প্রসারিত ছিল। প্রথমে খেয়াল হয়নি। হঠাৎ চটকা ভাঙ্গল। হেডলাইটেব আলোয় দেখা যাচ্ছে, কিছু দুরে রাস্তাব মাঝামাঝি জায়গায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সময় মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার কে কি করছে?

গাড়ি চাপা পড়ার ভয় নেই! তাড়ির হাঁড়ি শেষ করা কোন মাতাল নয় তো?

বাধ্য হয়ে নির্মল গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। ওর বিস্ময় তুঙ্গে গিয়ে উঠল আরো একটু এগিয়ে যাবার পর। গাড়ির তীব্র আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন, একটি সুবেশা তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুবেশা তরুণী—!

এই সময়—এখানে!!

তরুণী নিজের জায়গা থেকে এক পা না সরে, হাত তুলে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করছে দেখা গেল। নির্মল দ্রুত চিন্তা করল, বিপদে পড়ে নিশ্চয় সাহায্য চাইছে। কিন্তু সঙ্গে কোন পুরুষ নেই! তবে কি—! এত রাত্রে কোন মহিলাকে এই রকম নির্জন জায়গায় সাহায্য করতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। পাশ কাটিয়ে এখন চলে যাওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

নির্মল ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তরুণী ওর মনের ভাব আঁচ করে নিয়ে নিজের জায়গা থেকে সরে এসে আবার গাড়ির মুখ আগলে দাঁড়াল। এই অবস্থায় চাপা দিয়ে চলে যেতে হয়—গাড়ি না থামিয়ে আর উপায় ছিল না।

তরুণী এগিয়ে এল ড্রাইভিং সিটের দিকে।

—কি হয়েছে?

হিন্দীতে দ্রুত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে নির্মল তাকে দেখে নেবার চেষ্টা করল। হেডলাইটের সামনে থেকে সরে আসার দরুণ এখন অবশ্য ভালভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবুও বুঝতে পারা যায় তরুণী সুন্দরী এবং সুদেহের অধিকারিণী।

সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বলল, আমাকে সাহায্য করুন। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।

নির্মল বুঝল, ওর মাতৃভাষা হিন্দী নয়, বাংলা।

তাই বাংলাতে বলল, আপনাকে লিফ্‌ট দিতে হবে—?

—না।

—তবে?

—নেমে আসুন।

—নেমে আসবো!

—হ্যাঁ।

—আপনি এত রাত্রে এখানে কিভাবে এলেন? তাছাড়া আমি গাড়ি থেকে নেমে করবোটা কি?

—কথা বাড়াবেন না। ওই পাশের রাস্তাটায় যেতে হবে।

—কিন্তু—

—দয়া করে তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। ভীষণ বিপদে না পড়লে আপনাকে নামতে বলতাম না।

ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও নির্মল দরজার হাতল ঘোরাল। এক প্রবল আকর্ষণ ওকে নামিয়ে আনল রাস্তায়। বেশ অনুভব করছে, হয়ত কোন ঘনীভূত বিপদের বেড়াজালে নিজেকে আটকে ফেলেছে। তবুও এগিয়ে যাওয়া তরুণীকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করে চলল।

হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত একটা মেঠো পথ পশ্চিমদিকে চলে গেছে। দু'পাশে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা অজস্র গাছ রাস্তাটিকে পরিপূর্ণ এভিনিউএ পরিণত করেছে। তরুণীর পিছু পিছু ওই পথ ধরে নির্মল এগিয়ে চলল।

শ'দেড়েক গজ এগুবার পব অগ্রবর্তিণী থামল। সামনেই একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ি আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। বহুকাল আগে কোন গ্রাম্য জমিদারের আবাসস্থল ছিল বোধহয়। এখন এই জীর্ণ অট্টালিকায় কেউ বাস করে বলে মনে হয় না।

তরুণী আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তবে সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল না। বাড়ির ডান ধারে অবস্থিত বিরাট এক ইদারার সামনে গিয়ে থামল। ইদারার বাঁধানো অংশটা খোয়া উঠে যাওয়ায় এখন বিশ্রী দেখাচ্ছে। এখানে থমথমে ভাবটা যেন আরো বেশি।

ওকে এখানে ডেকে আনার অর্থ কি?

তরুণী আঙ্গুল দিয়ে ইদারার মধ্যেটা এবাব দেখাল।

বিচিত্র ব্যাপার! নির্মল এগিয়ে গিয়ে ইদাবাব মধ্যে উঁকি মারল। জমাট অন্ধকারকে ভেদ করে দৃষ্টি সুদূরে পাঠান গেল না। এরপবই এক অভাবনীয় ব্যাপারের মুখোমুখি দাঁড়াল ও। ইদারার কাছ থেকে সরে এসে মুখ ফেরাতেই দেখল, তরুণী নেই!

দ্রুত চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিযে নিল—সে নেই। বিপদে পড়েছে বলে ডেকে এনে কোথায় অদৃশ্য হল? কয়েক পা এগিয়ে নির্মল আবার এদিক-ওদিক তাকাল। বৃথা অনুসন্ধান। কোথাও সে নেই। মনে হয় যেন, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

প্রচণ্ড ভয় এবার নির্মলকে সাপটে ধবল।

ভৌতিক ব্যাপার নয়তো? নিশ্চয় তাই। নইলে রক্ত-মাংসে গড়া একটা দেহ এইভাবে কোথায় মিলিয়ে যাবে? তাছাড়া এই বিজন অঞ্চলে, গভীর নিশীথে—ভদ্র চেহারার সুবেশা তরুণীই বা আসবে কিভাবে? এ এক অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং—

রক্তের ঠাণ্ডা স্রোত উপর দিক থেকে শরীরের নীচের দিকে নামতে আবম্ভ করেছে। নির্মল ছুটে পালাবার চেষ্টা করল ওখান থেকে, কিন্তু পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে জুড়ে গেছে। ওর বোধশক্তিকে কে যেন প্রচণ্ডভাবে অনেকদূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী ডানা ঝট্‌পটিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। বোধহয় নাইট জার বা ওই ধরনের কোন পাখী হবে। চারিদিকের হাওয়া কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামতে আরম্ভ করেছে নির্মল।

ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের ভয় পাওয়ার মাত্রা যে এমন চরমে উঠতে পারে তা অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনাও করতে পারা যায় না। হঠাৎ নির্মল মরিয়া হয়ে উঠল। নিজেব সমস্ত শক্তি দিয়ে শরীরকে ঝাঁকুনি দিল, তারপর সাধ্যমত দ্রুততার সঙ্গে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল হাইওয়ের দিকে।

মাত্র একশ কি দেড়শ গজ পথ অতিক্রম করতে কত সময় লাগল নির্মল তা জানে না। গাড়ির কাছে পৌঁছে হাঁপাতে লাগল। কি অভাবনীয়—কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ভূত আছে নির্মল কোন দিন মানতে চায়নি। বন্ধু-বান্ধবের সমস্ত যুক্তি-তর্ককে ফুঁ

দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে চোখের উপর যা দেখল—শুধু দেখা কেন, কথা পর্যন্ত বলল, তাতো হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়।

এখনও শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর এখানে এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করা নয়, দ্রুত গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসে ঝটিতে সেল্‌ফস্টার্টারে টান দিল নির্মল। স্টার্ট ধরল না! একি, কি হল আবার? দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে অবশ্য গাড়ি গতি নিল। তারপর মনের সমস্ত শক্তিকে যান্ত্রিক কলা-কৌশলের উপর একত্রিত করে ধাবিত হল মালিচকের দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্মলের ফিয়েট পৌঁছে গেল লোকালয়ে। অবশ্য জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই রাস্তায়। ঘুমের কোলে ঢলে থেকে এই শীতের রাতকে সকলেই উপভোগ করছে। তবু লোকালয় তো—নির্মলের মন থেকে ভয়ের ভাব অনেকটা কেটে গেল।

গাড়িব গতি মন্থর করে ও চিন্তা করতে লাগল। এমন ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা আর বোধহয় কারুব হয়নি। হলে, শহরে এতদিন হৈ-চৈ পড়ে যেত। কিন্তু মেয়েটি কি বলতে চাইছিল? ওই ইদারায় পড়ে মারা গেছে এই কথাই কি তার বোঝাবার উদ্দেশ্য ছিল?

বিটেব কনস্টেবলকে ফুটপাথ ধবে মন্থরপায়ে আসতে দেখা গেল। ওকে বলবে নাকি ঘটনাটা? কিন্তু বলে কি লাভ? ভৌতিক ব্যাপারে আর সকলের মত পুলিশও তো অসহায়। নির্মল কনস্টেবলকে পাশ কাটিয়ে, আরো কিছু দূর এগিয়ে মোড় ঘুরে নিজের বাসার সামনে গিয়ে থামল। গাড়ি গ্যারাজে রেখে সন্ধ্যার মুখোমুখি হল।

—বন্ধু এল নাতো?

—না। আমার দুর্ভোগ আর তোমার রাত জাগাই সার হল।

—অসুস্থ হয়ে পড়লে উনি কিভাবে আসবেন বল?

নির্মল অবাক হল।

—রমেন অসুস্থ তুমি কিভাবে জানলে?

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বলল, তুমি বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই টেলিগ্রামটা এল। ওঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

—ও। চল, খেয়ে নেওয়া যাক।

ওই ঘটনার পর দিন পাঁচেক অতিক্রান্ত হয়েছে।

ভৌতিক ঘটনার কথা নির্মল কাউকে বলতে পারেনি।

সন্ধ্যাকেও নয়।

বর্তমানে ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে ওকে এই ধরনের ভীতিপ্রদ কথা না শোনানই ভাল। বাইরের কাউকে বলতে পারেনি এই জন্যে যে, কেউ তার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না। হাসবে মনে মনে। তবে নির্মল নিজে এতদিন ধরে ওই ব্যাপার নিয়ে অবিরাম মাথা ঘামিয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, কোন কূল-কিনারা দেখতে পায়নি।

এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপারের মুখোমুখি কেউ কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। শুধু

দেখলে বা পিছু পিছু কিছুটা গেলেও ধরে নেওয়া যেত চোখের ভুল—মনের বিকার। কিন্তু তাতো নয়। নির্মল যে তাব সঙ্গে কথা বলেছে, একেতো মনের বিকার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না? তবে—? রুগী না থাকলে চেম্বারে বসে বসে আজকাল শুধু এই সমস্তই ভাবে।

আজকের পরিস্থিতিও তাই।

তবে চিন্তাকে দীর্ঘতর কবার আগেই অরুণ সরকার চেম্বারে প্রবেশ করল। গৌরবর্ণ, বিরল কেশ, সুরূপ অরুণ ডাক বিভাগেব সঙ্গে যুক্ত আছে। মাঝে মাঝেই আসে। আজ আবাব ছুটির দিন। বন্ধুব সঙ্গে বোধহয় স্রেফ আড্ডা মারার জন্যই এখন এল।

বসতে বসতে বলল, একটা খবব শুনেছো?

—কি বলতো?

—কি আশ্চর্য এখনও শোনোনি?

মৃদু হেসে নির্মল বলল, কত খবরই তো আছে, কোন্‌টার কথা তুমি বলতে চাইছো না জানলে কিভাবে বুঝবো?

অরুণ দ্রুত গলায় বলল, সকলে বলাবলি করছে, একজন ট্যাক্সিড্রাইভার গত রাত্রে এক ভৌতিক ব্যাপারের মুখোমুখি হয়েছিল।

ভৌতিক ব্যাপার !!!

উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ যেন নির্মলের সারা শরীরের উপর দিয়ে খেলে গেল। একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের অভিজ্ঞতা তারই মত নাকি? সেও কি অশরীরী যুবতীর সাক্ষাৎ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে?

—আমি তো কিছু শুনিনি। খুলে বলতো ঘটনাটা—

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নির্মল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তারই হুবহু ছবি অরুণের বর্ণনায় এবার পাওয়া গেল। শুধু তফাতের মধ্যে ঘটনার নায়ক একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল। আর কোন রকমে ফিরে আসতে পেরেছিল নিজের গাড়ির কাছে, কিন্তু ড্রাইভারেব স্নায়ু ছিল দুর্বল তাই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল পোড়ো বাড়ির সামনে। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবার পর, ট্যাক্সির ক্লিনার চিন্তিত হয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে এবং ড্রাইভারকে কোনরকমে ওখান থেকে উদ্ধার করে আনে।

—তুমি কার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলে?

—ট্যাক্সি ইউনিয়ানের সেক্রেটারি রামদেবকে চেনতো? কিছুক্ষণ আগে তার মুখ থেকে শুনলাম। আমার কিন্তু বেশ অদ্ভুত লাগছে।

—অদ্ভুত লাগছে কেন?

—এরকম একটা কথা শুনলে অদ্ভুত লাগবে না? আমার মনে হয ড্রাইভার বেটা নিশ্চয় নেশার ঘোরে ছিল।

নির্মল কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বাইরে স্কুটার থামার শব্দ হল এই সময়। পর মুহূর্তে চশমা খুলতে খুলতে দেবব্রত ঘরে প্রবেশ করলেন। দ্রুত স্কুটার চালাবার সময় চোখে কাচের আবরণ না রাখলেই নয়।

চেয়ারে নিজের শরীর ছেড়ে দিয়ে দেবব্রত বললেন, গাঁজার ধোঁয়ায সমস্ত শহর ভরপুর। এই ধোঁয়ার চাপ এখন কদিন থাকবে কে জানে।

সবিস্ময়ে নির্মল প্রশ্ন করল, গাঁজার ধোঁয়া?

—তাছাড়া আর কি বলব বল? যেখানে যাচ্ছি সেখানে একই গল্প। কোন এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার নাকি ভূত দেখেছে!

অরুণ বলল, আমি সেই গল্পই শোনাচ্ছিলাম ডাক্তারকে। আপনি ঠিকই বলেছেন, এ এক গ্রেট গাঁজা। কি দেখতে কি দেখেছে—মাঝ থেকে অখ্যাত ড্রাইভারটা বিখ্যাত হয়ে গেল।

—ভূতের দেখা পাওয়া এত সহজ নাকি? আমি তো দিন রাত স্কুটার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কই, আমি তো আজ পর্যন্ত ভূত দেখলাম না? বেটা হয় নেশা করে ছিল, নয়তো গল্প বানিয়ে বলছে।

এবার দ্রুত গলায় নির্মল বলল, ট্যাক্সি-ড্রাইভাব মিথ্যা কথা বলেনি।

—তার মানে?

—সে নেশার ঘোরে ছিল না বা গল্প বানিয়েও বলেনি।

—তুমি কি বলতে চাইছো?

—যা বলতে চাইছি তা শুনলে আপনাবা বিশ্বাস কবতে চাইবেন না দেবুদা। কিন্তু এখন আর না বলে উপায় নেই। ড্রাইভার যা দেখেছে আমিও কয়েকদিন আগে ঠিক তাই দেখেছি।

—বল কি!

—আমি মিথ্যা কথা বলছি না দেবুদা।

দেবব্রত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নির্মলের দিকে। বলা বাহুল্য, অরুণ সরকাবের অবস্থা তথৈবচ।

ইন্দ্রনাথ হাজরা মাস ছয়েক হল বদলী হয়ে এসেছেন মাল্চিকে। আগে সাহাবাদ জেলায় নিযুক্ত ছিলেন। মফস্বল ডি. এস. পি. হিসাবে সেখানে তিনি সুনামেব সঙ্গে কাজ করেছেন। আশা করেছিলেন, এবার হয়ত সদরে পোস্টেড হবেন। কিন্তু তা হল না, তাঁকে আবার আসতে হল সেই মফস্বলে। কাজেই খুশি মনে প্রথমে মালিচককে মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।—কিন্তু এখানে সপ্তাহ খানেক থাকার পরই এই শহরটিকে ভালোবেসে ফেললেন ইন্দ্রনাথ।

ডি. এস. পি. গিন্নি সুলেখাও নাক সিঁটকে ছিলেন। নাকের চামড়া বেশ কিছু দিন আগে থেকেই সোজা হয়ে গেছে। নিজের লোকের অভাব ছিল এখানে। তাও পূর্ণ হয়ে গেছে রজত আসার পর। মিসেস হাজরার বাপের বাড়ি ভাগলপুর। তাঁর ভাইপো রজত পাশ করার পর চাঁকরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছিল, ইন্দ্রনাথের চেষ্টায় সে মালিচকের কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে। স্বামীর হাতে সময় কম, কাজেই ভাইপো কাছে এসে পড়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে মিসেস হাজরার। সিনেমা, মার্কেটিং ইত্যাদি রজতকে সঙ্গে নিয়েই সেরে নিতে পারেন।

অবশ্য রজত ওঁদের সঙ্গে থাকে না। অজস্র অনুরোধ সে সবিনয়ে এড়িয়ে গেছে। তার বক্তব্য হল, ওঁরা তো কয়েক বছরের মধ্যেই বদলী হয়ে চলে যাবেন, তখন

হয়ত বাসা পাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। মালিচকে বাসা পাওয়া এখনই বেশ কঠিন। পাওয়া যখন গেছে তখন তাকে হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অবশ্য নিয়মিত হাজরা দম্পতির সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করতে আসে।

আজ ছুটির দিন। সকালেই এসেছে রজত, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে বাসায় ফিরবে এই রকম স্থির হয়ে আছে। চায়ের টেবিলে এটা ওটা আলোচনা হচ্ছিল, এমন সময় বেয়ারা এসে জানাল, ইন্সপেক্টার বার্ণবাল দেখা করতে এসেছেন।

ইন্দ্রনাথ ওখান থেকে উঠে বাইরের ঘরে এলেন। কি খবর ইন্সপেক্টার?

—আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে এলাম স্যার, বার্ণবাল বললেন।

—কোন্ কেসটি সম্পর্কে বলুন তো?

একটু ইতস্ততঃ করে ইন্সপেক্টার বার্ণবাল বললেন, মালিচক—ঝাঝা রোডের উপর সম্প্রতি ভৌতিক ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে।

—ভৌতিক ব্যাপার!

—হ্যাঁ স্যার, একটি মেয়ে গাড়ি থামিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেললেন, আপনারা এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করেন!

বিব্রতভাবে ইন্সপেক্টার বললেন, একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মুখ থেকে প্রথমে ঘটনাটা জানা যায়। আমাদের কানে কথাটা আসার পর ওটাকে আমরা বানানো গল্প বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই ডাঃ চ্যাটার্জী এসে জানালেন, তিনিও প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যাপারটা। আজ সকালে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের মুখ থেকেও ওই একই কথা শুনলাম।

—ডি আই. এসেছেন না কি?

—সদর থেকে এসেছেন শেষ রাত্রে। একাই ড্রাইভ করে আসছিলেন। নতুন কালভার্টটা পার হবার পরই ওই ভৌতিক ব্যাপারের মুখোমুখি হন।

—হুঁ, ঘটনাটা এবার খুলে বলুন তো?

বার্ণবাল যা শুনেছিলেন এবার সবিস্তারে বললেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কয়েকবার ঘন ঘন টান দিলেন ইন্দ্রনাথ।

—স্ট্রেঞ্জ! আপনি বলতে চাইছেন কানেক্টিং রোডের ওধারের মোড়ে অর্থাৎ সুলতানপুরের কাছে যে মেয়েটি খুন হয়েছিল সে-ই এই মোড়ে ভূত হয়ে দেখা দিচ্ছে?

—আমার সে রকমই মনে হচ্ছে স্যার।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, ইচ্ছে হচ্ছে আমিও একবার চাক্ষুষ ব্যাপারটা দেখি। আপনি কি বলেন?

—তাহলে তো ভালোই হয়। তবে যে-কোন রাতে ওপথ দিয়ে গেলেই যে তাকে দেখতে পাবেন এমন তো কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত এর জন্য আপনাকে কয়েক রাত্রি জাগতে হবে।

—প্রয়োজন হলে জাগব। এবার তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারি কিভাবে

তদন্ত আরম্ভ করা যায়। ভালো কথা, ইতিমধ্যে কেউ কি থানায় সংবাদ দিয়েছে যে, তাঁর বউ বা বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না?

—না, এরকম কোন ডায়েরী থানায় হয়নি। আমি সদরেও অনুসন্ধান করেছিলাম, সেখানেও কোন ডায়েরী নেই।

—মৃতা মেয়েটির পরিচয় পাওয়া গেলেও কেসের কিছুটা সুরাহা হত। এনি ওয়ে, এখন যখন মার্ডার কেসের সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারটা মিক্সড্ আপ হয়ে যাচ্ছে তখন ওই প্রসঙ্গ ধরেই আলোচনা এগিয়ে চলুক।

—আমিও তাই বলতে চাই স্যার।

ইন্দ্রনাথ ও বার্ণবালের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকুক। ইতিমধ্যে আমরা মাস দেড়েক আগেকার নারীহত্যা সম্পর্কে কিছু জেনে নিই।

সুলতানপুর রোড দিয়ে খুব ভোরবেলা একটি বাস ফিরছিল শহরের দিকে। বাসে যাত্রী বেশি ছিল না। হঠাৎ ড্রাইভারের দৃষ্টি এক জায়গায় পড়তেই মহাউত্তেজিত হয়ে সে দ্রুত হাতে ব্রেক চেপে ধরল। উত্তেজিত হবারই কথা। কারণ সে দেখতে পেয়েছিল একটি উলঙ্গ দেহ রাস্তা থেকে কয়েক ফিট নীচে গমক্ষেতের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

কয়েকজন যাত্রীও দেখেছিল ওই অভাবনীয় দৃশ্য। তারপর বাসের আর সকলেরই দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। সকলেই হৈ হৈ করতে করতে নেমে পড়ল বাস থেকে। ড্রাইভারও। সকলে কাছে গিয়ে দেখল উলঙ্গ দেহটি নিঃসন্দেহে কোন যুবতীর। নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

যুবতীর সারা দেহে নিটোল যৌবন টলটল করছে। বয়স মনে হয় বছর পঁচিশের মধ্যেই। গায়ের রং ধপধপে সাদা ছিল বোধহয়, এখন হলদেটে হয়ে উঠেছে। যুবতীর মুখ সুশ্রী ছিল কি না বোঝবার উপায় নেই, কারণ ভারী কোন কিছু দিয়ে ওর মুখ সম্পূর্ণ থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে ওঠায় এখন মনে হচ্ছে ময়দার তালের উপর যেন গাঢ় কালচে ছোপ পড়েছে।

এই উলঙ্গ যৌবন যে কোন সংযমী পুরুষকেও মাতাল করে তুলবে। তবে দেহ এখন নিষ্প্রাণ বলেই এক বিচিত্র বিকার শুধু মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠতে পারে। বাসযাত্রীরা ও ড্রাইভার কয়েক মিনিট স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে মৃতদেহের কয়েক হাত দূরে।

প্রথমে কথা বললেন একজন বয়স্ক যাত্রী। অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর মুখের রেখায় রেখায়। বললেন, আমাদের এখুনি পুলিশকে জানানো দরকার।

ড্রাইভার অস্ফুট গলায় বলল, এখানে পুলিশ কোথায়?

—শহরে গিয়ে খবর দিতে হবে। কেউ একজন চলে যাক। বাকী আমরা অপেক্ষা করি।

সামান্য আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল, বাসের ক্লিনার চিঠি নিয়ে সদর কোতোয়ালীতে যাবে। শহর এখান থেকে মাইল চারেক—হেঁটে সে মিনিট পঁয়তাল্লিশের

মধ্যেই পৌঁছতে পারবে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত যাত্রীরা এখানেই অপেক্ষা করবেন এবং সেইমতই বাসের ক্লিনার চিঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ইন্সপেক্টার বার্ণবাল সদলবলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। তখন রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে।

খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে দেহটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ইন্সপেক্টার। খুব ভারী কিছু দিয়ে বার বার আঘাত করে মুখের অবস্থা এমন বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে যে, নাক-চোখ-মুখ কেমন ছিল বোঝবার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছলেই বোধ কবি কোন মানুষ কাউকে এইভাবে হত্যা করতে পারে।

মৃতদেহেব কাছ থেকে সরে এসে ইন্সপেক্টর এধার-ওধার তাকালেন। পাশেই খানিকটা ফালি জমির উপর চাষ করা হয়েছিল। ফসল কেটে নেওয়ায় গাছের গোড়াগুলি সারিবদ্ধভাবে জেগে রয়েছে। চাষের জমির পরই নাম-না-জানা কাঁটা গাছের জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। বড় বড় গাছও রয়েছে এখানে-ওখানে।

বার্ণবাল অবশ্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন যে, হত্যাকাণ্ড এখানে সংঘটিত হয়নি। কাবণ একে খোলা জায়গা, তাছাড়া মাটিতে এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই। সুতরাং অন্য কোথাও কাজ সেরে মৃতদেহ এখানে ফেলে রেখে হত্যাকারী চম্পট দিয়েছে।

হঠাৎ ইন্সপেক্টারের দৃষ্টি এক জায়গায আটকে গেল। দূরে কি একটা পড়ে রয়েছে যেন! চটি না? তিনি দ্রুত পাযে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। ঝুঁকে চটিটা তুলে নিলেন। সুদৃশ্য এবং দামী লেডিজ স্যাণ্ডেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিন্তু দ্বিতীয় পাটিখানার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সরকারী ডাক্তার ইতিমধ্যে এসে পড়লেন। বারকয়েক চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বার্ণবালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—কি রকম দেখলেন ডক্টর?

—পোস্টমর্টেম হবার আগে নিশ্চিত কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়।

—তবুও?—

—মনে হয় চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে।

—তার মানে গতকাল বিকেলে?

—হয়ত। আবার আরো কয়েক ঘণ্টা বেশিও হতে পারে।

—মুখের আঘাতই কি মৃত্যুর কারণ বলে আপনি মনে করছেন?

—গলায় হাল্কা একটা দাগ রয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি? মৃত্যুর কারণ এটাও হতে পারে।

—অর্থাৎ গলা টিপে খুন করা হয়েছে?

ডাক্তার আর কোন কথা বললেন না।

পুলিশ ফটোগ্রাফার ছবি তোলার কাজ শেষ করেছিল। বার্ণবাল চিন্তা করে দেখলেন, এখানকার কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। সুতরাং মৃতদেহ মর্গে চালান করে দেওয়া হল। ইন্সপেক্টার কুড়িয়ে পাওয়া একপাটি চটি হাতে নিয়ে চিন্তার উত্তাল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে জিপে গিয়ে বসলেন।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেল যথাসময়। রিপোর্ট থেকে জানা গেল, গলায় চাপ দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলা হয়েছে প্রথমে, তারপর ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে মুখ। গলায় চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল আঙ্গুলের সাহায্যে। মেয়েটি বিবাহিতা ছিল কি না বুঝতে পারা না গেলেও জানা গেছে তার তিনমাস অন্তঃসত্ত্বার কথা।

মুখের আঘাত সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর ভারী কোন কিছু দিয়ে বারংবার আঘাত করার দরুণ ওই থেঁতলানো অবস্থা এবং ধাতব কোন কিছুর সাহায্যেই এই আঘাত করা হয়েছে।

ইন্সপেক্টার বার্ণবাল নিহত যুবতীব পরিচয় সংগ্রহে উঠে-পড়ে লাগলেন।

শহরে এ ঘটনা কারুর জানতে বাকী নেই। চতুর্দিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে। অনেকে আবার অভ্রান্ত সত্য বলে মন গড়া কাহিনী ছড়াচ্ছে।

ইন্সপেক্টার শহরে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, কারুর স্ত্রী, বোন বা মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে কিনা। সে রকম কোন পরিবার পাওয়া গেল না। সদরে, জেলার অন্যত্র এবং আশপাশের জেলায় অনুসন্ধান চালিয়েও কোন সূত্র হাতে এল না। বহুদূর থেকে কোন মেয়েকে এনে এখানে খুন করা হয়েছে এ বড় কষ্ট-কল্পনা। হত্যাকারী এবং নিহত যুবতী নিশ্চিতভাবে এখানকার। এমন কোন বিশেষ চাতুরি আছে যার জন্য মেয়েটির পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

দুর্ঘটনা-স্থলে যে একপাটি চটি পাওয়া গিয়েছিল সেটি নিয়ে ইন্সপেক্টার শহরের জুতোর দোকানগুলিতে টুঁ মেরেছেন। শেষ পর্যন্ত একটি দোকানে গিয়ে জানা গেছে ওই চটি ওখান থেকেই কেনা হয়েছে। ইন্সপেক্টার উত্তেজনা দমন করে প্রশ্ন করেছেন, ক্রেতা কি আপনার জানাশুনার মধ্যে?

—না।

—নিশ্চয় কোন মহিলা? তিনি দেখতে কেমন?

—দুজন মহিলা এসে দুজোড়া চটি নিয়েছিলেন। সঠিক এখন বলা মুশকিল, তবে যতদূর মনে পড়ছে, দুজনের কেউই দেখতে খারাপ ছিলেন না।

—আচ্ছা, কবে তাঁরা এসেছিলেন বলতে পারেন?

দোকানদার খাতা-পত্র ঘেঁটে বলল, ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে এ-মাসের সাত তারিখে।

—হুঁ। আর কখনও ওই দুই মহিলা আপনার দোকানে এসেছেন?

দোকানদার একটু চিন্তা করে বলল, মাস ছয়েক আগে ওঁদের মধ্যে একজন এসেছিলেন স্যুটকেস কিনতে।

—ওই দুই মহিলা কি হিন্দীভাষী?

—না, বোধহয় বাঙালী। ওঁদের ভাঙা ভাঙা হিন্দী শুনেই আমার এই ধারণা হয়েছে।

ইন্সপেক্টার আর কোন প্রশ্ন না করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর যে একেবারেই লাভ হয়নি তা নয়। গুটিকয়েক বিষয় যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। যেমন, মৃতা মহিলা বাঙালী এবং এই শহরের বাসিন্দা। ছ'মাসের

মধ্যে যখন দু'বার একই দোকান থেকে জিনিস কেনা হয়েছে তখন নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় মহিলাটি স্থানীয়া।

অথচ বিস্ময়ের বিষয় স্থানীয় কোন বাঙালী পরিবার এগিয়ে এসে বলছেন না তাঁদের বাড়ির একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক, ইন্সপেক্টার যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান চালালেন। যত্রতত্র বহু বাঙালীকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা প্রশ্নও করলেন কিন্তু মৃতা মেয়েটির কোন পরিচয় সংগ্রহ করা গেল না। রহস্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

বার্ণবাল বিদায় নেবার পর ইন্দ্রনাথ ভেতরে এসে দেখলেন, মিসেস হাজরা ও রজত তাঁরই অপেক্ষায় চুপচাপ বসে আছে। হাবভাব দেখে মনে হয়, ওঘরের কথাবার্তার সারাংশ দুজনের অজানা নয়।

সিগার ধরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন,—আমাদের কথাবার্তা শুনেছ মনে হচ্ছে?

সুলেখা হেসে বললেন, ঢাক পিটিয়ে পরামর্শ করলে আমরা পাশের ঘর থেকে শুনতে পাবই।

—হাসির কথা নয়। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে এর যে কি সমাধান আমরা করব তাই ভাবছি।

রজত বলল, কাল কলেজে আমিও এরকম একটা কথা শুনছিলাম।

ইন্দ্রনাথ বললেন, ভূতই হোক, আর পেত্নীই হোক, ব্যাপারটা যে সত্যি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সকলের কথা ছেড়ে দিলেও ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের উক্তিকেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে থাকে মাঝে মাঝে। বিভিন্ন দেশের পুলিশ-ফাইলে এই ধরনের বহু ঘটনা নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে. আমি এখন কি ভাবছি জানো—ভাবছি ঘটনাটা একবার নিজের চোখে প্রত্যক্ষ কবব।

—কিন্তু তুমি যে অন্যদের মতো দেখতে পাবেই তার নিশ্চয়তা কোথায়?

—তা অবশ্য নেই। তবে মাঝে-মধ্যে যখন দেখা পাওয়া যাচ্ছে তখন আশা করছি দু' একদিন ঘোরাঘুরি করলে আমিও দেখতে পাব।

রতজ বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব পিসেমশাই।

—বেশ। আজ রাত থেকেই তাহলে আমাদের পরিক্রমা সুরু হোক।

—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

—তুমি! না না সুলেখা, তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না।

—কেন ঠিক হবে না? তুমি ভাবছ আমি ভয় পাব—?

আরো কিছু কথাবার্তার পর স্থির হল তিনজনই যাবেন এবং আজ রাত্রেই। মুখে যা-ই বলুন, প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রনাথ কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেন না, যে মেয়েটি খুন হয়েছে সে আবার কিভাবে দেখা দিতে পারে! তাই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নিতে চান।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ নিজের পার্টি নিয়ে তিন রাত্রি মালিচক ও ঝাঁঝার মধ্যে ঘোরাফেরা

করেছেন কিন্তু যাকে দেখতে চান তার সাক্ষাৎ মেলেনি। এইভাবে রাত জাগার ফলে তিনজনের শরীর কিঞ্চিৎ ভেঙেও পড়েছে। শেষ পর্যন্ত, ইন্দ্রনাথ স্থির করেছেন, আজ শেষবারের মতো পরিক্রমায় নামবেন, অভীষ্ট লাভ হয় ভালো, নইলে এখানেই ইতি।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে একটা বড় ফ্লাস্কে কানায় কানায় চা ভরে নিয়ে ওঁরা রওনা হলেন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটার সময়।

আজ আকাশে চাঁদ নেই। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে ইন্দ্রনাথ গাড়িকে পঞ্চাশ মাইল বেগে চালিত করলেন। নির্জন রাস্তার দু' পাশের বড় বড় গাছগুলি হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠছে—এ ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। হেডলাইটের আলো অন্ধকারকে অবিরাম চিরে চিরে এক সময় ঝাঁঝার এসে উপস্থিত হল গাড়ি।

তারপর ঘণ্টা দেড়েক এদিক-সেদিক করে, কাটাবার পর আবার ফেরতা পথের যাত্রা আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে কলকাতাগামী একটি এক্সপ্রেস ঝাঁঝা ছুঁয়ে গেছে। মালিচকের কোন যাত্রী না থাকায় ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা নিজের নিজের সিটে বসে ঝিমোচ্ছে পরের ট্রেনের আশায়।

ইন্দ্রনাথ এবার মন্থর গতিতেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইন্দ্রনাথ স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে রয়েছেন। পিছনের সিটে বসা সুলেখা ও রজতের মধ্যে খাপছাড়াভাবে কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি এক জায়গায় আটকে গেল।

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর শেষপ্রান্তে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ি আরো কয়েক গজ এগুবার পরই পরিষ্কার দেখা গেল মেয়েটিকে। ইন্দ্রনাথ কেমন শিহরণ অনুভব করলেন। শরীরের মধ্যে রক্ত যেন অত্যন্ত দ্রুত চলাচল করতে আরম্ভ করেছে।

ইন্দ্রনাথ চাপা গলায় বললেন, তোমরা সামনের দিকে তাকাও।

ইন্দ্রনাথের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা ও রজতের বিস্ফারিত দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হল। গাড়ি আরো কাছে চলে এসেছে। মেয়েটির শাড়ির রঙ পর্যন্ত বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওর গায়ের ফরসা রং, ধারালো মুখ, সবই পরিষ্কারভাবে চোখে ধরা দিয়েছে।

রাস্তার ধার থেকে মেয়েটি এবার প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এক হাত তুলে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করছে। ইন্দ্রনাথ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এসেছিল। পিছন থেকে আর্তকণ্ঠে সুলেখা বলে উঠলেন, গাড়ি থামিও না—গাড়ি থামিও না—

সুলেখার কথায় ইন্দ্রনাথের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কেটে গেল। উনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে সত্তর মাইল বেগে গাড়ি ধাবিত করলেন। ব্রেক কষলেন এসে মালিচকের সদর বাজারে। বাজারে তখন জনপ্রাণী নেই। এমন কি বিটের কনস্টেবলকেও দেখা যাচ্ছে না। ইন্দ্রনাথ বললেন, কাজটা কিন্তু ভালো হল না। যার দেখা পাওয়ার জন্য এত ঘোরাঘুরি করছি তার দেখা পেয়েও ভয়ে পালিয়ে এলাম আমরা।

সুলেখা বিড়বিড় করে ইষ্টনাম জপ করছিলেন বোধহয়, এবার ঝাঁজালো গলায় বললেন, ওখানে গাড়ি থামিয়ে তোমার কি লাভটা হত শুনি? দেখতে চেয়েছিলে—দেখা পেলে, আবার কি চাও?

রজত বলল, দু'চারটে কথা আমরা বলতে পারতাম পিসিমা। উনি কেন দেখা দিচ্ছেন, তার উত্তরটা পাওয়া যেত।

আর উত্তর পেয়ে কাজ নেই। অপদেবতাদের সঙ্গে গলাগল্পি করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গাড়িতে স্টার্ট দাও।

সুলেখা যে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন বুঝতে পারলেন ইন্দ্রনাথ, আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়ি এগিয়ে চলল বাংলোর দিকে।

প্রসঙ্গটি চাপা থাকল না, শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল স্বয়ং ডি. এস. পি. সাহেব সপরিবারে সেই মেয়েটিকে দেখেছেন। রাত্রের দিকে কেউ আর ঝাঁঝার দিকে পা বাড়াতে সাহস করে না। সমস্ত শহর কেমন থমথম করছে।

এদিকে ইন্সপেক্টার বার্ণবাল পুর্ণোদ্যমে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন হত্যারহস্য ফিকে করবার জন্য। সেই পোড়োবাড়ি, যেখানে মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—তার উপর পাহারা বসানো হয়েছে। রাত্রে অবশ্য কেউ ওখানে থাকতে চায় না, পাহারা থাকে দিনে। বার্ণবাল জানেন এই কেসের উপর সাফল্যজনকভাবে যবনিকা ফেলতে না পারলে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু কি করবেন, অবিরাম চেষ্টা করেও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

ইন্দ্রনাথের সেই নৈশ অ্যাডভেঞ্চারের পর তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা। 'রেটিনা'য় অনেকেই একত্রিত হয়েছেন। শীতের সন্ধ্যা গাঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাই প্রতিদিন এই সময় 'রেটিনা'য় আড্ডা বসে। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, গত কয়েকদিন ধরে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা নিয়েই আলোচনা কেন্দ্রীভূত আছে।

দেবু চ্যাটার্জী আজ রজতকে আড্ডায় টেনে এনেছেন। রজত তার সেদিনের অভিজ্ঞতার কথাই বলছিল।

দেবু চ্যাটার্জী বললেন, প্রকৃত ঘটনাকে চেপে মানুষ ক্রমেই রং চড়িয়ে বলতে আরম্ভ করেছে। কাল তো একজন বলে বসল, সে না কি মাঝরাতে রিক্‌শায় আসছিল। এমন সময় মেয়েটি এসে বলল, রিক্‌শা চড়ে সেও শহরে যাবে। গুল দেবার বহরটা একবার দেখ!

নির্মল বলল, যে যাই বলুক, আমার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে কিন্তু এতটুকুও অতিরঞ্জিত কিছু নেই।

দেবু চ্যাটার্জী বললেন, এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তো মনে হয় শহরের প্রত্যেকেই মেয়েটিকে দেখেছে। অরুণ তুমি দেখেছ না কি?

অরুণ সরকার এক পাশে চুপ করে বসেছিল। এমনিতেই সে একটু কম কথা

বলে, তবে তার সুচিন্তিত অভিমত অনেক সময় কাজে লেগেছে এমন নজীর আছে। সে বলল, আমি কিভাবে দেখব বলুন? আমার তো আর গাড়ি নেই। যাদের গাড়ি আছে বা রাতে-বেরাতে যারা ট্যাক্সিতে যাতায়াত করে তারাই দেখেছে।

এই সময় রেডিও ইঞ্জিনিয়ার অশোক লাহিড়ী এসে উপস্থিত হল। যে সমস্ত রেডিওর আশা মানুষ ছেড়ে দেয়, সেগুলি লাহিড়ীর হাতে পড়লে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও রসিক হিসেবে তার খ্যাতি আছে।

লাহিড়ী ঘরে প্রবেশ করেই বলল, সেই ভূতনীকে নিয়ে কথা হচ্ছে বোধহয়। প্রাণ তো ওষ্ঠাগত, যেখানে যাচ্ছি এই এক আলোচনা।

রজত বলল, একনাগাড়ে যে একঘেয়েমি চলছিল তার উপর প্রচণ্ড রকমের নতুনত্ব এসেছে, লোককে প্রাণ খুলে আলোচনা করতে দিন না।

দেবব্রত বললেন, কিন্তু কত দিন?

লাহিড়ী নির্লিপ্ত গলায় বলল, রোজা ডাকিয়ে ভূত তাড়াবেন যদি ভেবে থাকেন, তাহলে বলব, ওতে কাজ হবে না। মেয়েটির রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভয় দেখানো বন্ধ হতে পারে শুধু একটি উপায়ে—তা হল প্রেম।

প্রেম! সকলেই অবাক।

—হ্যাঁ প্রেম। শুনেছি ওই পেত্নীটি না কি সুন্দরী এবং অল্পবয়সী। ধরুন, প্রেম প্রেম খেলায় তাকে যদি মাতিয়ে তোলা যায়। তারপর ধরুন . যাক, এত উপমায় কাজ নেই। মোদ্দা কথা, এখন স্থির করতে হবে আমাদের মধ্যে কে বুকভরা প্রেম নিয়ে তার কাছে যাবে।

নির্মল বলল, লাহিড়ী, ইয়ার্কিরও একটা সীমা আছে। গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গটাকে তুমি লাইট করে দিচ্ছ।

—এই দেখ, তুমি চটে উঠলে! আমি শুধু তোমাদের সমাধানের একটা রাস্তা দেখাচ্ছিলাম।

দেবব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, চলি। আমাকে এখুনি একবার ঝাঁঝা যেতে হবে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, ঝাঁঝা—

—কি করব বল। দশটার ট্রেনে আমাদের একজন কর্তাব্যক্তি আসছেন। তাঁকে রিসিভ করতে আমাকেই যেতে হবে—অফিসের নির্দেশ।

রজত বলল, এই রাত্রে—

—সেটাই তো ভয়ের কথা। তবে ভরসাও আছে, আজ পর্যন্ত লোকে পেত্নী দর্শন করেছে মাঝরাত্রে। আমি এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসছি।

লাহিড়ী বলল, ধরুন ট্রেন ঘণ্টা তিনেক লেট হল—তখন কি করবেন?

—যদি সে রকম কিছু ঘটে তাহলে রাতটুকু ঝাঁঝা স্টেশনেই কাটিয়ে দেব।

দেবব্রত দ্রুতপায়ে 'রেটিনা' থেকে বেরিয়ে এসে স্কুটারে চেপে বসলেন, মাঝপথ থেকে চুনীলালকে তুলে নিতে হবে। চুনীলাল তাঁর অধীনস্থ এজেন্ট। তাকে বলা আছে, সে নিশ্চয় তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে। ভৌতিক উপদ্রব না হলেও রাতে এতটা পথ একা যেতেন না দেবব্রত।

চুণীলাল পাঠক অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ লোক। সে পূর্ব কথামত দাঁড়িয়েছিল পোস্ট অফিসের সামনে। চুণীলালকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে দেবব্রত যখন ঝাঁঝাব পথ ধরলেন তখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে ন'টা। শহর পেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কনকনে হাওয়া তাদের অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল।

চুণীলাল বলল, শীতটা পড়েছে জবর।

দেবব্রত বললেন, হ্যাঁ, ঠাণ্ডা হাওয়া যেন তীরেব মতো এসে গায়ে বিঁধছে।

—রাস্তায় একটা আলো পর্যন্ত নেই লক্ষ্য করছেন?

—সেকেলে ব্যবস্থাটা এখনও চালু রয়েছে। চাঁদ উঠুক বা না উঠুক শুক্লপক্ষ হলেই ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই রাস্তায় আলো জ্বালবে না।

স্কুটার এগিয়ে চলেছে। দেওয়া মোড় অর্থাৎ যেখানে মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়—সে জায়গা এখনও কিছুটা দূরে। স্কুটার আরো মিনিট পাঁচেক এগুবাব পর, দেবব্রত গজ পঞ্চাশেক দূরে মশালের মতো কি জ্বলতে দেখলেন। দেবব্রত বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

চুণীলালও দেখতে পেয়েছিল। বিস্মিত গলায় সে বলল, আগুন জ্বালল কে ওখানে?

ঘটনাস্থলেব দূরত্ব আরো কিছুটা কমে এসেছে। স্পষ্ট দুজন লোককে দেখা যাচ্ছে। উত্তেজনায় চুণীলালের গলা কেঁপে গেল, ওরা মশাল নিয়ে কি করছে ওখানে?

—তাই তো! বিস্ময়ের শেষ ধাপে এসে পৌঁছালেন দেবব্রত।

স্কুটারের শব্দ কানে পৌঁছনোর জন্য কি না কে জানে, ঠিক এই সময় লোকদুটি মশাল ফেলে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মশালের তিন চার হাতের মধ্যে এসে পড়ল স্কুটার। রাস্তার ঠিক উপরে নয়, পাশের ঢালু অংশে মশাল দুটি পড়ে আছে। কিন্তু ও কি—মশালের লাল্‌চে আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে ওখানে!

চুণীলাল প্রায় চিৎকার করে উঠল, দেখুন দেখুন, একটা লোক পড়ে রয়েছে। দেবব্রতর মনে হল, এই গোলমেলে পরিস্থিতিতে নাক না গলিয়ে ঝাঁঝাব দিকেই ধাওয়া করেন। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের মনকে কড়া শাসনে বাঁধলেন। একজন মানুষ এখানে পড়ে রয়েছে—তাকে সাহায্য দেবার চেষ্টা না করে এখান থেকে চলে যাওয়াটা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়।

দেবব্রত স্কুটার থামালেন।

তেজ কমে গেলেও তখনও মশাল যেভাবে জ্বলছিল তাতে বৃত্তাকারে দশ বারো হাত জায়গা ভালোভাবেই আলোকিত। চুণীলাল ও দেবব্রত একই সঙ্গে এগুলেন দেহটির দিকে। কয়েক পা এগুবার পর তারা দেখতে পেলেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা লোকটি অসুস্থ বা আহত নয়, নিষ্ঠুরভাবে নিহত। কোন অস্ত্র অবশ্য শরীরে বিঁধে নেই, তবে ঘাড়ের একটু নীচে থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরিয়েছে তা লক্ষ্য করেই বলা যেতে পারে শরীরে প্রাণ না থাকাই স্বাভাবিক।

সাদা জারকিন্সে শরীর ঢাকা থাকায় ক্ষত ঠিক কোন্ জায়গায় হয়েছে বুঝতে পারা যায় না, অবশ্য রক্ত এখন আর গড়িয়ে পড়ছে না। গাঢ় আকার নিয়েছে। অর্থাৎ এই নিষ্ঠুর হত্যা সাধিত হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

প্রায় দু'মিনিট একই জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেবব্রত।

চুণীলালের অবস্থাও ওই একই রকম. ঠাণ্ডাতে দুজনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

দেবব্রত বললেন, সাজ-পোশাক দেখে শহুরে মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

চুণীলাল এধার-ওধার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয় কিছুক্ষণ আগে যে লোক দুটো পালিয়ে গেল একাজ তাদেরই?

চিন্তিত গলায় দেবব্রত বললেন, হতে পাবে। কিন্তু আমাদের এখন আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। পুলিশে খবব দেওয়া দরকার। তুমি ডেড-বডি পাহারা দাও। আমি শহরে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।

চুণীলাল প্রায় লাফিয়ে উঠল, আমি এখানে একলা মড়া পাহারা দেব? আমায় কেটে ফেললেও পারব না।

—আমি থাকতে পারি, কিন্তু তুমি তো আবাব স্কুটার চালাতে পার না।

এদিকে আবার মশালের আলো নিস্তেজ হয়ে আসছে। এই সমস্ত জায়গাতেই অন্ধকারকে বড় বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত চুণীলালই সমস্যা সমাধানের পথ দেখাল। বলল, কিছু দূর এগুলেই তো ট্যাক্সির টোল অফিস। ওখানে গিয়ে পুলিশকে ফোনে খবর দিয়ে আমরা তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি।

স্কুটারে স্টার্ট দিতে দিতে দেবব্রত বললেন, সেই ভালো। চল, টোল অফিসেই যাওয়া যাক।

ওরা দুজনে টোল অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। জনাপাঁচেক লোক গোল হয়ে বসে, নীচু গলায় গল্প করতে করতে বড়সিতে হাত সেঁকছিল। তাদের রক্তাক্ত পরিস্থিতির কথা জানিয়ে ফোন করার অনুমতি চাওয়া হল। খুনের কথা শুনে তারা প্রথমে অবাক তারপর ভীত হয়ে পড়ল। দেবব্রত ফোন করলেন সদর কোতোয়ালীতে। কথাবার্তা হল ইন্সপেক্টার বার্ণবালের সঙ্গে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ইন্সপেক্টার সদলবলে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে গোটাকয়েক পেট্রোম্যাক্স আনতে ভোলেননি।

দেবব্রত নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন এবং ঐ সঙ্গে জানালেন তাঁদের স্টেশনে যাবার প্রয়োজনীয়তার কথা।

ইন্সপেক্টার দেবব্রতকে ভালোভাবেই চিনতেন। এ লোক সন্দেহজনক কিছু যদি করেও থাকে তাহলে পালাতে যে পারবে না তা তাঁর জানা। সুতরাং অনুমতি মিলল। দেবব্রত ও চুণীলাল চলে যাবার পর তিনি মৃতদেহ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। অবশ্য তার আগে দেবব্রত সনাক্ত করল মৃতব্যক্তিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা দেহটি সোজা করে দেবার পরই তার মুখ দেখে দেবব্রত চিনতে পারলেন মৃণালকে।

মালিচকের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উমেশ ধরের ভাগনে মৃণাল। বছর দুয়েক আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েও বেকার বসেছিল। বিশ্ববখাটে হিসাবে তার দুর্নাম ছিল। ভাগনের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ উমেশ ধরকে বিব্রত করে তুলেছিল ইদানীং।

একটি বিষয় প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইন্সপেক্টারের—ঘড়ি বা আংটি কিছুই

নেই নিহতের হাতে। অথচ ছিল যে তার প্রমাণ রিস্টে ও আঙুলে ঘড়ি ও আংটির দাগ রয়েছে। পকেটে কোন কাগজপত্র বা টাকাকড়িও পাওয়া গেল না। ঘড়ি, আংটি এবং পকেটে যা কিছু ছিল সমস্তই অপহৃত হয়েছে।

আরো একটি বিষয় দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। খুন এখানে হয়নি। খুন এখানে হলে ঘাস জমির উপর ছাপকা-ছাপকা রক্তের দাগ এবং ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেরকম কিছুই নেই।

মৃতদেহ ঘুরিয়ে শোয়ানোর আগেই ছবি তোলা হয়েছিল। আরো কয়েকটি স্ন্যাপ নেবার পর বডি পোস্টমর্টেমের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

জনাকয়েক কনস্টেবলকে ওখানে পাহারায় রেখে ইন্সপেক্টার বাকী সকলকে সঙ্গে নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

উমেশ ধরকে সংবাদ পাঠাতে তিনি এসে ভাগনের মৃতদেহ সনাক্ত করলেন। তিনি যে শোকে অধীর হয়েছেন সে রকম কিছু মনে হল না, বরং মনে হল ভাগনের মৃত্যুতে স্বস্তি বোধ করেছেন।

ইন্সপেক্টারের প্রশ্নের উত্তরে উমেশ ধর যা বললেন, তার সারমর্ম হল, যখন মৃণালের বয়স পাঁচ বছর তখন এক দুর্ঘটনায় তার বাবা ও মা একই সঙ্গে মারা যান। সেই থেকেই সে তাঁর কাছেই আছে। লেখাপড়ায় সে মন্দ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে সফলকাম হননি।

শেষে তিনি স্থির করেন তাকে নিজের ব্যবসায় ঢুকিয়ে নেবেন। কিন্তু মৃণালের গোঁয়ার্তুমির জন্য তাও সম্ভব হয়নি।

উমেশ ইদানীং জানতে পেরেছিলেন, মৃণাল শহরের বাজে লোকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। ভাঙের নেশাও না কি ধরেছে। একগুঁয়ে বয়স্ক ভাগনেকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা জেনেই কিছু আর বলেননি।

গতকাল ছুটির দিন গেছে। সুতরাং উমেশ অধিকাংশ সময় বাড়িতেই ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা বারোটা আন্দাজ মৃণাল বাড়ির গাড়ি নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। রাত দশটা পর্যন্তও তাকে ফিরতে না দেখে উমেশ ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় আরো আধঘণ্টা পরে।

উমেশের এক কর্মচারী রাজেন্দ্র রোড দিয়ে ফেরার সময় দেখতে পায় চালকহীন অবস্থায় গাড়িখানা দাঁড় করানো রয়েছে। বিস্মিত কর্মচারী তখনই তাঁকে খবর দেয়। তারপর তিনি নিজে গিয়েই গাড়িখানা নিয়ে আসেন বাড়িতে। মৃণালের পাত্তা আর পাননি। ইন্সপেক্টারের মুখ থেকেই তিনি প্রথম শুনলেন যে, সে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে।

বার্ণবাল এক মনে শুনে যাচ্ছিলেন। উমেশ ধর থামতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, মৃণালের কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সন্ধান দিতে পারেন?

একটু চিন্তা করে নিয়ে উমেশ বললেন, ঘনিষ্ঠ কি না জানি না তবে তপনের কাছে তার খুব যাতায়াত ছিল।

—পুরো নাম কি ছেলেটির?

—তপন রায়। কলেজ বোডে থাকে।

—আচ্ছা, আপনি দেবব্রত চ্যাটার্জীকে চেনেন?

—চিনি।

—তার সঙ্গে আপনার ভাগনের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

—কি করে বলব বলুন। আমি তো ভাগনের পিছু ঘুরতাম না। তবে আমার সঙ্গে দিন কুড়িক আগে ওঁর বচসা হয়েছিল।

—কি নিয়ে বচসা হয়েছিল বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?

—কাঠা পাঁচেক জমি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। নেহরু এভিনিউ-এর ওই জমিটা আমরা দুজনেই কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমির মালিক মত পাল্টে ফেলায় আমরা কেউই কিনতে পারিনি।

—আচ্ছা এই খুনের ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

—আমি এ সম্পর্কে কোন মতামত দিতে চাই না। খুনীকে ধরার দায়িত্ব তো আপনাদের। এই বলে বিদায় নিলেন উমেশ ধর।

ভোরের আলো ফুটে ওঠাব পবই ইন্সপেক্টার দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তাব এক পাশে রাস্তা আর অন্য পাশে কিছু ঝোপঝাড় ও বড় বড় গাছের সাবি।

ইন্সপেক্টার ঝোপের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগুলেন। খুব বেশি দূর যেতে হল না, ঝাঁকড়া একটা তেঁতুল গাছের তলায় এসে তাঁর গতিরোধ হল।

এখানে-ওখানে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। এমন কি তেঁতুল গাছের গুঁড়িতেও দাগ। বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই জায়গাতেই খুন হয়েছে মৃণাল। তারপর মৃতদেহ রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে।

অনেকক্ষণ ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ইন্সপেক্টার। তাঁর মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ওঠা-নামা করতে লাগল। প্রধান প্রশ্ন হল, মৃণাল এই নির্জন অঞ্চলে হত্যাকারীর সঙ্গে এসে নিজের মৃত্যুকে সহজ করে তুলল কেন? অবশ্য এই সূত্রে দুটি বিষয় বুঝে নেওয়া যায়। এক, হত্যাকারীর সঙ্গে মৃণালের মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুই, উমেশ ধরের মোটরেই এখানে এসেছিল দুজনে। হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার পর হত্যাকারী নির্জন রাজেন্দ্র রোডে গাড়িখানাকে ফেলে চম্পট দেয়।

ইন্সপেক্টার আরো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন। কিন্তু নতুন কোন সূত্র দৃষ্টিগোচর হল না। চিন্তিত বার্ণবাল শহরের দিকে যাত্রা করলেন।

মৃণালের হত্যাকাণ্ড শহরের জীবনযাত্রাকে বেশ ভালো মতোই নাড়া দিয়েছে। প্রথমে মৃতা তরুণীর পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ও পরে এই নিষ্ঠুর হত্যা শহরে মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই। অনেকে বলাবলি করছে, সেই অজ্ঞাত পরিচয় তরুণী যেমন খুন হবার পরও দেখা দিচ্ছে তেমনি মৃণালকেও দেখা যাবে ওই রাস্তায় রাতে-বেরাতে।

'রেটিনা'র সান্ধ্য আসরে ওই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল নির্মল, অরুণ সরকার, রজত আর লাহিড়ীর মধ্যে।

এমন সময় দেবব্রত ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে। জামাকাপড়ে পারিপাট্যের অভাব লক্ষণীয়। তিনি ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়ে এক টিপ নস্যি নিলেন।

—কি হয়েছে দেবুদা? নির্মল প্রশ্ন করল। দেবব্রত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হয়েছে। মৃণালের খুনের ব্যাপারে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, সে কি!

—দুর্ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছনোটাই আমার পক্ষে কাল হয়েছে। গত তিনদিনে পুলিশ আমাকে পাঁচবার জেরা করেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

রজত বলল, এখন কি করবেন ভাবছেন?

—আমার আর কি করার আছে বল? আত্মপক্ষ সমর্থনে যতদূর সম্ভব সত্যি কথাই বলেছি। ডি. এস. পি. সাহেব মানে তোমার পিসেমশাই—তিনিও আমার কথা বিশ্বাস করছেন না বলেই মনে হল।

নির্মল বলল, ভাগ্যের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। অ্যারেস্ট হবার আগেই ডিফেন্সের একটা ব্যবস্থা করুন।

—কি ব্যবস্থা করব বল?

অরুণ বলল, লাহিড়ীমশাই বলছিলেন, এই কেসের তদন্তে আমরাই নেমে পড়ি। মন্দ হয় না। এতে দেবুদাকে মোটামুটি ডিফেন্স দেওয়া হবে।

এই কথায় বিলক্ষণ চলে উঠল লাহিড়ী। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি কি বলতে চেয়েছিলাম তা যদি বুঝতে পারতেন তাহলে বিদ্রূপ করতেন না। কেসটার সম্পর্কে ইণ্টারেস্ট নেওয়ার অর্থে আমি এই বোঝাতে চাইনি যে, আমরাই খুঁজে-পেতে হত্যাকারীকে বার করব, আমি বলতে চাইছিলাম যে, এই থমথমে অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাসব বাবুকে ডাকা উচিত।

নির্মল বলল, আপনি কি গোয়েন্দা বাসব ব্যানার্জীর কথা বলছেন?

লাহিড়ীর মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। বললেন, হ্যাঁ, আমি খবর পেয়েছি সম্প্রতি উনি মধুপুরে এসেছেন অবসর কাটাতে। এখান থেকে মধুপুর বেশি দূর নয়। আমরা সহজেই তাঁকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারি।

দেবব্রত বললেন, অ্যাপয়েণ্ট তো সহজেই করা যায়। কিন্তু তাঁর ফি? টাকার ব্যবস্থা হবে কিভাবে?

রজত বলল, কেন আমরা চাঁদা করে টাকাটা দিতে পারি।

—অনেক জটিল কেস তিনি সহজে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁর বাজার-দর এখন অনেক। আমরা ক'জন চাঁদা দিয়ে তাঁর দাবী মেটাতে পারব না। তবে তাঁকে আমরা অনুরোধ করতে পারি। আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি টাকার অঙ্কটা কমাতেও পারেন। তাছাড়া এমন বিচিত্র কেস হাতে পাওয়ার লোভ তাঁকে পেয়ে বসতে পরে।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করে স্থির হল, বাসবকে যে-কোন রকমে এখানে আনতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেবব্রত যাবেন, সঙ্গে থাকবে লাহিড়ী। প্রাথমিক খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা মেটাবার জন্য প্রত্যেককে কত করে দিতে হবে তাও স্থির হয়ে গেল।

বাসব মধুপুরে এসেছিল অবসর কাটাতে। একনাগাড়ে কাজ করে যেতে থাকায় মন বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তার, শৈবালের পরামর্শে দিন দশেক আগে তাই এসেছে মধুপুরে। বাড়িখানাও পাওয়া গেছে বেশ নিরিবিলি অঞ্চলে। বাহাদুরের হাতে রান্না খেয়ে, ঘুমিয়ে আর রাজনৈতিক আলোচনা করে দুজনের সময় কাটছে। সেদিন সকালে দুজনে বসে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করল।

—দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, সাব্।

—পাঠিয়ে দাও। বাসব বলল, কারা আবার দেখা করতে এল, ডাক্তার? মক্কেলরা এখানেও ধাওয়া করল না কি?

—ক্ষতি কি। আমি জানি তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। মুখে যাই বল, হাতে এখন মক্কেল পেলে তুমিও বর্তে যাবে।

দেবব্রত এই সময় লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর দুজনে নিজেদের পরিচয় দিলেন, তারপর কি উদ্দেশ্যে আসছেন কুণ্ঠিতভাবে সেকথাও জানালেন।

বাসব মিনিট কয়েক চুপচাপ রইল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার। তারপর বলল, দেখুন এখানে আমি এসেছি বিশ্রাম নেবার জন্যই। তবে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে যে উঠিনি তাও নয়। বেশ, কেসটা হাতে নিলাম। ঘটনাটা এবার আমায় খুলে বলুন—

দেবব্রতর মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠল। তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি বেশ গুছিয়েই বললেন।

সব শুনে শৈবাল বলল, খুব ইণ্টারেস্টিং কেস।

—শুধু ইণ্টারেস্টিং নয় ডাক্তার, জটিলও, মিঃ চ্যাটার্জী, বেসরকারী তদন্তের জন্য আপনি পুলিশের অনুমতি নিয়ে রাখবেন। আমরা কাল রওয়ানা হব। আর কোন হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই ভালো হয়।

সম্মতি জানিয়ে এবার আসল কথা পাড়ল লাহিড়ী, আপনি কেসটা টেকআপ করলেন এর চেয়ে শুভ আর কিছু হতে পারে না। তবুও সসংকোচে একটা কথা বলতে হচ্ছে—আপনার সম্মান-মূল্য দেবার সাধ্য আমাদের নেই। তবে যতদূর সম্ভব—

বাসব মৃদু হেসে বলল, সব সময় যে টাকা নিয়েই আমি তদন্ত করি এমন কোন কথা নেই। কেস আকর্ষণীয় হলে টাকাটা বড় কথা নয়। ঠিক আছে, পেমেণ্টের জন্য আপনারা ব্যস্ত হবেন না।

দেবব্রত ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমরা এখন তাহলে উঠলাম, এখন স্টেশনে যেতে পারলে সাড়ে তিনটের ট্রেনটা ধরতে পারব।

দেবব্রত ও লাহিড়ী বিদায় নেবার পর বাসব উত্তরের খোলা জানলার বাইরে মিনিট দুয়েক দৃষ্টি প্রসারিত করে রাখল, তারপর শৈবালের দিকে ফিরে বলল, সব কিছুই তো শুনলে। কেসটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ডাক্তার?

সে কথার উত্তর না দিয়ে শৈবাল বলল, ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা ও হত্যাকাণ্ড. এই দুই ঘটনা কি একই সূত্রে গাঁথা বলে তুমি মনে কর?

—এই মুহূর্তে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে একথাও নিশ্চয় তোমার অজানা নয় যে, ভূতের অস্তিত্বে আমার আস্থা নেই।

বিস্মিত শৈবাল বলল, তুমি বলতে চাইছ ওটা কোন ভৌতিক ব্যাপারই নয়, কারুর কারসাজি?

—আমি এখন কিছুই বলতে চাইছি না। তবে কারুর পক্ষে নিহত মেয়েটিকে মূলধন করে মানুষকে ভয় দেখানোটা খুবই কি শক্ত?

—তুমি যা বললে তাতে কিন্তু দুটো প্রশ্ন মাথা চাড়া দিচ্ছে। এক, ওই নির্জন অঞ্চলে গভীর রাতে কোন মেয়ের পক্ষে ভূত সেজে ভয় দেখানো সম্ভব কি? দুই, দিনের পর দিন মানুষকে ভয় দেখিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে?

—দেখ, যদি প্রকৃতই অপ্রাকৃত কোন ব্যাপার না হয় তাহলে কোন মেয়ের পক্ষে একা ওখানে যাওয়া সত্যিই সম্ভব নয়, তার সঙ্গী-সাথীরা নিশ্চয় ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে করে না। হয়ত অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথাতেই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। গোড়া চেপে ধরতে পারলেই পিছনকার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়বে। যাক, এখন ও কথা থাক ডাক্তার। আকাশে কেল্লা বানিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে চল, শালবনের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

•

বাসব নির্দিষ্ট সময়েই শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে মালিচকে পৌঁছাল। দেবব্রত নটরাজ হোটেলে ঘর বুক করে রেখেছিলেন। ছোট শহরের হোটেলগুলি যেমন ছন্নছাড়া অবস্থায় থাকে এটি কিন্তু সেরকম নয়। ঘরের আসবাবপত্র ভালো। চারিধার বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে থানায় যাবে স্থির করেছিল বাসব।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাইনিং রুমে আলাপ হল হোটেলের মালিক কাম-ম্যানেজার প্রিয় নাগের সঙ্গে। বাসব কে এবং কি কাজে এখানে এসেছে, বুঝতে পারা গেল তাও তিনি জানেন।

বাসব বলল, ছোট শহরে এমন ভালো হোটেলের সন্ধান পাব ভাবিনি। আপনি ধন্যবাদের পাত্র মিঃ নাগ।

প্রিয় নাগ বিগলিত হাস্যে বললেন, সামর্থ্য অনুসারে নটরাজকে ভালোভাবেই চালাবার চেষ্টা করছি। তবে আপনাদের মতো বোর্ডার আমি কালেভদ্রেই পেয়ে থাকি।

—কলকাতা থেকে লোক আসেন না এখানে?

—আসেন। সিজন টাইমে পাটনা থেকেও এখানে অনেকে আসেন।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল, আপনি নিশ্চয় শহরের অনেককে চেনেন?

—গণ্যমান্য সকলকেই চিনি। 'বার' আছে তো। চোখের উপর দিয়ে এবং চোখ বাঁচিয়ে প্রায় সকলেই এখানে আসেন।

—মৃণাল বলে যে ছেলেটি এখানে খুন হয়েছে তাকে চিনতেন?

চোখ বড় বড় করে প্রিয় নাগ বললেন, তাকে চিনব না? শহরের সে একজন হিরো ছিল। আমার এখানেও আসত মাঝে মাঝে।

—কি সূত্রে আসত?

—মানে এই—লক্ষ্য করেছেন বোধহয় অ্যাটাচ্‌ড্ রেস্টুরেণ্ট আছে। ওই রেস্টুরেণ্টেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসত আর কি!

শৈবালের মনে হল প্রিয় নাগ কিছু একটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। বাসবের মুখে কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। ও বলল, আমাদের একটু তাড়া আছে। বেরুতে হবে। পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবে মিঃ নাগ। এস ডাক্তার—

রাস্তায় নেমে ওরা রিক্‌শায় চেপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে থানায় এসে হাজির হল। ইন্সপেক্টার থানাতেই ছিলেন। বাসব নিজের পরিচয় দিতেই তিনি ওদের বসালেন।

বার্ণবালের জানাই ছিল বাসব আজ আসবে। তিনি ওর আগমনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, আবার উপেক্ষা যে দেখাবেন তাও সম্ভব নয়। শুধু তাঁর অত্যুগ্র কৌতূহল রয়েছে। এত চেষ্টা করেও যে তদন্তে পুলিশ কূল খুঁজে পাচ্ছে না—সেখানে একজন বাইরের লোক সমাধানের কূলে পৌঁছাবে কিভাবে।

বার্ণবালের ভাব-ভঙ্গী দেখে এবং মাপা মাপা কথাবার্তা শুনে বাসব অবশ্য তাঁর মনোভাব মোটামুটি আন্দাজ করে নিল। তাই বলল, প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, আমার মক্কেলের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আমায় করতে হবে এবং সময় সময় সবকারী সহযোগিতার জন্য আপনার দ্বারস্থও হব।

—তা তো বটেই। বার্ণবাল বললেন, তবে আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না—দেবব্রতবাবু হঠাৎ আপনাকে ডেকে আনলেন কেন?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মানুষ ভয় পেয়ে গেলে এসব ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজই করে থাকে।

থেমে থেমে বার্ণবাল বললেন, ভেতরের কথা আমরা বাইরের কাউকে বলি না। তবে আপনাকে অবশ্য বলা চলে। ওঁর ওই সময় দুর্ঘটনা-স্থলে উপস্থিতিটা সন্দেহজনক। তাছাড়া ওঁর হাব-ভাব চাল-চলনও একটু কেমন ধরনের।

—কিন্তু ইন্সপেক্টার, এই ঘটনার সঙ্গে উনি জড়িত থাকলে পুলিশকে উপযাচক হয়ে সংবাদ দেবেন কেন। উনি যে ট্রেন অ্যাটেণ্ড করতে যাচ্ছিলেন তার তো সরকারী প্রমাণ রয়েছে। এরপরও আসছে মোটিভের কথা। আপনি কি দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে কোন জোরালো মোটিভ সংগ্রহ করতে পেরেছেন?

—মৃণালের মামার সঙ্গে দেবব্রতবাবুর জমি নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। আপনি নিশ্চয় জানেন, সামান্য ঘটনাও অনেক সময় মানুষকে হত্যাকারী করে তুলতে সাহায্য করে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এ সমস্ত আলোচনা এখন মুলতুবী থাক। স্টেটমেণ্ট এবং

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট নিশ্চয় আপনার কাছেই আছে। ও দুটোর উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিতাম। এ ছাড়া আগে যে মেয়েটি খুন হয়েছে তার সম্পর্কেও দু-চার কথা জেনে নেবার আগ্রহ আমার রয়েছে।

ইন্সপেক্টার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্টেটমেণ্ট ও পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বার করে দিলেন। বাসব গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ল। তারপর খুঁটিয়ে জেনে নিল সেই নিহত মেয়েটির সম্পর্কে সমস্ত তথ্য। তারপর প্রশ্ন করল, মৃণালের বন্ধুর ঠিকানাটা কি?

—দশ নম্বর রামসেবক রোড।

—আচ্ছা, আমরা এখন উঠলাম ইন্সপেক্টার। কাল আপনাকে একটু কষ্ট দেব। মৃণালের ঘরখানা দেখতে চাই।

—বেশ তো।

বাসব ও শৈবাল বিদায় নিল বার্ণবালের কাছ থেকে। থানার বাইরে পা দেবার পর শৈবাল বলল, ইন্সপেক্টার আমাদের ভালোভাবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হল না!

—তোমার সীমানার মধ্যে কেউ মাতব্বরি করতে এলে তোমারই কি ভালো লাগবে ডাক্তার? এস, ওই রিক্‌শাটায় উঠে পড়া যাক।

—এখন কোথায় যাবে?

খুনের জায়গাটা দেখে আসা যাক। সেই সঙ্গে পোড়োবাড়িটাও। দেবব্রতবাবুর মুখে শুনেছ তো, দু'জায়গার মধ্যেকার ব্যবধান খুব বেশি নয়।

ওরা যে রিক্‌শায় উঠল তার রিক্‌শাওয়ালা বেশ তাগড়াই। ওদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। প্রথমে ওরা পৌঁছল যেখানে খুন হয়েছিল।

সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও এমন কিছু চোখে পড়ল না যা তাদের কাজে লাগতে পারে। তবে জায়গাটি অসম্ভব নির্জন। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে একটা কেন, দিনদুপুরে দশটা খুন করলেও কারুর পক্ষে জেনে ফেলা সম্ভব নয়। ওখান থেকে ওরা পোড়োবাড়িতে চলে এল। বলাবাহুল্য, রিক্‌শাওয়ালা বাড়ির কাছাকাছি আসতে চাইল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল বেশ কিছুটা দূরে।

অন্তত শ'দুয়েক বছর আগে যে এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে এর গঠন দেখে মনে হয়, যদি মাঝে মাঝে সংস্কার করিয়ে নেওয়া হত তাহলে আরো বহু বছর ধরে বহু মানুষ আশ্রয় পেত এখানে। কবে এই বাড়ি পরিত্যক্ত হয়েছে তা অবশ্য পুলিশ জানতে পারেনি।

বাসব কুয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই কুয়ার দিকে আঙুল নির্দেশ করে নির্মলকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিল সেই তরুণী। তারপর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কুয়ার মুখ বিরাট। চারপাশের বাঁধানো অংশ ভেঙে ভেঙে গেছে। বাসব ভিতরে উঁকি মেরে দেখল। আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তবে মনে হয় জল নেই।

এরপর ওরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। দরজা-জানলার পাল্লা যে যেমন সুবিধা পেয়েছে খুলে নিয়ে গেছে। বিরাট বিরাট দরজার মুখগুলো যেন হাঁ হাঁ করে গিলতে

আসছে। প্রথম পরপর চারখানা ঘরে কোন আসবাবপত্র দেখা গেল না। একাধিক কুলুঙ্গি ও তাকবিশিষ্ট সমস্ত ঘর। মেঝের উপর পুরু ধুলো জমা হয়ে রয়েছে। কতকাল ধরে এই ধুলোর স্তর পড়েছে কে জানে?

ওরা এবার উঠোনে এসে পড়ল। ফেটে যাওয়া পাথর বাঁধানো উঠোনে অজস্র আগাছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উঠোনের চারদিকেই বারান্দা। তারপর ঘরের সারি। পশ্চিম দিকের সমস্ত ঘর ওরা একে একে দেখে নিল। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

উত্তর দিকের প্রথম ঘরখানায় পা দিয়েই বাসব থমকে দাঁড়াল। পুরু ধুলোর উপর অজস্র পায়ের ছাপ। রবারের সোল দেওয়া জুতো পরে কেউ যেন বারবার এখানে এসেছে। ছাপ কিন্তু এলোমেলো নয়। দরজার সামনা-সামনি যে কুলুঙ্গি—মনে হয় সেখানে কেউ গেছে আবার ফিরে এসেছে বারান্দায়। কুলুঙ্গির মেঝের কিছুটা অংশ আবার বেশ পরিষ্কার।

শৈবাল বলল, অতি সম্প্রতি কয়েকজন লোক এখানে যাওয়া-আসা করেছে।

চিন্তিত গলায় বাসব বলল, তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। ওই দেখ, দুজনের যে এ ঘরে যাতায়াত ছিল তার প্রমাণ—।

বাসবের নির্দেশিত জায়গায় শৈবাল তাকিয়ে দেখল, বেশ কয়েক জোড়া চটির দাগও রয়েছে। কিছুটা অস্পষ্ট হওয়ায় প্রথমে নজর পড়েনি। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জুতো এবং চটির ছাপ অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল।

তারপর পায়ের ছাপগুলি বাঁচিয়ে ওরা কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে পৌঁছল। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সেকেলে বাড়িতে যেমন কুলুঙ্গি থাকে ঠিক তার প্রতিরূপ। বাসব একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর, কিছু পড়েছিল এখন শুধু দাগ রয়েছে এমন একটি জায়গা ঝুঁকে পড়ে শুঁকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসল শৈবালের দিকে তাকিয়ে।

—কি হল?

কেরোসিন তেলের গন্ধ বেরুচ্ছে। অর্থাৎ রাত্রের দিকে দুজন লোকের এঘরে যাতায়াত আছে। তারা কেরোসিন তেলের আলো জ্বেলে কিছু করে। কিন্তু কি করে তারা? তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—কুলুঙ্গির তলাকার এই পরিষ্কার জায়গাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। যাক, ও নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। চল, এবার ফেরা যাক।

—এই পায়ের ছাপগুলো—

জুতো আর চটি—দুটোরই ছাপ তুলে নিতে হবে। আজ তো আর সঙ্গে কিছুই নেই। কাল সকালে আমরা আবার আসব।

ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ওরা যখন শহরে পৌঁছল তখন সূর্য ডুবে গেলেও পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে রয়েছে। ওরা হোটেলে না গিয়ে রামসেবক রোডে গেল। মৃণালের বন্ধু তপন রায়ের

সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নেওয়াই উদ্দেশ্য। তপনকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। কোথায় বেরিয়েছে। বাসব নিজের ঠিকানা দিয়ে বলে এল, সম্ভব হলে তপন যেন ওর সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখা করে।

—এখন কি করবে? হোটেলে ফিরবে না কি?

দাঁতে পাইপ চেপে রেখেই বাসব বলল, মোড়ের মাথায় একটা রেস্টুরেণ্ট দেখতে পাচ্ছ ডাক্তার? চল, চা-পর্বটা ওখানে সেরে নিয়ে ডাঃ নির্মল চ্যাটার্জীর চেম্বারে যাব।

দেবব্রত সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন সকলকে।

সাড়ে ছ'টার মধ্যেই 'রেটিনা' জমজমাট হয়ে উঠল। সকলেই বাসবের মুখোমুখি হতে নার্ভাস বোধ করছে। ভদ্রলোক কাকে কি ধরনের প্রশ্নের বেড়াজালে বাঁধবেন তার তো কোন স্থিরতা নেই।

যথাসময়েই বাসব ও শৈবাল এসে উপস্থিত হল। নমস্কার বিনিময়ের পর ওদের সঙ্গে দেবব্রত সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর কাজের কথা আরম্ভ হল। বাসব বলল, মৃণালকে বোধহয় আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন?

অরুণ উত্তর দিল, আমার সঙ্গে ছাড়া আর সকলেব সঙ্গেই মৃণালের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় মৃণালের সঙ্গে আমারও তা ছিল না। দেবব্রত বলল, আমার বিশ্বাস এখানে আর যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাবই মতো তার মুখ চেনাচিনি ছিল।

দেবব্রতর কথায় লাহিড়ী, রজত ও নির্মল সায় দিল।

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল। মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে বলল, তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃণালের সঙ্গে আপনারা কেউই থিক অ্যাণ্ড থিন ছিলেন না। তবে মোটামুটিভাবে তাকে জানতেন। এতেও অবশ্য কাজ হবে। তার অ্যাক্টিভিটি কি রকম ছিল সে সম্পর্কে আপনারা কেউ কি কিছু বলতে পারেন? মানে সে কি রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত। তার চালচলন কি রকম ছিল, এই সব আর কি।

রজত বলল, আমি যে কলেজে পড়াই মৃণাল সেখানে মাঝে মাঝে যেত। স্টুডেণ্ট ফেডারেশানের সংগঠনের ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ দেখতাম।

—সে কি আপনাদের কলেজ থেকে পাশ করেছিল?

—হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে।

—আচ্ছা একজন এক্স-স্টুডেণ্ট কলেজের ইউনিয়ানে মাতব্বরি করছে—এতে কেউ আপত্তি করেনি?

—প্রিন্সিপাল আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আপনি তো জানেন, আজকাল কলেজ অথরিটির কথা ছাত্ররা শুনতে চায় না।

—আমি তাকে যতদূর জানতাম—নির্মল বলল, সে খুব বাজে খরচ করত।

—হৈ হল্লা করে বেড়াত—এক কথায় সে ছিল শহরের হিরো।

—দেখতে কেমন ছিল—মানে চেহারা?

—বলতে গেলে সিনেমার নায়কের মতো চেহারা। সাজ-পোশাকও করত বেশ মানানসই।

—হুঁ। কোন নারীঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে সে জড়িত ছিল কিনা আপনারা কেউ সে সম্পর্কে কিছু জানেন?

—সকলেই মাথা নাড়লেন।

পাইপ নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে বাসব কয়েকবার টানল, তারপর বলল, দেবব্রতবাবু, উমেশবাবুর সঙ্গে আপনার জমি নিয়ে ঝগড়া হবার পর মৃণালের সঙ্গে ওই বিষয় নিয়ে কোন কথা হয়েছিল?

—আমার সঙ্গে—ঠিক—, দেবব্রত ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

—মিথ্যে ইতস্ততঃ করছেন। আমার কাছে মন খুলে কথা বললেই জানবেন তদন্তের পক্ষে সুবিধা হবে।

—ব্যাপারটা কি জানেন, পুলিশকে আমি কথাটা বলিনি। তখন মনে হয়েছিল—

—আরো বেশি সন্দেহ আপনার উপর এসে পড়বে। পুলিশকে না হয় না-ই বলেছেন, আমাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আপনাকে সন্দেহমুক্ত করবার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে মনে রাখবেন।

একটিপ নস্যি নিয়ে দেবব্রত বললেন, উমেশবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার দিন দুয়েক পরে রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কোন ভূমিকা না করেই বলেছিল, প্রাণের মায়া যদি থাকে তাহলে মামাকে জমিটা পাইয়ে দিন। আমি অবশ্য তর্ক করতে চাইনি। ও একাই নানারকম আজে-বাজে কথা বলতে থাকল। আমি ওখান থেকে চলে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

লাহিড়ী বলল, আমার তো মনে হয় কোন কাজ ওর অসাধ্য ছিল না। এখানে কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে ওর মেলামেশা ছিল লক্ষ্য করেছি।

—ওইসব ড্রাইভার প্যাসেঞ্জারদের ঠেঙায় না কি?

—প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বলে না। তবে ওরা সব স্মাগলার। স্বার্থে ঘা লাগলে দু'চারটে মানুষ খুন করা ওদের পক্ষে কিছুই নয়।

বাসব এবার কথার মোড় ঘোরাল, মৃণাল প্রসঙ্গের এখানে ইতি হোক। এবার ভৌতিক গল্প নিয়ে কথাবার্তা বলা যেতে পারে। নির্মলবাবু আপনি ও রজতবাবু এবার একে একে বলুন তো প্রকৃতপক্ষে আপনারা কি দেখেছিলেন? দেবব্রতবাবুর কাছ থেকে যদিও আমি সবই শুনেছি তবু আপনাদের মুখ থেকে আবার শুনতে চাই।

প্রথমে নির্মল তারপর রজত নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলল।

—মেয়েটিকে বেশ সুশ্রী বলে মনে হয়েছিল?

রজত ও নির্মল সমর্থন জানাল।

—চেনা চেনা মনে হয়েছিল কি? ধরুন, তাকে কোথাও দেখেছেন, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না এরকম কিছু—?

দুজনেই জানাল মেয়েটিকে আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে হয়নি।

দেবব্রত প্রশ্ন করলেন, আপনাদের কি মনে হচ্ছে খুনের সঙ্গে ওই ভৌতিক ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে?

আপাত দৃষ্টিতে এখন কোন সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না। তবে জোর দিয়ে কিছু বলা বোধহয় ঠিক হবে না। আচ্ছা, এখন আমরা উঠি। এস ডাক্তার—

বাসব আর শৈবাল রিক্‌শায় করে ফিরে এল হোটেলে। রাস্তায় কোন কথা হল না।

ঘরে পৌঁছে বাসব কোটটা হ্যাঙারে টাঙিয়ে রেখে বিছানায় গা ঢেলে দিল। শরীর যে ওর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তা নয়, মাথায় ওর পর্বত-প্রমাণ চিন্তার ভার।

শৈবাল বলল, আচ্ছা, মৃণাল কেমন ছেলে ছিল বলে তোমার মনে হয়?

—যেমন সকলের মুখে শুনলাম। খর্‌চে গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে।

—তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তুমি কোন বৈষম্য লক্ষ্য করেছ কি?

—বৈষম্য! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

বাসব উঠে বসে বলল, মামার আশ্রয়ে ছিল মৃণাল। উমেশ ধরের চরিত্র সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে তাতে বলা যায়, তিনি ভাগনেকে এমন কিছু হাতের তোলার উপর রাখেননি। তাহলে মৃণাল প্রচুর খরচ করবার মতো টাকা কোথা থেকে পেত জানা দরকার।

—ইউনিয়ান করত শুনলাম। ওখানে থেকেই হয়তো—

—টাকা পেত? না ডাক্তার, তা নয়। ছোট শহরের একটা কলেজ ইউনিয়ান তাকে কত টাকা দিতে পারে? আমার কি মনে হচ্ছে জানো, মনে হচ্ছে বাঁকা পথ দিয়েই তার হাতে টাকা আসত। মনে করে দেখ, লাহিড়ী কি বলেছিল, কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির ট্যাক্সিড্রাইভারের সঙ্গে মৃণালের ঘনিষ্ঠতা ছিল। মালিচক মুঙ্গের জেলার মধ্যে। আর তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, যতবারই মুঙ্গেরে আমরা তদন্তে গেছি, ততবারই সেখানে লক্ষ্য করেছি, প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি ইত্যাদির সাহায্যে কিভাবে চোরাকারবার হয়। হয়ত মৃণাল গাঁজা স্মাগলিং করে প্রচুর টাকা পেত। অর্থাৎ তার চরিত্রে মিশ্রভাব ছিল। একধারে সে স্মাগলিং করে টাকা রোজগার করত, আবার এক্স-স্টুডেণ্ট হয়েও কলেজ ইউনিয়ান নিয়ে তার মাতামাতি করা স্বভাব ছিল। এই ধরনের ছেলেরা—অর্থাৎ স্বার্থের ব্যাপারে যারা গভীরভাবে জড়িত তাদের খুন হয়ে যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

এখন আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, নারীঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে সে জড়িত ছিল কি না। সচরাচর দেখা যায়, হাতে প্রচুর টাকা এসে পড়লে মানুষ মদেই শুধু হাবুডুবু খায় না মেয়েমানুষের পিছনেও অবিরাম ছুটতে থাকে।

—তোমার কি মনে হচ্ছে কেসটা খুব জটিল?

—ভৌতিক ব্যাপার ও হত্যাকাণ্ড জট পাকিয়ে যাওয়ায় কেসটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে বই কি। তবু আমার কি মনে হয় জানো ডাক্তার, কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে। যে ফাঁকটা চোখে পড়লেই এই কেস জলের মতো সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু আর কথা নয়, চল, খেয়ে আসা যাক।

প্রিয় নাগ ওদের জন্য স্পেশাল মেনুর ব্যবস্থা করেছিলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ওরা নিজেদের ঘরেই ফিরছিল। প্রিয় নাগ মুখে হেঁ হেঁ মার্কা হাসি ফুটিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, বাসব বলল, এখন কি সময় হবে আপনার?

—বিলক্ষণ। আসুন না অফিস ঘরে।

নাগের পিছু পিছু দুজনে হোটেলের ছোট্ট অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—বসুন। আমি কফি আনতে বলে দিই।

—না থাক। বাসব দাঁতে পাইপ চেপে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা, যে ভৌতিক ব্যাপার এখানে ঘটছে সে সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—আমি ও সমস্ত নিয়ে তেমন চিন্তা করিনি স্যার। ব্যাপারটা ঘটছে নানা লোকের মুখে শুনেছি। তাতেই আমি ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি।

—আপনার রেস্টুরেণ্টে মৃণাল প্রায়ই আসত বলেছিলেন। আচ্ছা, সে একা আসত, না সঙ্গে লোকজন থাকত?

—দু-একজন সব সময় সঙ্গে থাকত। তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, মস্ত চেহারার সমস্ত লোক।

—তাদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—সত্যি কথা বলতে কি, তার সঙ্গীদের দেখলেই মনে হত সব রকম দুষ্কর্ম তারা করতে পারে। কোণের টেবিলে বসে ফিসফিস করে তাদের সঙ্গে কথা বলত মৃণাল।

—তাদের কাউকে আপনি চেনেন?

—না, কত লোকই তো এখানে যায় আসে, সকলের পরিচয় কি জানা সম্ভব?

—যাক, এবার যে প্রশ্ন করব একটু ভেবে-চিন্তে তার উত্তর দেবেন। কোনদিন কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মৃণালকে রেস্টুরেণ্টে আসতে দেখেছেন?

প্রিয় নাগ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

—কি হল? বলুন?

—ও সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার আলোচনা করাটা কি ঠিক হবে?

—কেন হবে না? আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পুলিশি হ্যাঙ্গামায় পড়তে হবে না আপনাকে। এবার বলুন।

—একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মৃণাল দু'বার এসেছিল।

—তারপর?

—তারপর আবার কি? আমি তাদের কোন কথা শুনিনি।

শৈবাল বেশ বুঝতে পারছে প্রিয় নাগ মনে মনে উত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। শুধু ভয়ে আপত্তি করতে পারছেন না।

—কেন, কেবিনের মধ্যে বসে কথা হত বুঝি?

—না, বাইরে বসে।

পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ বাসব দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয় আপনার পরিচয় আছে নাগমশাই।

থতমত খেয়ে গেলেন নাগমশাই, বললেন, পরিচয় ঠিক নেই। তবে—

—মুখ চেনাচিনি আছে এই তো? মেয়েটি কে?

—নাম জানি না, তবে যোগমায়া গার্লসে পড়ায় শুধু এইটুকু জানি।

—ধন্যবাদ। আর বিরক্ত করব না। আমরা এবার উঠি।

এতক্ষণ পরে প্রিয় নাগের মুখে আবাব বিগলিত হাসি দেখা গেল। তিনি নিজেকে এবার ফিরে পেলেন বোধহয়। বললেন, না না, মোটেই বিরক্ত হইনি। আপনি তো নিজের কর্তব্যই করছেন।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শৈবাল বলল, মালিক-কাম-ম্যানেজার লোকটিকে বেশ ঘোড়েল বলে মনে হয়। সব কথার উত্তর কেমন সতর্কভাবে দিচ্ছিল লক্ষ্য করলে?

—সতর্কভাবে কথা বলার অভ্যাস না থাকলে এত বড় হোটেল কখনও চালাতে পারে ডাক্তার?

—তা বটে।

আর কোন কথা হল না। ঘরে গিয়ে দুজনেই পোশাক পাল্টে ফেলল। শৈবাল ভাবছিল বাসব আর কোন কথা না বলে বিছানায় আশ্রয় নেবে। মুখ দেখে মনে হয়, ওর মনকে এখনও অজস্র চিন্তা সাপটে ধরেছে, শুয়ে শুয়ে চিন্তার জট ছাড়াবার জন্য ও এখন নিশ্চয় ব্যগ্র। সুতরাং শৈবাল কিছু না বলে বিছানায় নিজেকে সঁপে দিল।

বাসব কিন্তু তার ধারণা পাল্টে দিল। বিছানায় বসতে বসতে বলল, এখন মৃণালকে তোমার কেমন মনে হচ্ছে?

—সে প্রেমেও পড়েছিল।

—প্রেম যাকে বলে তা বোধহয তখনও গ্রো করেনি ডাক্তার। আলাপের প্রথম স্টেজ বলতে পারো। কারণ ওরা রেস্টুরেণ্টে এলেও কেবিনে বসেনি। প্রেমিক-প্রেমিকাবা কেবিনে বসে সঙ্গোপনে আলাপ কবাটাই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তা হয়নি, তাব মানে হয় সবে মাত্র আলাপ হযেছিল, নতুবা মুখ চেনাচিনি হয়ত অনেক দিন থেকেই ছিল—কোনরকমে মৃণাল মেয়েটিকে বার দুয়েক রেস্টুরেণ্টে আনতে সমর্থ হয়। আমি কিন্তু ডাক্তার এই প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা ভাবছি।

—কি কথা?

—হাজার মুখ চেনাচিনি থাক তবু একজন শিক্ষিকা মৃণালের মতো একজন ছেলেব সঙ্গে রেস্টুরেণ্টে আসবে কেন?

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাত্র বিচার না করেই অনেকের অনেককে ভালো লাগে।

—তোমার যুক্তিতে অবশ্যই ধার আছে। তবে এ সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রাখতেই হবে। মেয়েটির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়াও দরকার। এবার শুয়ে পড়া যাক, কি বল? সকালে অনেক কাজ।

বাসব নিজেকে বিছানায় ঢেলে দিল।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর পোড়োবাড়িটা

গিয়ে সেই জুতো এবং চটির ছাপ তুলে নিয়ে আটটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এল। চা-পর্ব শেষ করে ওরা বিশ্রাম নিয়ে থানায় বেরুতে যাবে এমন সময় তপন এল।

মৃণালেব বন্ধু তপন রায়। ছিপছিপে চেহারার বছর চব্বিশের যুবক। তাকিয়ে থাকার মতো মুখ-চোখ না হলেও খুব খারাপ নয়। বেশ সপ্রতিভভাবে নিজের পরিচয় সে বাসবকে দিল।

বাসব তাকে বসিয়ে বলল। আপনি এসে পড়ায় খুশি হয়েছি।

—বাড়ি ফিরে কাল শুনলাম, আপনি আমার খোঁজে গিয়েছিলেন, তাই আজই চলে এলাম।

—ভালোই করেছেন, আচ্ছা, আপনার বন্ধুর মৃত্যুতে আপনি নিশ্চয় দারুণ শক্‌ড হয়েছেন?

—না।

বাসব ও শৈবাল দুজনেই অবাক হয়ে গেল। তপনের কাছ থেকে ওরা এ-রকম উত্তর আশা করেনি। বাসব বলল, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে বোধহয় একমাত্র আমিই ছিলাম। দিন দিন ও এমন নেমে যাচ্ছিল যে, আমি বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও যে একদিন খুন হবে, বলতে গেলে এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলাম।

আবার দুজনের অবাক হবার পালা।—সে কি?

—হ্যাঁ, বদ সঙ্গে পড়ে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল। তার ওপব ছিল স্বার্থ নিয়ে দরাদরি।

—আবো একটু পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়।

—ও গাঁজা স্মাগলারদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। সে যে কি ভয়ঙ্কর জায়গা তা আপনি জানেন না। খুন করাটা তাদের কাছে ছেলেখেলা।

—আপনি বলতে চান তাদেরই মধ্যে কেউ মৃণালকে খুন করেছে?

—জোর দিয়ে কি করে বলব বলুন? তবে এটুকু বলতে পারি, ও নিজেকে নষ্ট করার মাসুল হাতে হাতেই পেয়েছে। শুধু এই জন্য ওর মৃত্যুতে আমি শক্‌ড হইনি।

—আপনার স্পষ্ট কথা আমার ভালো লাগছে। তবে একটা বিষয়ে আমি কিছুটা ধাঁধায় রয়েছি। থানায় আমি আপনার স্টেটমেণ্ট পড়েছি। আপনি কিন্তু আমায় এখন যেসব কথা বলছেন, পুলিশকে তা বলেননি।

—আপনাকেও আমি উপযাচক হয়ে বলতাম না। আপনি আমায় প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিয়েছি। পুলিশ আমাকে এ-ধরনের কোন প্রশ্ন করেনি, কাজেই বলার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি।

—যাক, এবার অন্য কথায় আসা যাক। মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বন্ধুর ইণ্টারেস্ট ছিল কি রকম?

—আগে মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামাত না। তবে ইদানীং একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার জন্য ও মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

—মেয়েটি বোধহয় যোগমায়া গার্লসের টিচার?

সবিস্ময়ে তপন বলল, আপনি কিভাবে জানলেন?

বাসব হেসে বলল, যেভাবেই হোক জেনেছি তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন।

—মেয়েটি কিন্তু মৃণালকে পাত্তা দেয়নি।

—আমি কিন্তু জানি, দুজনে বারদুয়েক রেস্টুরেণ্টে গিয়েছিল।

—সে কথা আমিও জানি। মৃণাল ভয় দেখিয়েছিল গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে—তাই গিয়েছিল।

বাসব বলল, মৃণালবাবু তাহলে আপনাকে মনের ও প্রাণের অনেক কথাই বলেছিলেন?

—সব কথাই বলত। আমিই বোধহয় তার একমাত্র ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলাম। বদ সঙ্গ না করার কথা তাকে অনেকবার আমি বলেছিলাম, সে শোনেনি। তবে একটা কথা জানতাম, ভয় দেখিয়ে বনানীকে নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করলেও, প্রকৃতপক্ষে ও তার কোন ক্ষতিই করত না।

—কোন ক্ষতি করতেন না কিভাবে বুঝলেন?

—মৃণাল সত্যি বনানীকে ভালোবাসত। এমন কি ইদানীং বনানী অন্য একটি ছেলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে জেনেও তার কোন ক্ষতি করেনি।

—অন্য ছেলেটি কে?

—তার নাম আমায় জানায়নি।

বাসব কয়েক মিনিট আর কোন প্রশ্ন করল না। নিভে যাওয়া পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলল অবিরাম। তারপর বলল, আপনার বন্ধুর ইদানীংকার অ্যাক্‌টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলবেন?

—অ্যাক্‌টিভিটি সম্পর্কে আর কি বলব? আজকাল খুব কম দেখাসাক্ষাৎ হত আমাদের। তবে লক্ষ্য করেছিলাম, কিছুদিন, থেকে ও মনমরা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। একদিন এবিষয় তাকে প্রশ্নও করেছিলাম। মৃণাল হাসতে হাসতে বলেছিল, সে একজন লোককে খুন করার শক্তি সংগ্রহ করছে।

—ভেরি ইণ্টারেস্টিং। কাকে খুন করবার ইচ্ছে ছিল?

—এ-প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। বিচিত্র এক উত্তর দিয়েছিল মৃণাল। বলেছিল, কাকে খুন করবে এখনও জানে না। তবে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—আচ্ছা, আপনার বন্ধু দেখতে কেমন ছিলেন?

—একটু খাটো গড়ন হলেও মুখ-চোখ ছিল চমৎকার। গুণও ছিল তাব অনেক। ভালো ফুটবল খেলত, থিয়েটার করতে পারত। স্মাগলারদের সঙ্গে মিশেই নিজের আখেরটা নষ্ট করে ফেলেছিল। নইলে—

—অজস্র কাঁচা টাকার লোভ সামলানো একটু কষ্টকর নয় কি? যাক ও কথা, ভৌতিক ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

—এ এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। নিতান্ত ঘরের পাশে ঘটছে তাই, না হলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

—আপনার বন্ধুর এ-ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল?

—সে খুব সাহসী ছেলে ছিল। বলত, চোখে না দেখলে ওসব বিশ্বাস করব

ধা

প্ল্যান করেছিলাম, নিজের চোখে দেখবার জন্য একদিন সারা রাত আমরা দুজনে ওই রাস্তায় কাটাব। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথাটা শেষ করল।

—যাক, প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। আপনাকে আর ধরে রাখব না। দেখা করবেন আবার।

—নিশ্চয়। এখন তাহলে যাই—

তপন চলে যাবার পর শৈবাল বলল, কেমন বুঝলে?

বাসব জানলার ফ্রেমের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলল, বন্ধুর মৃত্যুতে শক্‌ড্‌ হইনি একথা বললেও, ও যে শক্‌ড্‌ হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। ছোকরার হৃদয় আছে। ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমি হয়তো এই কেসের কিছুই করতে পারতাম না। এখন আমার প্রধান কাজ হল বনানীর প্রেমিকের খোঁজ-খবর নেওয়া।

—তুমি কি মনে কর খুনের নেপথ্যে একটা নারীঘটিত ব্যাপার আছে?

—এখনও পর্যন্ত এ ছাড়া খুনের আর তো কোন মোটিভ চোখে পড়ছে না।

—ভেতরে আসতে পারি?

বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

—আসুন দেবব্রতবাবু।

দেবব্রত ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বললেন মৃদু গলায়, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম জেনে যাই, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

—কোন অসুবিধা নেই। চমৎকার আছি। আপনি এসে পড়ায় ভালোই হয়েছে, একটা কথা জেনে নিই। যোগমায়া গার্লসের টিচার বনানীকে আপনি চেনেন?

—বনানী সোমের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আলাপ বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নেই। তবে এখানে-ওখানে বহুবার তাঁকে দেখেছি।

—তাঁর কোন বয়ফ্রেণ্ড আছে কিনা জানেন?

—আমার জানা নেই।

—এখানে উনি কোথায় থাকেন? ঠিকানাটা আমার বিশেষ দরকার।

বাসবের প্রশ্নমালায় দেবব্রত বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, মৃণালের খুনের তদন্তে বনানী সোমের ভূমিকা কি? তিনি অবশ্য নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলেন না। যতদূর সম্ভব সহজভাবে বললেন, উমেশ ধর যোগমায়ার সেক্রেটারী। তাঁকে ফোন করে জেনে নিতে পারেন।

—তাই না কি। উমেশ ধর তাহলে শুধু ব্যবসাদার নন, বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক দেখা যাচ্ছে! ঠিক আছে, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি। বনানী সোমের ঠিকানাটা জেনে নেব না হয়। ডাক্তার—

—বল?

—নীচে গিয়ে ইন্সপেক্টারকে ফোন করে জানিয়ে দাও আমরা আসছি। উমেশ ধরের বাড়ি যাবার জন্য উনি যেন তৈরি থাকেন।

শৈবাল ফিরে এসে জানাল, ইন্সপেক্টার আমাদের সঙ্গ দিতে পারবেন না। তবে উমেশ ধরকে উনি বলে রাখছেন। আমরা ওখানে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তার মানে পুলিশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। ঠিক আছে, চলুন, দেবব্রতবাবু, আপনি উমেশ ধরের বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দেবেন।

হোটেল থেকে ওরা বেরিয়ে এল। দেবব্রত স্কুটারে এসেছিলেন। বাসব ও শৈবাল রিক্শায় চেপে বসল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা উমেশ ধরের বাড়ি পৌঁছে গেল। বলা বাহুল্য, দেবব্রত আর দাঁড়ালেন না।

ধরমশাই বাড়িতেই ছিলেন। যেভাবে ওদের গ্রহণ করলেন উনি, ইংরাজীতে প্রকৃত অর্থেই তাকে কোল্ড রিসেপশন বলে।

—মৃণালের ঘর দেখতে চান? কেন বলুন তো? ওটা কি যাদুঘর?

গৃহকর্তার কথাবার্তায় শৈবালের শরীর রি রি করছিল। শহরের একজন গণ্যমান্য লোক এমন অভদ্রের মতো কথা বলতে পারে তা না শুনলে বিশ্বাস হয় না। বাসব অবশ্য বেশ ধৈর্য রেখেই কথা বলে যাচ্ছে।

বাসব বলল, প্রয়োজনের খাতিরেই ঘরখানা দেখতে চাইছি।

—কেন যে এই দেখাদেখি তা বুঝি না। পুলিশ যা করবার তা তো করে গেছে, তারপর আবার এই উটকো ঝামেলা কেন? আমার ভাগনে খুন হয়েছে আমার মাথা ব্যথা নেই, যত মাথা ব্যথা আর সকলের।

বাসব এবার দৃঢ় গলায় বলল, আপনাকে নিয়েও আমার মাথা ব্যথা নেই ধরবাবু। আমি শুধু জানতে চাই, ঘরখানা আমায় দেখাবেন কি না?

—আমার বাড়িতে এসে আমাকেই ধমকাচ্ছেন। এ তো দস্তুরমত জুলুম।

—যা ইচ্ছে মনে করতে পারেন। আপনি কি ধরনের ব্যবসাদার আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। আমি শুধু জানিয়ে রাখতে চাই, এই প্রদেশের পুলিশের বড় কর্তারাই নয়, অ্যাণ্টি-করাপশনের মাথারাও আমার বন্ধুস্থানীয়। আপনার ব্যবসায়ের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য তাঁদের সঙ্গে আমায় যোগাযোগ করতে হতে পারে।

দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিলেন উমেশ ধর। তারপর চোরাদৃষ্টিতে বাসবকে দেখে নিয়ে দ্রুত বাড়ির ভেতর দিকে এগিয়ে ডাকলেন, রমেন—

—যাই বাবা—বছর চোদ্দ বয়সের রমেন এসে দাঁড়াল।

—এঁদের মৃণালের ঘরে নিয়ে যাও।

—আসুন—

রমেনের পিছু পিছু ওরা বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় তালা লাগানো নেই। চেপে বন্ধ করা মাত্র। চাপ দিতেই পাল্লা খুলে গেল। ঘরখানাকে ছোট বলা চলে না—ষোল বাই ষোল হবে। ওপাশে আরো একটা দরজা আছে। গ্রিল বসানো জানলার সংখ্যা চারখানা।

আসবাবের মধ্যে রয়েছে, সেকেলে ঢাউস সাইজের একটা আলমারি। ছোট নেয়ারের খাট, আলনা—আলনায় ট্রাউজার, শার্ট ইত্যাদি ঝুলছে। টেবিল-চেয়ারও আছে। আর আছে দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো বেশ বড় সাইজের একটা আয়না।

বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু দেখে নিয়ে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। টেবিলের উপর একটা সুদৃশ্য ফটো স্ট্যাণ্ড রয়েছে। ছবিখানা নিশ্চিতভাবে মৃণালের। বাসব স্ট্যাণ্ডটা হাতে তুলে নিল। তপন ঠিকই বলেছিল, চমৎকার দেখতে ছিল মৃণালকে।

রমেনের দিকে তাকিয়ে, দ্বিতীয় দরজাটার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বাসব প্রশ্ন করল, এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

রমেন চটপট উত্তর দিল, দরজার ওধারে রাস্তা।

অর্থাৎ রাত-বেরাতে সহজেই সকলের অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরুতে ও ফিরে আসতে অসুবিধা ছিল না মৃণালের।

—তুমি বলতে পারো, আগে এঘরে যা ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে কি না?

—তাই আছে। মৃণালদা মারা যাবার পর থেকে আমরা কেউ এ ঘরে আসিনি।

—আগে বুঝি এ ঘরে সকলে খুব আসত?

—সকলে আসত না। মাঝে মাঝে মৃণালদা ডাকলে আমি আসতাম।

—ওই আলমারির চাবি কার কাছে কাছে এখন?

—টেবিলের দেরাজেই মৃণালদা চাবি রাখত।

বাসব এগিয়ে গিয়ে দেরাজ টানল। দেরাজের ভেতরে বিশেষ কিছু নেই। তবে চাবিটা অবশ্য আছে। চাবি দিয়ে আলমারি খোলা হল। দুটো তাকে শার্ট, ট্রাউজার ইত্যাদি থরে থরে সাজানো। মৃণাল যে পোশাক-রসিক ছিল বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। বাকী দুটো তাকে টুকিটাকি অনেক কিছু রয়েছে। বাসব নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল।

ক্যামেরা, ধোঁয়াটে কাঁচের চশমা, খানদশেক গল্পের বই, প্রসাধনের নানা সামগ্রী। তৃতীয় তাকের কোণের দিকে কাগজে জড়ানো কি একটা পড়ে ছিল। বাসব সেটা তুলে এনে মোড়ক খুলতেই ইঞ্চি চারেক লম্বা একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল। শিশির গায়ে কোন লেবেল নাই। তবে ভেতরে হলদে রংয়ের তরল কিছু রয়েছে।

—ডাক্তার, এতে কি আছে বুঝতে পারছ? বাসব শিশিটা এগিয়ে ধরল।

—উহুঁ। স্পিরিটের গন্ধ পাচ্ছি যেন।

—ঠিক আছে পরে তলিয়ে দেখা যাবে। এখন জামা-কাপড়গুলো একটু হাতড়ে দেখা যাক।

কাগজে মুড়ে শিশিটা পকেটস্থ করে বাসব ট্রাউজার, শার্ট ইত্যাদি আলমারি থেকে বার করে টেবিলের উপর রাখতে লাগল। ওর উদ্দেশ্য পিছন দিকে কিছু আছে কি না দেখা। ওগুলো নামাতেই এক জোড়া শাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বাসব ও শৈবাল দুজনেই অবাক। আলমারির মধ্যে যে শাড়ির সন্ধান পাওয়া যাবে তা আশা করেনি তারা। টেরেলিন জাতীয় শাড়ি দু'খানাই বেশ জেল্লাদার।

শৈবাল বলল, বনানী সোমকে প্রেজেণ্ট করবার জন্য বোধহয় কিনেছিল।

—পরা শাড়ি কেউ কি প্রেজেন্ট করে ডাক্তার? দেখছ না পাটভাঙা।

আর কোন কথাই হল না। আলমারিতে আবার সমস্ত কিছু আগেকার মতোই সাজিয়ে রাখা হল। ঘরে দেখবাব মতো আর কিছু নেই।

রমেন এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কার্যকলাপ দেখে যাচ্ছিল। এবার বলল, বাবাকে ডেকে দেব?

—দরকার হবে না। আমরা এখন যাচ্ছি।

ওরা বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নেমে শৈবাল বলল, আমরা কি এখন হোটেলে ফিরব?

না—। এখন একবার যোগমায়া গার্লসে যাওয়া দরকার।

একটা চলন্ত রিক্শা থামিয়ে তাতে ওরা উঠে পড়ল।

—একটা বিষয় তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ—শৈবাল বলল, মৃণাল বাঁকা পথ দিয়ে এত পয়সা রোজগার করত, অথচ আলমারির মধ্যে একটা পয়সার সন্ধান পাওয়া গেল না! আমি কিছু কাগজ-পত্রও আলমারির মধ্যে আশা করেছিলাম। টাকা-পয়সা ও কাগজ-পত্র না থাকার অর্থ হয় উমেশ ধর সরিয়ে ফেলেছে, কিংবা শহরের আর কোথাও মৃণাল ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের যাবতীয় সমস্ত কিছু সেখানে রাখত।

মিনিট দশেক প্রায় লাগল যোগমায়া গার্লসে পৌঁছতে। কোন শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে প্রথমে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করাই যুক্তিসঙ্গত। বাসব চাপরাশির হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়ল ওদের।

প্রধান শিক্ষিকা বর্ষীয়সী মহিলা। ভারী শরীর, চোখে চশমা। মুখে অটল গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। বাসব কি পেশায় নিযুক্ত কার্ড দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দু'জনকে বসতে অনুরোধ করে বিস্ময়ভরা গলায় প্রশ্ন করলেন, আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন?

বাসব বলল, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আমরা দুঃখিত। বেশীক্ষণ বিরক্ত করব না। অনুগ্রহ করে বনানী সোমকে ডাকিয়ে পাঠান। তাঁর সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আছে।

—বনানী তো এখানে নেই।

—তিনি কি ছুটিতে আছেন?

—ওর ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। দু'মাস ছুটি নিয়েছিল বাড়ি যাবে বলে। সে সময় কবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখনও দেখা নেই।

—হয়ত অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আটকে পড়েছেন।

—আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম—প্রধান শিক্ষিকা বললেন, কিন্তু সম্প্রতি বনানীর কাকা বহু দিন ওর কোন খবরাখবর না পেয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছেন। তা থেকে বোঝা যায় ও বাড়িতে যায়নি।

বাসব উত্তেজনা দমন করে বলল, ওর কাকার ঠিকানাটা দিতে পারেন?

—পানাগড় স্টেশনের কাছেই থাকেন। নাম সুবিমল সোম।

—মিস্ সোম এখানে কোথায় থাকতেন? স্কুল হোস্টেলে?

—আমাদের স্কুলে হোস্টেল নেই। রামসেবক রোডের নদু দাসের বাড়িতে ও ভাড়া থাকে।

—আপনার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এবার উঠি—

বাসব ও শৈবাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর নমস্কার করে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিকেল চারটে নাগাদ চা পান শেষ করে বাসব বলল, নদু দাসের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে ডাক্তার। রেডি হয়ে নাও।

ওরা যখন রামসেবক রোডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছল তখনও সন্ধ্যা নামেনি। প্রায় নতুন একতলা বাড়ি। দরজার উপরে কাঠের ফলকে ইংরেজীতে লেখা শ্রীনদেরচাঁদ দাস। প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা।

কয়েকবার কড়া নাড়তেই কালো-কোলো নেয়াপাতি চেহারার এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

বাসব বলল, আমি নদুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

—বলুন। আমিই নদুবাবু।

—বনানী সোম কি এখানে থাকেন?

—থাকেন। কিন্তু আপনারা কে মশাই?

—ধরুন পুলিশের লোক।

চমকে তিন পা পিছিয়ে গেলেন নদু দাস—পুলিশ! সে কি মশাই? আমি নির্বিরোধ মানুষ। মিষ্টির ব্যবসা করে দিন চালাই—আমার বাড়িতে পুলিশ কেন?

—আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন দাসমশাই। আপনাকে কোন রকম আতান্তরে ফেলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। মিস সোম সম্পর্কে দু-চার কথা জেনে নিতে চাই শুধু।

—আমার ও সব ঝামেলায় কি দরকার মশাই। ভাড়া বাকি থাকলেও একটা কথা ছিল। ছ'মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে রেখেছে।

—ঘর তালা দেওয়া আছে বুঝি?

—না। আরতি চৌধুরী বলে আরেকটি মেয়ে আছে ওখানে। বাড়ির পিছন দিকে চলে যান না, তাহলেই তার দেখা পাবেন।

বাসব আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পিছন দিকের পথ ধরল।

আরতি চৌধুরী নিজের ঘরেই ছিলেন। বয়স প্রায় ত্রিশ ছুঁয়েছে। ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চলনসই মুখ। বাসবের পরিচয় পেয়ে তিনি ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ স্কুলেই প্রধান শিক্ষিকার মুখে তিনি শুনেছিলেন একজন গোয়েন্দা বনানীর খোঁজে এসেছিল।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর বাসবের মূল প্রশ্নের উত্তরে আরতি জানালেন, স্যুটকেস হাতে নিয়ে পানাগড় যাচ্ছে বলে বনানী সেই যে বেরিয়ে গেছে তারপর মাস আড়াই তার আর কোন খবর নেই। পানাগড়ে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু আজ পর্যন্ত উত্তর আসেনি।

—আপনারা দুজন কতদিন এখানে একসঙ্গে আছেন?

—প্রায় দু'বছর হবে।

—আচ্ছা মিস সোমের সঙ্গে কোন ইয়ংম্যানের ঘনিষ্ঠতা ছিল কি? কেউ কি কখনও এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে?

—মৃণাল বলে যে ছেলেটি খুন হয়েছে সে বনানীকে ইদানিং বেশ বিরক্ত করছিল। একদিন এখানে এসেও ছিল।

—তহ্লে অন্য কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না?

একটু ইতস্ততঃ করে আরতি বললেন, ছিল বোধহয় একজনের সঙ্গে। তবে তার নাম আমি জানি না।

—কি করে বুঝলেন?

—এখান থেকে যাবার আগের দিন বনানী আমায় বলেছিল যে, ছুটি শেষ করে এসেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে। পছন্দ-করা মানুষটির সঙ্গে শীগগীরই ওর বিয়ে হচ্ছে।

এরপর বাসব যে প্রশ্ন করল তাতে আরতি চৌধুরী অবাক হয়ে গেল।

—মিস সোমের সঙ্গে আপনি একবার চটি কিনতে বাজারে গিয়েছিলেন?

—চটি কিনতে—?

—হ্যাঁ, ধরুন মাস ছয়েক আগে। মনে করে দেখুন তো—

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমায় কেন এত প্রশ্ন করছেন বুঝতে পারছি না। বনানীর কি হয়েছে?

—তাঁর কি হয়েছে জানবার জন্যই আপনাদের প্রশ্ন করছি। সময় হলেই সমস্ত প্রকাশ পাবে। আমি ওর ঘরখানা একবার দেখতে চাই—

আরতি চৌধুরী ওদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে বিশেষ আসবাব নেই। চৌকি, চেয়ার, টেবিল ছাড়া আছে দেওয়াল আলমারি। আলমারি খুলে দেখা হল। সম্পূর্ণ খালি।

টেবিলের দেরাজটা টানতেই খুলে গেল। ভেতরে পিন আটকানো এক তাড়া কাগজ রয়েছে। বাসব কাগজের তাড়াটা হাতে তুলে নিল। অধিকাংশই ঘর ভাড়ার রসিদ। এছাড়া আছে একটা প্রেসক্রিপসান। লেটারহেড দেখে বুঝতে পারা যায় জনৈক ডাঃ কে. কে. শ্রীবাস্তব এই প্রেসক্রিপসান দিয়েছেন।

বাসব প্রেসক্রিপসানটা পকেটস্থ করে ঘরখানা আরেকবার খুঁটিয়ে দেখে নিল। ঘরের পুবদিকের কোণে কুঁজো রাখা ছিল। কুঁজোর মুখ গেলাস দিয়ে ঢাকা। আরতি চৌধুরী ঘরের মধ্যে ঢোকেননি। দরজার সামনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, ওই কাচের গেলাস কি শুধু মিস সোম ব্যবহার করতেন, না, আপনিও—?

—আমি কখনও ও গেলাস ব্যবহার করিনি।

—ঠিক আছে আমি গেলাসটা নিয়ে যাচ্ছি। পরে পাঠিয়ে দেব।

গেলাসটা রুমালে মুড়ে সঙ্গে নিল বাসব। তারপর আরতি চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা পথে নামল। রিক্শায় চেপে দুজনে হোটেলের দিকে ফিরে চলল।

হোটেলে পা দিতেই প্রিয় নাগের সঙ্গে দেখা। মোলায়েম হাসিতে মুখ ভাসিয়ে তিনি বললেন, আপনাদের যে একটু খাতির-যত্ন করব তার উপায় নেই। যখন-তখন বাইরে যাচ্ছেন—।

বাসব মৃদু হেসে বলল, কি করব বলুন? দায়িত্ব ঘাড় থেকে নামাতে হবে তো। ভালো কথা, নাগমশাই, ডাঃ শ্রীবাস্তব কি এখানকার নাম-করা ডাক্তার?

—বিরাট নাম-করা কিছু নয়। তিনি একজন গায়নোকোলজিস্ট। মেয়েদের রোগ-জ্বালা নিয়েই তাঁর কারবার।

—কোথায় ডিসপেন্সারি?

—রূপনাথ রোডে। এখান থেকে মিনিট দশেকের পথ।

প্রিয় নাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠতে লাগল। অর্ধেক ওঠার পর বাসব বলল, ডাক্তার, তুমি ঘরে যাও। আমি ইন্সপেক্টারের সঙ্গে ফোনে একটা কথা সেরে আসি।

শৈবাল ঘরে চলে গেল। বাসব এল মিনিট দশেক পরে। কোট হুকে টাঙিয়ে রেখে, টাই নট আলগা করতে করতে বলল, তোমায় বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়, এই কেস আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও, কোথাও একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে—তুমি শুনলে খুশি হবে ডাক্তার, আমরা প্রায় সেই ফাঁকের কিনারায় এসে উপস্থিত হয়েছি। ঝাঁপ দিলেই হয়।

—অর্থাৎ—

—সকালে যোগমায়া গার্লস থেকে ফেরার পথে ভেবেছিলাম পানাগড়ে গিয়ে বনানী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। এখন মনে হচ্ছে তার কোন প্রয়োজন নেই। সবকিছুর সমাধান এখানেই পাব।

—তোমার বক্তব্য সরল হল না। শুধু হেঁয়ালীর জালই বুনে চলেছ।

—আমাকে আরো একটু গুছিয়ে নিতে দাও। তারপর তোমার কাছে আর কোন কিছুই হেঁয়ালী থাকবে না। এখন প্রেসক্রিপসানটা দেখ তো—ডাঃ শ্রীবাস্তব কোন্ রোগের ওষুধ দিয়েছেন?

বাসব কোটের পকেট থেকে প্রেসক্রিপসান বার করে শৈবালের হাতে দিল। শৈবাল দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, এ কি! বনানী সোম প্রেগনেণ্ট ছিলেন না কি! এ ওষুধ সাধারণত দেওয়া হয় বাচ্চা হবার সময় প্রসূতির যাতে কোন কষ্ট না হয়।

—হুঁ, আমারও মন বলছিল, প্রেগনেণ্ট অবস্থাতেই বনানী সোম এখান থেকে উধাও হয়েছে।

এই সময় দরজায় কে যেন নক করল, দরজা খুলে দেখা গেল একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একখানা বড় সাইজের খাম। কনস্টেবল সেলাম ঠুকে বলল, ইন্সপেক্টার সাহেব এই খাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাসব খামখানা নিয়ে বলল, ঠিক আছে।

ওরা আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

—খামের মধ্যে কি আছে? শৈবাল প্রশ্ন করল।

—একজনের ফিঙ্গার-প্রিণ্ট। ফোন করে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না, গাঁই-গুঁই করছিল ইন্সপেক্টার। এই অসহযোগিতার জন্য আমি কি করতে পারি তা জানিয়ে দিতেই কাজ হয়েছে।

শৈবাল বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাসব যে আর কিছু বলবে না তা বুঝতে পারা যায়। ও স্যুটকেস থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বার করে বনানী সোমের ঘর থেকে আনা কাচের গেলাসটা নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবাস্তবের ডিস্পেন্সারিতে এল। নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কথা আরম্ভ করল ডাক্তারের সঙ্গে। প্রৌঢ় শ্রীবাস্তব একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও সজ্জন হিসাবে সুনাম আছে পরিচিত মহলে। তিনি প্রেসক্রিপসানটা নেড়ে-চেড়ে বাসবের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

—বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাঃ শ্রীবাস্তব, বাসব বলল, ভালো করে চিন্তা করে আমায় যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলেন।

—চিন্তা করার কিছু নেই। আমার পরিষ্কার মনে আছে। তখন রাত প্রায় ন'টা। আমি চেম্বার ছেড়ে বেরুচ্ছি এমন সময় একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিযে মহিলাটি এলেন। আমি তাঁকে পরীক্ষা করে জানলাম, প্রেগনেন্সি বেশ কিছুদিন হল গ্রো করেছে।

—তারপর?

—ওঁরা দুজনেই বাচ্চা নষ্ট করে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। আমি দুজনকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু ওঁরা নিজেদের গোঁ ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত আমাকে ওষুধ দিতে হল।

—কিন্তু আপনি তো বাচ্চা নষ্ট করাব ওষুধ দেননি?

মৃদু হেসে শ্রীবাস্তব বললেন, হ্যাঁ, তা দিইনি। আমি মানুষের জীবন বাঁচাবাব ব্রতে নিযুক্ত আছি মিঃ ব্যানার্জী, তাই বাধ্য হয়েই ওঁদের ব্লাফ দিতে হয়েছিল।

—ওই মহিলা কিংবা ভদ্রলোককে আপনি চেনেন?

—মহিলাটিকে চিনতাম না তবে ভদ্রলোককে এখানে-ওখানে দেখেছি কযেকবার। পরে আমার কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে দুজনের পরিচয় পেয়েছিলাম। ও ছোকরা শহরের অনেক খবর রাখে।

বাসব কিছু বলতে যাবার আগে টেলিফোন বেজে উঠল।

শ্রীবাস্তব রিসিভার তুলে নিলেন, হ্যালো—ওয়ান মোমেণ্ট প্লীজ—আপনার ফোন মিঃ ব্যানার্জী।

প্রিয় নাগ ছাড়া তো আর কেউ জানে না ওরা এখানে এসেছে। নিশ্চয় তিনিই ফোন করছেন। বাসব ভাবল, কিন্তু কেন?

বাসব রিসিভার নিয়ে বলল, কে নাগমশাই...কি ব্যাপার..থানা থেকে জরুরী তলব...সংবাদটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ...আমরা এখুনি যাচ্ছি...

বাসব রিসিভার নামিয়ে শ্রীবাস্তবকে বলল, এখন উঠলাম। আমাদের কথা কিন্তু শেষ হল না ডাঃ শ্রীবাস্তব। আবার বিরক্ত করতে আসব।

—স্বচ্ছন্দে আসবেন। আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হব না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুজনে থানায় পৌঁছল।

ইন্সপেক্টার নিজের চেয়ারেই উপবিষ্ট ছিলেন। ওদের দেখে হাসি মুখে বললেন, আসুন—আসুন। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।

—বিশেষ কিছু ঘটেছে নাকি?

—তা বিশেষ বই কি। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

—বলেন কি?

ইন্সপেক্টারের হাসি বিস্তার লাভ করল।—সে কথা বলতেই তো আপনাদের ডেকে পাঠালাম। স্থানীয় মানুষেরা আমাদের বড় বেশি আণ্ডার-এস্টিমেট করে ফেলেছিল। কিন্তু দেখছেন তো, আমরাও কাজ করতে জানি।

তারপর ইন্সপেক্টার যা বললেন তার সারমর্ম হল, মৃণালের ঘড়িআংটি ইত্যাদি অপহৃত হয়েছে লক্ষ্য করে প্রথম থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছিল, তাকে হত্যা করবার পর হত্যাকারীরা ওগুলো নিয়ে চম্পট দিয়েছে। দেবব্রতবাবু ও চুনীলাল দুর্ঘটনাস্থল থেকে পালাতেও দেখেছিলেন দুজন লোককে। ইন্সপেক্টারের সেই সমস্ত দোকানের উপর খর দৃষ্টি ছিল যেখানে মাঝে-মধ্যে চোরাই মাল বিক্রী হয়। গতকাল সন্ধ্যায় এই রকমই এক দোকানে মৃণালের ঘড়ি, আঁটি, কলম ইত্যাদি বিক্রী করতে এসে দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

—তারা কারা?

—দুর্ঘটনা-স্থলের কাছাকাছি এক গ্রামের অধিবাসী।

বাসব হাল্কা গলায় বলল, আপনাদের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, ওরা বোধহয় আসল অপরাধী নয়। বড় জোর ওদের মৃতব্যক্তির জিনিস-পত্র চুরির দায়ে কোর্টে নিয়ে যেতে পারেন।

মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল ইন্সপেক্টার ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিছুটা উপেক্ষার ভঙ্গিতেই তিনি বললেন, আপনার হঠাৎ এ ধারণার কারণ?

—ধারণা নয়, বিশ্বাস। আমি জানি হত্যাকারী এখনও ধরা পড়েনি। তাকে আমি প্রায় চিনে ফেলেছি। হয়ত কালই আর সকলকে চিনিয়ে দেব।

ইন্সপেক্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। তারপর তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এই সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন ইন্দ্রনাথ। অফিসিয়াল ড্রেসেই তিনি এখন সজ্জিত। তাঁকে কিছুটা ব্যস্ত-সমস্ত মনে হচ্ছে। ইন্সপেক্টারের দিকে তাকিয়ে তিনি দ্রুত গলায় বললেন, ওদের কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারলেন?

—ওরা কিছুই বলছে না স্যার। শুধু হাউ হাউ করে কাঁদছে। তবে ইনি বলছেন ওরা ছিঁচকে চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইন্সপেক্টার বাসবের পরিচয় দিলেন এবং ইন্দ্রনাথের পরিচয়ও বাসবকে জানিয়ে দিতে ভুল করলেন না।

ইন্দ্রনাথ বললেন, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। এখানে তদন্তে এসেছেন তাও আমার জানা। আলাপ হওয়ায় খুশি হলাম। আপনি কি বলছেন, ওরা প্রকৃত হত্যাকারী নয়?

বাসব মৃদু গলায় বলল, না। কিছু মনে করবেন না, এখানকার পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট এই কেসটিকে সঠিকভাবে তদন্ত করবার চেষ্টা করেননি। অর্থাৎ মৃণালের খুন হওয়াই মূল কথা নয়। এই খুনের নেপথ্যে যে সমস্ত ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আপনারা একেবারেই খোঁজ-খবর করেননি। খোঁজ করলে দেখতে পেতেন মূল চক্রান্ত কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝলাম না। মূল চক্রান্ত বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

—যে ভৌতিক ব্যাপার এখানে ঘটছিল। এমন কি, আপনিও যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী সে বিষয়টিও—

বাসবকে বাধা দিয়ে ইন্সপেক্টার বললেন, সে এক অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা। তার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?

—অত্যন্ত নিবিড়, তাই তো বলছিলাম, আপনারা পরিবেশকে খুঁটিয়ে দেখেননি। এরপর আসছে যোগমায়া গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী বনানী সোমের কথা। তিনি আজ কয়েক মাস থেকে নিখোঁজ। পর পর ঘটনাগুলিকে এক সূত্রে বেঁধেই আমি রহস্যকে তরল করে এনেছি।

—বনানী সোম নামে শিক্ষয়িত্রী কেউ যে নিখোঁজ হয়েছেন, কই আমরা তো কিছু জানি না।

—আমি কিন্তু জেনেছি। অনুসন্ধান করলে আপনারাও জানতে পারতেন।

ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি জানেন হত্যাকারী কে?

—জানি বলতে পারেন।

—কে সে?

—আজ নয়। কাল তাকে চিনিয়ে দেব। এখন চলি। এস ডাক্তার—

বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

রাত তখন অনেক কিংবা ভোর হয়ে আসছে—বাসব অবিরাম পায়চারি করে চলেছে। থানা থেকে বেরিয়ে সে আবার গিয়েছিল ডাঃ শ্রীবাস্তবের চেম্বারে। অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করেছিল তাঁর সঙ্গে। তারপর হোটেলে ফিরে স্যুটকেস থেকে যন্ত্রপাতি বার করে নানা পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

এক সময় পায়চারি থামিয়ে বাসব শৈবালকে গিয়ে ধাক্কা দিল। শৈবাল বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল, কি হল?

বাসব একটা ফিঙ্গার-প্রিণ্টের প্লেট দেখিয়ে বলল, এটা দেখছ?

—ওটা তো মৃণালের ফিঙ্গার-প্রিণ্ট।

—না। অন্য একজনের। এটা সকালে থানায় পাঠিয়ে একজনের প্রিণ্টের সঙ্গে মেলাতে হবে। যদি মিলে যায় তাহলে এই কেসের সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল জানবে।

—তুমি কোথা থেকে এই প্রিণ্ট সংগ্রহ করলে?

—বনানী সোমের ঘর থেকে যে কাচের গেলাস এনেছিলাম তা থেকেই প্রিন্টটা তুলেছি।

—তার মানে ওই আঙুলের ছাপ বনানী সোমের। কিন্তু পুলিশ তো তার বিন্দু-বিসর্গ খোঁজ রাখে না। এই প্রিন্টের সঙ্গে তারা কার হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখবে?

—ওখানেই তো রহস্য ডাক্তার। তারই কিনারা হয় কিনা দেখবার জন্য পুলিশের কাছে এটা পাঠাতে হবে। তবুও একটা খিঁচ রয়ে যাচ্ছে।

—কি রকম?

বাসব সে কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, আমার মনে হয় এ সমস্যার চাবিকাঠি তপনবাবুর কাছে আছে। কারণ তিনিই হলেন মৃণালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চল ডাক্তার, বেরিয়ে পড়া যাক।

সবিস্ময়ে শৈবাল বলল, এই মাঝ রাতে?

—জানলা বন্ধ বলে তুমি বুঝতে পারছ না। পাঁচটা প্রায় বাজে। উঠে পড়। সঙ্গে চাবির গোছাটা নিতে ভুলো না যেন।

—চাবি আবার কি হবে?

তপনের বাড়িতে যাবার আগে আরেকজনের বাড়ি যেতে চাই। গৃহস্বামীর অজান্তেই বাড়িতে ঢোকার আমার ইচ্ছে। চল, রাস্তায় তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে বলছি।

দশ মিনিটের মধ্যে দুজনেই তৈরি হয়ে নিল। বাসবের বহুদিনের সাথী নানা ধরনের তালা খোলার চাবির গুচ্ছ ও ফিঙ্গার-প্রিন্টের কপিটা সঙ্গে নেওয়া হল। ওরা যখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন সবে আবছাভাবে আলো ফুটছে।

হোটেলের একুশ নম্বর ঘরখানা খালি ছিল। পূর্ব ব্যবস্থামত প্রিয় নাগ যে যেমন আসছেন তাঁকে নিয়ে গিয়ে সেই ঘরে বসাচ্ছেন। বাসব পুলিশকে জানিয়ে রেখেছে আজ সন্ধ্যায় সে এই রহস্যের উপর যবনিকা ফেলে দেবে। সমস্ত দুপুর ঘুরে ঘুরে ও সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে হোটেলে।

সাতটার মধ্যে সকলেই এসে পড়লেন—উমেশ ধর, দেবব্রত, নির্মল, রজত লাহিড়ী, অরুণ সরকার, তপন এবং যোগমায়া গার্লসের প্রধান শিক্ষিকা। সব শেষে এলেন ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রনাথ। আর সকলের মতো তিনিও কৌতূহলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। সকলে এসেছেন সংবাদ পেয়ে বাসব ও শৈবাল একুশ নম্বর ঘরে চলে এল।

বাসবকে দেখে সকলে নড়ে-চড়ে বসলেন। কেউ কিছু বলার আগেই বাসব বলল, আপনাদের মূল্যবান সময় এইভাবে নষ্ট করার জন্য আমি মর্মাহত। তবে আপনাদের আর আমি বিরক্ত করব না কারণ তদন্ত শেষ হয়েছে। এখন তারই বিস্তৃত বিবরণ এবং হত্যাকারীকে চিনিয়ে দেওয়াই হল আমার উদ্দেশ্য। জীবনে আমি অসংখ্য কেসের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছি। তবে বলতে বাধা নেই এরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ কেস আমার হাতে কমই এসেছে। এবার মূল কথায় আসা যাক।—

বাসব একটু থামল। সকলে উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ও বলতে আরম্ভ করল, আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল মৃণালের হত্যার তদন্ত করবার

জন্য। কাজে নামবার পরই আমি বুঝলাম এই হত্যাই মূল কথা নয়, রহস্য আরো গভীরে নিহিত। একটা ভৌতিক ব্যাপার শহরের মানুষকে সচকিত করে রেখেছিল। মাসকয়েক আগে যে তরুণী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিল, সাধারণের বিশ্বাস তারই প্রেতাত্মা এইভাবে দেখা দিচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ সেই তরুণীর পরিচয় সংগ্রহ করতে পারেনি। এমন কি, ওই হত্যার সঙ্গে মৃণালের হত্যাকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকতে পারে তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করল, আমার তদন্ত পদ্ধতি অবশ্য অন্য ধরনের। নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ প্রতিবারই আমি সংগ্রহ করে থাকি। সেই সূত্রেই জানতে পারি মৃণাল একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে এই হোটেলের সংলগ্ন রেস্টুরেন্টে বারদুয়েক এসেছিল। প্রিয় নাগ আমায় জানালেন তরুণী স্থানীয় যোগমায়া গার্লসের শিক্ষিকা বনানী সোম। স্কুলে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেল, বনানী ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও কাজে যোগ দেয়নি। এমন কি তার কাকা বহুদিন কোন সংবাদ না পেয়ে স্কুলে চিঠিও দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বনানী বাড়ি যায়নি কিন্তু মালিচক ছেড়ে গেছে। তার বাসায় হানা দিয়ে চারটে বিষয় জানা গেল। এক, তার একজন প্রেমিক ছিল। দুই, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তিন, সে প্রেগনেন্ট ছিল। চার, স্থানীয় ডাঃ শ্রীবাস্তব তার ট্রিটমেন্ট করছিলেন। এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার পর ব্যাপারটা আমার কাছে কিঞ্চিৎ সহজ হয়ে এল। আমি বনানীর ব্যবহার করা একটা কাচের গেলাস নিয়ে এসে তার থেকে আঙুলের ছাপ তুললাম। কয়েকমাস আগে নিষ্ঠুরভাবে নিহত সেই তরুণীর আঙুলের ছাপ পুলিশ রেকর্ডে ছিল। তার সঙ্গে বনানীর ফিঙ্গার-প্রিন্ট হুবহু মিলে গেছে। এমন কি, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুসারে সে মেয়েটিও প্রেগনেন্ট ছিল।

যোগমায়া গার্লসের প্রধান শিক্ষিকার গলা চিরে আর্তরব বেরিয়ে এল, তার মানে বনানী...বনানী খুন হয়েছে!

—হ্যাঁ। বাসব জবাব দিল।

—এর পর ভৌতিক ব্যাপারটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা বিরাট ফাঁক আছে। মৃণালের ঘর সার্চ করলাম। পাওয়া গেল একটা স্পিরিট গামের শিশি এবং দুখানা বাহারে শাড়ি। নতুন নয়, ব্যবহার করা। আমার চিন্তা স্বাভাবিক কারণেই মোড় নিতে আরম্ভ করল। মৃণাল বদ সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাঁকা পথ দিয়ে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা ছিল তার।

প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন উমেশ ধর, বলেন, কি? ছোঁড়াটা এইভাবে বয়ে যাচ্ছিল! আমি তো কিছুই জানি না।

—চোখ বন্ধ রেখে কারুর গার্জেনগিরি করা যায় না ধরমশাই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বনানীর প্রেমিক কিন্তু মৃণাল ছিল না। বনানী গুণ্ডা প্রকৃতি মৃণালের ভয়ে বাধ্য হয়ে দুদিন রেস্টুরেন্টে এসেছিল। তপনবাবুর মুখে শুনেছি মৃণালের কোন বদ মতলব ছিল না, সে সত্যিই মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সে ক্রমে জানতে পারে বনানীর

একজন প্রেমিক আছে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বনানীই হয়ত তাকে একথা বলেছিল। এর কিছুদিন পরে আবিষ্কৃত হল সেই থেঁতলানো তরুণীর মৃতদেহ। পুলিশ মৃতার পরিচয় সংগ্রহ করতে না পারলেও, মৃণাল বুঝতে পেরেছিল এই দেহ কার। জড়িয়ে পড়ায় ভয়ে সে পুলিশকে কিছু জানায়নি। কিন্তু তার বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে অপরিচিত হত্যাকারীকে ধরবার জন্য এক পরিকল্পনা খাড়া করল। মৃতা তরুণী ভূত হয়ে বার বার দেখা দিচ্ছে এ-সংবাদ প্রচারিত হবার পর হত্যাকারী নিশ্চিত একদিন দেখতে আসবে সত্যি বনানী কি না। তখন—! তবে কি মৃণাল কোন মেয়েকে ওইভাবে ভূতের অভিনয় করতে ওখানে পাঠাত এবং নিজে থাকত কাছাকাছি কোথাও পাহারায়? তাই কি তার আলমারিতে দুখানা শাড়ি পাওয়া গেছে? কিন্তু ওই স্পিরিট গামের শিশি আমাকে ওই চিন্তা থেকে মুক্তি দিল। স্পিরিট গাম মানুষ কাজে লাগায় যাত্রা-থিয়েটারে ক্রেপের সাহায্যে মেক-আপ নেবার জন্য। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে খেলে গেল, মৃণাল দেখতে সুশ্রী ছিল, তার উচ্চতা খুব বেশি ছিল নাত—তবে কি—

নির্মল দ্রুত গলায় বলে উঠল, আপনি কি বলতে চাইছেন?

—বুঝতে পেরেছেন মনে হচ্ছে। পোড়োবাড়ির একটা ঘরে দুজন লোকের যাতায়াতের চিহ্ন আমি দেখেছিলাম। একজোড়া জুতো এবং একজোড়া চটির ছাপ তুলে এনেছিলাম। মিলিয়ে দেখেছি দুজোড়াই মৃণালের পায়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। অর্থাৎ দুজন নয়, একা মৃণালই কখনও জুতো, কখনও চটি পরে ওঘরে যেত। সবই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছিল, শুধু একটা জিনিসের সন্ধান পেলাম না। নিশ্চয় মৃণাল কিছু কিছু জিনিস অন্য কারুর কাছে রাখত। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে তপনবাবু। তাঁর কাছে কি?—যদি তাই হয় তাহলে তিনি আমার কাছে অনেক কথা চেপে গেছেন। আজ খুব সকালবেলা আমি ও ডাক্তার গেলাম তাঁর কাছে। প্রথমে বলতে চাননি। চাপ দেবার পর বললেন সব কথা। কলকাতা থেকে আনানো দামী খোঁপা-বালা-পরচুলাটাও দেখালেন। তপনবাবু এবার আপনি ও সম্পর্কে কিছু বলুন।

তপন একটু ইতস্ততঃ করে বলল, মৃণালের মাথায় কিভাবে যে এই কুবুদ্ধি ঢুকেছিল জানি না। ও আমাকে একদিন বলল, বনানীর হত্যাকারীকে ধরতে গেলে মেয়ে সেজে রাত-বেরাতে দেখা দিতে হবে। আমাকে মানাবেও। বনানী মরে ভূত হয়ে দেখা দিচ্ছে হত্যাকারী নিশ্চয় বিশ্বাস করতে চাইবে না। ফলে সরেজমিন তদন্ত করতে সে আসবেই একদিন। আমি যদি একবার তাকে চিনে ফেলতে পারি তাহলে প্রতিশোধ নিতে অসুবিধা হবে না।

—তারপর? ইন্দ্রনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

—ওর এই পরিকল্পনায় আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম। ও আমাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করবার পর রাজী হলাম। একা যেতে ওর সাহস হচ্ছিল না বলে প্রথম দুদিন গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। পোড়োবাড়িটার কাছে লুকিয়ে থাকতাম আমি। ও একজনকে ভুলিয়ে আনার পর আমরা অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতাম শহরে। ক্রমে ওর ভীষণ সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তখন একাই যেত।

বাসব বলল, এবার আবার আমি পুরনো কথার খেই ধরতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মৃণাল প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজে খুন হল কেন? বনানী কেন খুন হল তা অবশ্য জলের মতো পরিষ্কার। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা দায়দায়িত্ব নিতে বড় ভয় পায়। অথচ মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাবার জন্য লালায়িত। আবার কাজ মিটে গেলে বুকে ছুরি মারতেও এরা পেছপা হয় না। আমাদের এই হত্যাকারী সেই শ্রেণীর। বনানীকে সে নিজের ইচ্ছামত উপভোগ করেছে, কিন্তু প্রেগনেণ্ট হবার পর দায়িত্ব এড়াবার এবং নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্য রক্তাক্ত এক পরিকল্পনা খাড়া করতে দেরী করেনি। বনানী নিশ্চয় বিয়ে করবার জন্য চাপ দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, হত্যাকারী এক কথায় রাজী হয়ে গিয়ে হয়তো পরিকল্পনা করেছিল, দুজনে বাইরে কোথাও গিয়ে বিয়ে করে ফিরে আসবে। সরল মনে বনানী নিজের জিনিসপত্র নিয়ে প্রেমিকের বাসায় চলে আসে। তারপরই সংঘটিত হয় সেই হত্যাকাণ্ড। চতুর হত্যাকারী মৃতার পরিচয় গোপন করার জন্য তার মুখ বিকৃত করে দেহ ফেলে দিয়ে আসে সুলতানপুর রোডে।

এবার মৃণালের কথায় আসা যাক। যথানিয়মে হত্যাকারী কৌতূহল দমন করতে না পেরে মৃতা তরুণীর ছদ্মবেশে মৃণালকে একদিন দেখে এল। তবে চিনতে পারল না। এদিকে মৃণাল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার জন্য আমারই মতো এক পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিল। পুলিশী সূত্রে জানা গেছে অজ্ঞাতপরিচয় তরুণী অর্থাৎ বনানী প্রেগনেণ্ট ছিল। সুতরাং তাকে নিজের শরীরের জন্য কোন-না-কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল। সে সেই ডাক্তারকে খোঁজাখুঁজি করতেই ডাঃ শ্রীবাস্তবের সন্ধান পেল। শ্রীবাস্তব আমার কাছে স্বীকার করেছেন, শহরের হিরো মৃণালকে মিথ্যা কথা বলতে তিনি সাহস করেননি।

এরপর হয়ত মৃণাল বনানীর প্রেমিককে প্রথমে হত্যাকারী ভাবেনি। তাকে বাজিয়ে দেখবার জন্য তার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ হত্যাকারীর মনে হয়েছিল মৃণাল আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে এবং ওকে ফাঁসানোই ওর উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পথের কাঁটা অবিলম্বে তুলে ফেলতে হবে। আমার মনে হয় হত্যাকারী নিজের আবাস-স্থলেই আচমকা মৃণালকে আঘাত করে বসে। তারপর তার সংজ্ঞাহীন দেহ উমেশবাবুর গাড়িতে চাপিয়ে হাইওয়ের পার্শ্ববর্তী ওই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় নিয়ে যায়।

মৃণাল মামার গাড়ি চড়ে ওর কাছে গিয়েছিল বলে অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। কাজ সেরে হত্যাকারী গাড়িখানা নির্জন রাজেন্দ্র রোডে ফেলে চম্পট দেয়।

একটানা এতখানি বলবার পর বাসব থামল। মূল প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য মনের মধ্যে আঁকপাঁক করতে থাকলেও মুখে কারুর কথা নেই। বাসব প্রায় এক মিনিট চুপ করে থেকে আবার নিজের কথার জের টানল, আমি যখন দ্বিতীয়বার ডাঃ শ্রীবাস্তবের কাছে যাই তখন জানতে পারি, বনানীর সঙ্গীটির নাম। বলা বাহুল্য, এখানে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও তিনি কিন্তু বনানী বা সেই অজ্ঞাতনামা মেয়েটির পরিচয় তাঁর জানা আছে এরকম কথা আমাকে বলেননি। সন্দেহ ঘনীভূত হল। আজ সকালে তপনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পূর্ব-পরিকল্পনা

মতো আমি আড়ালে থেকে ডাক্তারকে পাঠালাম সেই ব্যক্তির বাসায়। ডাক্তার গিয়ে বললেন, আমি বিশেষ প্রয়োজনে এখুনি একবার তাকে হোটেলে ডেকেছি। সরল মনে সেই ব্যক্তি ডাক্তারের সঙ্গে হোটেলের পথে রওয়ানা হল। সহজেই আমি তখন কৌশলে সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকি, ওবাড়িতেই আমি খুঁজে পেয়েছি বনানীর জিনিসপত্র সমেত দুটো স্যুটকেস। এছাড়া পাওয়া গেছে মোটরে স্টার্ট দেবার ভারী হ্যাণ্ডেল। ওটা দিয়েই বনানীর মুখ থেঁতলানো এবং মৃণালের মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। সাদা চোখে ধরা না পড়লেও, পরীক্ষা করলেই জানতে পারা যাবে ওর সর্বাঙ্গ রক্তকণিকায় ভরপুর।

ইন্দ্রনাথ বললেন, কিন্তু আপনি তো এখনও হত্যাকারীর নাম বলছেন না।

—এইবার বলব। আচ্ছা, কিছুদিন আগে আপনার মোটরের হ্যাণ্ডেল হারিয়েছিল কি?

—হ্যাঁ। আপনি জানলেন কিভাবে?

—হত্যাকারীর বাসায় হ্যাণ্ডেলের উপস্থিতি একথা আমায় জানিয়ে দিয়েছে। আপনি অবাক হবেন অবশ্য তবু বলতে হচ্ছে, আপনার গাড়িতেই বনানীর মৃতদেহ সুলতানপুর রোডে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকারীকে আপনি মাঝে মাঝে নিজের গাড়ি ব্যবহার করতে দিতেন, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে তার উপায় ছিল না।

বিস্মিত ইন্দ্রনাথ অসংলগ্ন গলায় বললেন, আমি কিন্তু—

—এখনও বুঝতে পারছেন না। তাই না? কথাটা শেষ করেই বাসব দ্রুত উঠে দাঁড়াল, পালাবার চেষ্টা করবেন না রজতবাবু।

সকলে দ্রুত দৃষ্টি ঘোরালেন। দরজার প্রায় কাছাকাছি হতবুদ্ধি অবস্থায় রজত দাঁড়িয়ে আছে। বার্ণবাল প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন তার কাছে।

—অনেক রক্ত মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আপনি ভাবতে পারেননি এই পথেরও শেষ আছে। ইন্সপেক্টার, বনানী ও মৃণালের হত্যাকারী হিসাবে ওঁকে আপনি স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন। ওঁর বাসা তল্লাসী করলেই আপনি প্রয়োজনীয় প্রমাণগুলি পেয়ে যাবেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন ঘরে ফিরতে চাই। এস ডাক্তার—।

আর কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে।

পায়ে পায়ে মরণ

রেবতী সেন ডিভানের কাছ থেকে সরে এলেন।

স্টেথিসকোপ মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, কিছু মনে কববেন না মিঃ রায়। অসুখ বাতিকটা এবার আপনাকে ছাডতে হবে, নইলে সত্যি একদিন বড় অসুখে পড়ে যাবেন।

রামপ্রসাদ ডিভান থেকে উঠে ড্রেসিংগাউন ঠিক করে নিলেন।

বললেন তারপর, বাতিক নয় ডাক্তার। বুড়ো হয়েছি তো—মনের জোর কমে গেছে, একটুতেই ঘাবড়ে যাই।

কথা শেষ করেই তিনি হাসলেন।

—এখন তাহলে ভালই আছি বলছো?

—আমি তো খারাপ কিছু দেখলাম না। যেমন চলা উচিত, অর্থাৎ বয়সের অনুপাতে আপনি ঠিকই চলেছেন। তবে—

—তবে?

—আমি আপনাকে কিছুদিনের জন্য চেঞ্জে যাবার পরামর্শ দেব! মনের আনইজি ভাবটা এতে নিশ্চিতভাবে কেটে যাবে।

—মন্দ বলনি। বহুদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি কলকাতার বাইরে। কিন্তু এত কাজের বোঝা কার ঘাড়ে চাপিয়ে যাই বলতো?

ডাঃ রেবতী সেন সিগারেট ধরালেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দায়িত্বের এত বোঝা আপনি এখনও কেন নিয়ে রেখেছেন, আমি একেবারেই বুঝে উঠতে পারি না মিঃ রায়। ও সমস্ত ছেড়েছুড়ে এবার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।

—তুমি ঠিকই বলেছো ডাক্তার। এত দায়িত্ব নিয়ে দিনের পর দিন আমার কাটিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। শুধু একটা ইচ্ছে পূরণেব আশা নিয়ে এখনও ওই সমস্ত নিয়ে রয়েছি।

—ইচ্ছাটা কি বলতে নিশ্চয় বাধা নেই?

—বলব তোমাকে। বিরাট এক পরিকল্পনা খাড়া করেছি। কাজে নামার পর তোমার সহযোগিতা আমার ভীষণ দরকার হবে। যাহোক, এখন একটু হাল্কা হবার চেষ্টাই করছি। দেখি, চেঞ্জের ব্যাপারে কতদূর কি করে ওঠা যায়।

আরো দুচার কথার পর ডাঃ সেন বিদায় নিলেন।

রমাপ্রসাদ বিচিত্র এক ভাগ্যের অধিকারী।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থের অভাবে লেখাপড়া নিয়মিত চালিয়ে যেতে পারেননি। জীবন-সংগ্রামে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল মাত্র উনিশ বছর বয়সেই। আসামের জোড়হাট শহরের এক প্রতিষ্ঠানে অল্পবেতনে চাকরি করেছিলেন বছর পাঁচেক।

হঠাৎ তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

তিনি ধাপে ধাপে উঠতে লাগলেন উপরে। সে সমস্ত দিনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর ইতিহাসের মধ্যে না গিয়ে, এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হবে যে, দৈবাৎ সুনজরে পড়ে গিয়েছিলেন বালিয়াড়ি টি এস্টেটের স্বত্বাধিকারী গৌর বসাকের।

ধনী, খামখেয়ালী গৌর বসাকের নিজের বলতে কেউ ছিল না।

বুদ্ধিদৃপ্ত অভিজাত দর্শন রমাপ্রসাদকে তিনি নিজের সন্তানের স্থান দান করলেন এবং ক্রমে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, নিজে বই পড়ে আর শিকার করে সময় কাটাতে লাগলেন।

সময় গড়িয়ে চলল। টি এস্টেটের কাজেকর্মে নিজের মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন রমাপ্রসাদ। নিজের ভাগ্যকে তিনি সময় সময় হিংসা করেন। এই রকম নিরুপদ্রব সোনায় মোড়া দিনেই সেই রক্তাক্ত ঘটনাটা ঘটল। গৌরবাবু শিকারে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় জঙ্গল থেকে আর ফিরে আসতে পারলেন না।

পরের দিন কয়েকজন কাঠুরে তাঁর রক্তাক্ত শরীর বয়ে আনল জঙ্গল থেকে। তখন দেহে প্রাণ ছিল না। উঁচু থেকে অর্থাৎ মাচার ওপর থেকে পড়ে যাওয়ায় ক্ষতগুলির সৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারা যায়। প্রবল রক্তপাতই মৃত্যুর কারণ। পুলিশ কিন্তু অন্য কথা বলল।

স্বাভাবিক কারণেই বডি মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, মাচা থেকে পড়ে যাওয়ার জন্য মৃত্যু হয়নি—মৃত্যুর জন্য দায়ী বুলেট। এর সরল অর্থ এই দাঁড়ায়, গুলির আঘাতে তিনি মাচার ওপর থেকে পড়ে যাওয়ায় শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সাদা কথায় তিনি খুন হয়েছেন।

তাঁর মত নির্বিরোধ ব্যক্তিকে কে খুন করল, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য গৌর বসাকের পরিচিত মহল দিশেহারা হলেন। পুলিশ জোর তদন্ত চালাল। কিন্তু রহস্য রহস্যই রয়ে গেল, হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না।

যথাসময়ে কলকাতা থেকে এটর্নি এলেন। জানা গেল, মাত্র কিছুদিন আগে গৌর বসাক যে উইল করেছিলেন, তাতে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছুই তিনি রমাপ্রসাদকে দান করেছেন। এ এক অভাবিত সৌভাগ্য। সহর্ষে রমাপ্রসাদ এই দান গ্রহণ করলেন। তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে।

টি এস্টেট অবশ্য এখন আর নেই। কিছুদিন পরেই এক ভাটিয়া ব্যবসাদারকে বিক্রি করে দিয়ে, ওখানকার সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতা চলে এসেছিলেন। তারপর বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করেছেন। অজস্র সাদা ও কালো টাকা ক্রমাগত তাঁর পকেটে এসেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আজ রমাপ্রসাদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।

অর্থের সাধনায় এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি রমাপ্রসাদ। যখন ক্লান্তি নেমে এল শরীরে—নিদারুণ একাকিত্ব মনকে পীড়া দিতে লাগল, তখন কিন্তু আর কিছু করার নেই। বয়স হয়ে গেছে। এই বয়সে বিয়ে করলে লোকে হাসবে।

নিজের বলতে বর্তমানে রমাপ্রসাদের কেউ নেই দুনিয়ায়। বছর পাঁচেক আগে

অবশ্য এক দূরসম্পর্কের ভাইপোকে এনে রেখেছেন। সম্পর্কটা এত দূরের যে, দস্তুরমত গবেষণা করে বার করতে হয়। এনে ভালই করেছেন, এক ডাকে যাকে ভাল বলা হয়, নিরুপম নিঃসন্দেহে সেই জাতের ছেলে। অবশ্য তাঁর মতে।

ডাঃ সেন চলে যাবার পর রমাপ্রসাদ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। টেলিফোনের ঝনঝনানিতে চটকা ভাঙল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

হ্যালো...নমস্কার কান্তিবাবু, কি খবর...বলেন কি...আপনি যখন বলছেন, তখন বিশ্বাস না করে উপায় নেই...ঠিক আছে, বাড়তি খরচ করতে আমি পেছুবো না...আপনি আর দেরি করবেন না, সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এখুনি চলে আসুন...আমার কোন অসুবিধে হবে না...

রিসিভার নামিয়ে রেখে রমাপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলেন। একতলার দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে তাঁর অফিস ঘর। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ এলে তিনি ওই ঘরে বসেই কথাবার্তা বলেন। অবশ্য ডালহৌসিতে কোম্পানির বিরাট অফিস আছে। সেখানে শ'তিনেক কর্মচারি নিযুক্ত থাকে নানা কাজে।

অফিস ঘরে ঢুকেই তিনি ইণ্টার-কমিউনিকেশন যন্ত্রের নব্ ঘোরালেন।

—অরূপ

ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, ইয়েস স্যার—

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অরূপ দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। দীর্ঘ ও সতেজ দেহের অধিকারী সে। মুখের লালিত্য মনকে আকর্ষণ করে। অরূপ রমাপ্রসাদের একান্ত সচিব।

—এই যে, এসে গেছ। আজই হয়ত বেশ মোটা টাকার দরকার হতে পারে।

—কত টাকার চেক লিখে আনব?

—এ ব্যাপারে চেক কাটতে চাইছি না। উপরি টাকা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিলে, এই ফাঁকে কিছু কালোকে সাদা করে নেওয়া যেতে পারে।

অরূপ চুপ করে রইল।

রমাপ্রসাদ বললেন, কতদিন চেস্ট থেকে টাকা বার করিনি বল তো?

—সপ্তাহ তিনেক।

—ইদানিং তো ক্রমাগতই জমা করেছি। তার মানে চেস্টে এখন বেশ মোটা অ্যামাউন্টই আছে। দশ হাজার টাকা রেডি রাখ গিয়ে। দুপুরের দিকে আরো বার করতে হবে।

রমাপ্রসাদ ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে চাবি বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

অরূপ চাবি না নিয়ে ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হল?

—আমি একা সেফ খুলতে চাই না স্যার।

—কেন?

—এর সঙ্গে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত আছে স্যার। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

জোরে হেসে উঠলেন রমাপ্রসাদ— হিসাব নেই, এমন প্রচুর কালো টাকা সচরাচর ওই সেফে থাকে। তুমি সুযোগ পেয়ে বেশি টাকা সরিয়ে নিতে পার, এই বিশ্বাস আমার হতে পারে বলছ?

অরূপ চুপ করে রইল।

—এবার তোমায় একটা প্রশ্ন করছি, একমাত্র তুমিই জান আমি কিভাবে ব্ল্যাকমানি আর্ন করি। ইচ্ছে করলেই তো পুলিশের কানে এ সংবাদ তুলে দিতে পার। দাও নি কেন বল তো?

কি বলবে ভেবে পেল না অরূপ।

—মোটা টাকা মাইনে পাও বলে যে একাজ কর না, তা নয়। আসল কথা হল, মানুষ চিনেই তার ওপর নির্ভর করা আমার বৈশিষ্ট্য। আমি জানি, তুমি কি ধাতু দিয়ে গড়া। যাক, ও সমস্ত বিকারকে আর মনে প্রশ্রয় দিও না। চাবিটা তুলে নাও।

অরূপ সেফের চাবিটা তুলে নিল।

চাবিটা নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল—

—শোন—

—স্যার—

—মাঝে-মধ্যে তোমার নিশ্চয় মনে হয়, আমি দিনের পর দিন নানাভাবে এত টাকা যে জমিয়ে যাচ্ছি, তা নিয়ে কি করব?

খেয়ালী মনিবের স্বভাবের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত আছে অরূপ। সময় সময় তিনি এই রকমই বেখাপ্পা কথার অবতারণা করে থাকেন। আগে ঘাবড়ে যেত। এখন ওঁকে বুঝে ফেলেছে।

—আমি এ সমস্ত কথা কখনও ভাবিনি স্যার।

—না ভেবে থাকলেও তোমার জানা দরকার। নিরুপম ছাড়া আমার নিজের বলতে কেউ নেই। রাজার হালে তার জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করে দিয়েও যে টাকা বাঁচবে, তা দিয়ে আমি গোটা দুয়েক হাসপাতাল করব।

—হাসপাতাল!

—হ্যাঁ। অনেক শয্যা-বিশিষ্ট হাসপাতাল। আগামী বছরের প্রথমেই কাজে হাত দেবার ইচ্ছে আছে। ভাল কথা, নিরুপমকে গিয়ে একবার পাঠিয়ে দাও তো।

অরূপ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

বারান্দায় একজন বেয়ারা টুলের ওপর বসেছিল। ওকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নিরুপম এখন ড্রইংরুমে আছে। বারান্দার বাঁকের মুখেই ড্রইংরুম। অরূপ সেদিকে পা চালাল।

ড্রইংরুমে তখন মিসেস নন্দী নিরুপমের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের নিচে নয়। তবু যৌবন যাই যাই করেও এখনও যায়নি। সুঠাম দেহ ও মুখশ্রী এখনও তাঁকে অনন্যা করে রেখেছে। বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে তিনিও যথেষ্ট সচেতন।

মিঃ নন্দী নামে যে ভদ্রলোক এঁর স্বামী ছিলেন, বছর পাঁচেক আগে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলে যেন বেঁচেছেন। যেটুকু বাধা ছিল তা অপসারিত হওয়ায় মিসেস নন্দী

এখন দুর্বার বেগে উঁচু মহলে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বলে, কম করেও গোটা পঞ্চাশেক লোকের সঙ্গে তিনি প্রেম প্রেম খেলা খেলে আচ্ছা মত দুয়ে নিতে পেরেছেন।

মিসেস নন্দী তখন বলছিলেন, না, না, ও কথা বলবেন না। আমাদের সিনে ক্লাবে নির্দোষ ছবিই দেখান হয়।

নিরুপম বলল, আপনি যত জোর দিয়েই বলুন না কেন, আমি কিন্তু অন্য কথা শুনেছি।

—কি শুনেছেন?

—ব্লু প্রিন্টের আকর্ষণেই নাকি আপনাদের সিনে ক্লাবে সকলে সদস্য হতে চান।

মিসেস নন্দী প্রায় আঁৎকে উঠলেন।

—বাই জোভ। জেলাস পিপল এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডাই করে থাকে। বিলিভ মি. মিস্টার বাসু, কোন ভালগার ফিল্ম আমরা কখনও বুক করি না। এত কথায় কাজ কি, আপনি তো পরশু আসছেন। নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—আপনাদের অ্যানুয়াল ডে'তে আমি যেতে পারলে খুশি হতাম মিসেস নন্দী। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ কাজে সেদিন আমায় নাগপুর যেতে হবে।

—আমাদের দুর্ভাগ্য। মিস্টার রায় নিশ্চয় যাবেন?

—আমি ঠিক জানি না। তিনিই বলতে পারবেন।

অরূপ ঘরে প্রবেশ করল।

—আপনাকে স্যার একবার ডাকছেন।

—এক্সকিউজ মি মিসেস নন্দী।

নিরুপম ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

অরূপ এই মহিলাকে একেবারেই দেখতে পারে না। এই বাড়িতে ঘনঘন আসার কারণ ও আঁচ করেছে। অনেকে বলাবলিও করছে, এবার নাকি রমাপ্রসাদই মিসেস নন্দীর টার্গেট। অবশ্য শক্ত ঠাঁই। তবে কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না।

অরূপ বেরিয়ে আসছিল, মিসেস নন্দী বাধা দিলেন।

—আপনার টাইপরাইটারটা নিশ্চয় এখন স্পেয়ারে আছে? আমার ঘন্টাখানেকের জন্য দরকার হবে।

—আমার ঘরে মেশিনটা আছে। আপনি গিয়ে স্বচ্ছন্দে টাইপ করতে পারেন।

নিরুপমের সঙ্গে কিছু সাংসারিক কথা ছিল রমাপ্রসাদের। কথাবার্তা সবে শেষ করেছেন, বেয়ারা এসে শ্লিপ দিয়ে গেল। শ্লিপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে রমাপ্রসাদ আগন্তুককে এখানে পাঠিয়ে দিতে বললেন। নিরুপম আর অপেক্ষা করল না।

এবার যিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পোড়খাওয়া চেহারার দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারা যায় বয়স এমনিতেই বাড়েনি, অনেক ওঠাপড়ার ইতিহাসকে পিছনে ফেলে এসেছেন। নিজে যেমন অনেক কিছু দেখেছেন, তেমনি অন্যকেও দেখিয়েছেন প্রচুর।

—আসুন, কান্তিবাবু।

কান্তি ঘোষ চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

—এবার মোটা লাভের ব্যাপার নিয়ে এসেছি। আমার কথা একটু বেশি করে ভাববেন।

মৃদু হেসে রমাপ্রসাদ বললেন, আপনার কমিশন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায়?

—তাঁকে ওয়েটিংরুমে বসিয়ে এসেছি। আগে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়ে যাক, তারপর তাঁকে ডাকব। ভদ্রলোকের নাম কণাদ দত্ত। 'হোয়েল ইন্টার-ন্যাশানালে'র পদস্থ কর্মচারি। ওঁদের কয়েক হাজার টন অ্যাসবেসটাস দরকার হবে।

—সে কথা তো ফোনে বললেন। কিন্তু আমাদের লাভের অঙ্কটা কিভাবে বেশ জেল্লাদার হয়ে উঠবে, বুঝে উঠতে পারছি না।

মৃদু হেসে কান্তিবাবু বললেন, আপনার মত ঝানু ব্যবসাদারের মুখ থেকে এরকম কথা বেরুবে, আমি ভাবতে পারিনি রায় মশাই। একথা কি একবারও আপনার মনে হচ্ছে না, ওই ভদ্রলোক বাজার থেকে মাল তুলে না নিয়ে আমাদের শরণাপন্ন কেন হচ্ছেন?

—নিজের লাভের কথা ভেবেই বোধহয় তিনি আমাদের কাছে এসেছেন।

—ঠিক তাই। 'হোয়েল ইন্টার-ন্যাশানালে'র হেড অফিস দিল্লীতে। কোম্পানি 'অ্যাসবেসটাস ইণ্ডিয়া'র কাছে আবেদন করেছিল মালের জন্য। কিন্তু তারা জানিয়েছে সাপ্লাই দিতে পারবে না।

—বলেন কি! না দিতে পারার কারণ?

—কারণ ধর্মঘট। মাসখানেক ধরে 'অ্যাসবেসটাস ইণ্ডিয়া'তে লেবার ট্রাবল চলেছে। দিন কয়েকের মধ্যেই পূর্ণ ধর্মঘট আরম্ভ হবে। ওরা তাই আর মাল সাপ্লাই দেবার রিস্ক নিচ্ছে না।

—এই অ্যাসবেসটাস কারখানাটা কোথায়?

—মধ্যপ্রদেশে। আমি বাজার ঘুরে দেখেছি। আগামী কোটার মাল যে সাপ্লাই হবে না, সেকথা এখনও এখানে জানাজানি হয়নি। এই সুযোগ ছাড়া চলতে পারে না। আমরা আজই বাজার থেকে কন্ট্রোল রেটে মাল উঠিয়ে নিতে পারি।

রমাপ্রসাদ চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

—আপনি বলতে চাইছেন, বাজারে ব্ল্যাক হবার আগেই আমরা চড়া দামে মাল হোয়েল কোম্পানিকে সাপ্লাই করে দেব

—এতক্ষণে ব্যাপারটা আপনি ধরতে পেরেছেন। এতে প্রচুর লাভ থাকবে।

একটু চিন্তা করে রমাপ্রসাদ বললেন, তাহলে আর দেরি না করে আজ দুপুরেই কেনা-কাটা শেষ করতে হয়। প্রয়োজনীয় টাকার ব্যবস্থা একরকম করাই আছে বলতে পারেন।

—সে ভালো আপনি চিন্তা করবেন না। সমস্ত ব্যবস্থা আমি করছি। আপনি হোয়েল কোম্পানির পার্চেজিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলে নিন। হাজার পাঁচেকের নিচে সে রাজি হবে বলে মনে হয় না

—ওই অ্যামাউন্টই দেব। আমি আর তাঁর সঙ্গে কথা বলে কি করব? টাকা অরূপের কাছে আছে। আপনি রফা করে নিন গিয়ে।

—না, না, তা হয় না। আলাপ-পরিচযটা করে রাখতে হবে বৈকি আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কথা শেষ করেই কান্তিবাবু ঘরের বাইরে গেলেন।

মিনিট দুয়েক পরে যিনি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশের সামান্য কিছু ওপরে। গৌর বর্ণ, মাঝারি গড়নের ভদ্রলোক। মুখ চলনসই হলেও, চোখ দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেমন যেন ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

কুশল বিনিময়ের পর কণাদ দত্ত আসন গ্রহণ করলেন।

রমাপ্রসাদ গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, আপনি যে আমাদের এই সুযোগ দিচ্ছেন, তাতে সত্যিই আমি খুশি। ভবিষ্যতেও ব্যবসার যোগাযোগ বজায় থাকবে আশা করছি।

—নিশ্চয়। সমস্ত মাল ট্রাকেই আমি পাঠাতে চাই। দিনচারেকের মধ্যেই ডেলিভারি পেলে ভাল হয়।

—আর ঘন্টাদুয়েকের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। কোন রকম অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। আপনার দাবীর কথাও আমি শুনেছি। আজ বিকেলের মধ্যেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।

কণাদ দত্ত নির্বিকার মুখেই সিগারেট ধরালেন। বেপরোয়া ভঙ্গিতে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ব্যবসার কথা শেষ হল। আপনার আপত্তি না হলে, এবার আমি কিছু ব্যক্তিগত আলোচনায় যেতে চাই।

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

—গৌর বসাককে আপনার মনে পড়ে?

—আপনি তাঁকে চিনতেন?

বিচিত্র হাসি খেলে গেল কণাদ দত্তর মুখে।

—তিনি আমার মামা ছিলেন। মজার কথাটা কি জানেন, তাঁর ছিল অপর্যাপ্ত টাকা— আমরাই ছিলাম তাঁর নিকট আত্মীয়। অথচ প্রথম জীবনটা আমি কি কষ্টই না করেছি। কিন্তু আপনার ভাগ্যটা দেখুন, কেমন তাঁর টাকাগুলো বেবাক পেয়ে গেলেন।

রমাপ্রসাদ মনের মধ্যে অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করছিলেন। অসীম বলে নিজেকে সংযত করে গম্ভীর গলায় বললেন, ও প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।

—কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছেন বোধহয়?

—কি বলতে চাইছেন আপনি?

মোলায়েম হাসিতে মুখ ভাসিয়ে কণাদ দত্ত বললেন, সযত্নে কুড়ি বছর ধরে যে কথা আপনি গোপন করে এসেছেন, তা আমি জানি মিস্টার রায়। আপনার বোধ হয় ভয় ছিল, মামা মত পরিবর্তন করে উইল পাল্টে ফেলতে পারেন। তাই তাঁকে...

ঝটিতে রমাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে সঞ্চারিত হল। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, ভব্যতার সীমা আপনি অতিক্রম করে যাচ্ছেন মিস্টার দত্ত। আমার মনে হয়, এই আলোচনা এখানেই শেষ হওয়া উচিত।

কণাদ দত্তও উঠে দাঁড়ালেন।

—আমার ইঙ্গিতটুকু আপনি বুঝতে পেরেছেন দেখছি। কথাটা কি জানেন, প্রমাণ হাতে না থাকলে, এত কথা বলতে সাহসী হতাম না। সেই বক্তাক্ত ঘটনার সাক্ষী বিনয় চালিহা এখন কলকাতাতেই আছে। বুঝতেই পাবছেন, কোন্ অশুভ গ্রহের পাল্লায় এখন আপনি পড়েছেন। চলি, আবার দেখা হবে।

সিগারেটের অতি ছোট হওয়া টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে, কণাদ দত্ত অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঠিক সেই সময় মিসেস নন্দী টাইপ শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। রমাপ্রসাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন, এই হল মনোগত ইচ্ছা?

কণাদ দত্তর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস নন্দীর মুখের উপর বিস্ময়ের পর্দা নেমে এল। কল্পনার সুদূরে চলে গেলেও এই লোকটিকে এখানে আশা করা যায় না। তিনি দ্রুত ওখান থেকে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অনেক দেরি কবে ফেলেছেন। দত্ত পরিচিত ভঙ্গিতেই আরম্ভ করলেন কথা।

—অনেক দিন পরে দেখা। ভাল তো?

—আপনি এখানে?

—ও প্রশ্ন আমিও করতে পাবি। মিস্টার রায় এখন তোমাব টার্গেট নাকি? এখানে তাহলে বেশ জমিয়ে আছো? দেখা হয়ে ভালই হল। আজ বিকেলে ওরিয়েন্ট হোটেলে চলে আসবে। ওখানেই আমি আছি।

—কিন্তু—

—এলে ভালই কববে। কিছু লাভের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে পারে।

কণাদ দত্ত সিগারেট ধরাতে ধরাতে এগোলেন। ভেঙেপড়া মন নিয়ে শুধু মিসেস নন্দী দাঁড়িয়ে রইলেন।

অরূপ সাধারণত রমাপ্রসাদের সঙ্গে গাড়িতেই অফিস যায়। কিন্তু আজ তিনি অন্যত্র কোথায় বেরিয়ে যাওয়ায়, ওকে ট্যাক্সিতেই অফিস আসতে হল। তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। অফিস তখন গমগম করছে। অরূপ সোজা চলে এল নিজের ঘরে। বড়কর্তার একান্ত সচিব, তাই ওর জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট আছে।

চেয়ারে বসেই কলিংবেল টিপল।

দ্রুত বেয়ারা প্রবেশ করল ঘরে।

—মিস চৌধুরী—

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই রজনী চৌধুরী ঘরে প্রবেশ করল। বছব তেইশের তন্বী তরুণী। মুখের লালিত্য মনে রেখাপাত করে। স্টেনোর কাজ করছে এই অফিসে দু-বছর প্রায় হল। সহকর্মীদের অনেকেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কববার জন্য ব্যগ্র, একথা না বললেও চলে।

—বসুন, মিস চৌধুরী।

—কিছু নোট দেবেন?

—হ্যাঁ। ইম্পর্টেন্ট কিছু নোট আছে।

রজনী হেসে ফেলল।

অরূপ চেয়ারে একটু হেলে বসে বলল, হাসলে যে—

—তুমি যেরকম গুরুগম্ভীর ভাবে আরম্ভ করলে, তাতে না হেসে কি করি বল?

—গুরুগম্ভীর ভাবে আবম্ভ না করে তো উপায় নেই। তুমি যেভাবে আমাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছ—

সবিস্ময়ে রজনী বলল, এড়িয়ে চলছি! কই, আমি তো—

—কাল অফিস শেষ হবার পরই যে তুমি উধাও হবে, তা আমি মোটেই জানতাম না। এক ঘন্টা অপেক্ষা করে থেকেছি।

—অবুঝের মত রাগ করলে কিন্তু আমি নাচার। তুমি বড়সাহেবের ঘরে ছিলে। কখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাবে, কিভাবে জানব বল? তাই চলে গেলাম।

অরূপ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এবারের মত তাহলে তোমায় মাফ করা যেতে পারে। কিন্তু কতদিন আর এইভাবে চলবে বল তো?

টেবিলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বজনী বলল, আমি তোমায় তো একবারও বলিনি, এইভাবে চলুক।

সহর্ষে অরূপ বলল, কবে?

—যবে তুমি স্থির করবে।

—আমি? —আমার ওপর সব ছেড়ে দিচ্ছ তো? বেশ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিন স্থির করে ফেলছি। তারপর—

—তারপর আমাকেও বড়কর্তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলবে তো?

—না, না, তা কেন। বিয়ের পর আমি ফ্ল্যাট নেব। আমাদের নতুন জীবন আরম্ভ হবে সেখানে।

রজনী অরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

—তখনও আমায় চাকরি করতে হবে?

—কখনই না। আমার বেশ ভাল আয়। দুজনের কোন অসুবিধেই হবে না।

—আমার তো এমন অবস্থা, আজ চাকরি ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি।

—কেন?

—তুমি তো আর চোখ-কান খুলে থাকবে না।

অরূপ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। ঠিক সেই সময় ইন্টারকাম এর সিগন্যাল ধ্বনিত হল। ও তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে সাড়া দিল, ইয়েস স্যার—

অপর প্রান্ত থেকে রমাপ্রসাদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, লাঞ্চের পর কান্তিবাবুকে ফোনে জানিয়ে দেবে, 'হোয়েল ইন্টার-ন্যাশানালে'র কাজটা আমরা নিতে পারব না।

—জানিয়ে দেব স্যার।

—আজ সকালে যে টাকাটা চেস্ট থেকে বার করেছ, তার আর দরকার নেই। ওটা আবার যথাস্থানে রেখে দেবে।

—চেস্টের চাবি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি স্যার।

—তাই তো। সন্ধ্যার পর তাহলে টাকাটা আমায় দিও।

রমাপ্রসাদ যোগাযোগ ছিন্ন করলেন।

অরূপ এবার পুরনো আলোচনার জের টানল।

—চোখকান খুলে রাখার কথা কি বলছিলে?

রজনী কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু। তোমাকে সেদিন বললাম না। ছোটকর্তা—

—আমি তো ভেবেছিলাম—

—ঠাট্টা করে কথাটা বলেছি? মোটেই তা নয়। ভদ্রলোকের হাবভাব আর চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝেছি, উনি আমার ওপর দারুণ ঝুঁকেছেন।

—তোমার ধারণা ভুল হতে পারে। যাক, ও নিয়ে আর ভেবো না। অফিস থেকে তোমাকে তাড়াতাড়িই সরিয়ে নিচ্ছি। অনেক ব্যক্তিগত কথা হল, এবার একটু কাজ কর। জরুরি একটা চিঠি আছে। নোট নাও তো।

দুটো বাজতে দশ মিনিট আগে লাঞ্চ থেকে ফিরলেন রমাপ্রসাদ। খেতে বাড়ি যান। প্রতিদিন ফেরেন প্রায় এই সময়। নিরুপম অবশ্য অফিসেই বা হোটেলে লাঞ্চ সারে। গাড়ি থেকে নেমে লিফটের সামনে এসে সবে দাঁড়িয়েছেন—মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। রমাপ্রসাদ চমকে উঠলেন।

কুটকুটে কালো ক্ষয়া চেহারার একটি লোক। বিশেষত্ব বর্জিত মুখ। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। বটল গ্রীন রঙের টেরিলিনের স্যুটে চেহারার আরো খোলতাই হয়েছে।

পানের ছোপ ধরা দাঁত বার করে সে হাসল। বলল, চিনতে পারছেন রমাবাবু।

রমাপ্রসাদ কোন কথা না বলে লিফটের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দ্রুত উর্ধ্বগামী যান্ত্রিক খাঁচাটির দিকে একবার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে লোকটি পকেট থেকে নোটবুক বার করল। নোটবুক থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে দ্রুত কি সমস্ত তাতে লিখল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলল।

নির্দিষ্ট তলায় পৌছে সে রীতিমত হাঁপাতে লাগল। দুজন বেয়ারা টুলের ওপর বসেছিল। এখান থেকেই অফিসের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততা সেখানে। লোকটি এগিয়ে গেল বেয়ারাদের কাছে। তারা এই কিম্ভূতমূর্তি দেখে অবাক।

লোকটি বলল, আমি তোমাদের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই শ্লিপটা তাঁকে দিয়ে এস।

একজন বলল, উনি শ্লিপ দেখে কাউকে ডাকেন না। আগে সেক্রেটারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়।

—আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।

বলা বাহুল্য, গোটা কয়েক এক টাকার নোট এবার হস্তান্তরিত হল। এরপর অরূপের ঘরে পৌছতে তার দু'মিনিটের বেশি সময় লাগল না। অরূপও এই মূর্তি দেখে কম অবাক হল না। আগন্তুককে বসতে বলার কথা ভুলে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আগন্তুক শিষ্টাচার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, মিস্টার রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন।

—আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

—আমার সঙ্গে করবেন। এই স্লিপটা পাঠিয়ে দিন তাঁর কাছে, দেখবেন কাজ হয়েছে।

আগন্তুক নোটবই থেকে ছিঁড়েনেওয়া সেই কাগজটা মোড়া অবস্থায় এগিয়ে ধরল। অরূপ হাত বাড়িয়ে স্লিপটা নেবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। কিছুটা বিরক্তই হল মনে মনে।

—আপনার যা বলবার আমাকেই বলুন।

—আপনাকে সমস্ত কথা বললে তাঁর সম্মান যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। আপনি আমাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করছেন বুঝতে পারছি। এই বিনয় চালিহা আপনাদের কর্তার যৌবনের সঙ্গী। শুনুন মিস্টার, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।

—কিন্তু।

—লোক ডেকে আমাকে এখান থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করবেন না। ফল তাতে খারাপই হবে।

লোকটির সাহস দেখে অরূপ অবাক হয়ে গেল। ভয় দেখিয়ে কথা বলছে! তবে ব্যাপার কিছু একটা আছেই। নইলে এত বেপরোয়া হওয়া সম্ভব নয়। মিঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভাল। দেখা যাক, তিনি কি বলেন।

—আমি আপনার কথা মিস্টার রায়কে বলছি। তিনি যদি দেখা করতে না চান, তাহলে আর কিছু করার নেই।

অরূপ ইন্টারকাম-এর নব্ ঘোরাল, স্যার—

—ইয়েস—

—বিনয় চালিহা নামে একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি করছেন।

একটু থেমে রমাপ্রসাদ বললেন, তোমার সামনে সে বসে আছে নাকি?

—ইয়েস স্যার।'

—পাঠিয়ে দাও।

যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাবার পর অরূপ বেল বাজাতেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। বিনয় চালিহার মুখে এখন আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।

—এঁকে বড়সাহেবের ঘরে নিয়ে যাও।

আগন্তুক বিদায় নিলে, অরূপ লক্ষ্য করল টেবিলের ওপর সেই স্লিপটা পড়ে রয়েছে। ভুল করে ভদ্রলোক বোধহয় ফেলে গেছেন। তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরতেই ওর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: এ সমস্ত কি লেখা রয়েছে!

—আপনি রাগ করবেন না রমাবাবু। লিফটের কাছে আমায় না চেনার ভান করলেন বলেই তো আমার মাথা বিগড়ে গেল।

বিনয় চালিহা থামতেই রমাপ্রসাদ বললেন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কেউ অফিসে এসে দেখা করুক, তা আমি পছন্দ করি না। কেন বিরক্ত করতে এসেছ, জানতে পারি কি?

—আমার কিছু টাকার দরকার।

—টাকা!

—অসুবিধায় না পড়লে চাইতাম না।

—আমি তোমাকে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছি।

—বছর কুড়িক আগে দিয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, তার বিনিময়ে আপনি কত লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। সেই টাকাকে ব্যবসায় খাটিয়ে আবার চতুর্গুণ করে তুলেছেন। আমাকে আরো হাজার বিশেক টাকা দিতে এখন তো আপনার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

—আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ?

বিচিত্র হাসি খেলে গেল বিনয় চালিহার মুখে।

—আজ্ঞে না। বরং বলতে পারেন, আপনাকে বিরাট অর্থক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। কণাদ দত্তর কথা ভুলে যাবেন না।

দ্রুত গলায় রমাপ্রসাদ বললেন, তুমি তাকে চেনো?

—আমি কি তাকে চিনতাম, সেই আমাকে চিনে নিয়েছে। ট্রেন ভাড়া দিয়ে কেন আমায় কলকাতায় নিয়ে এসেছে, বুঝতেই পারছেন। খুনের আমিই যে একমাত্র সাক্ষী—

তীক্ষ্ণচাপা গলায় রমাপ্রসাদ বললেন, কি সমস্ত বলছ?

—গৌরবাবুকে তাক করে যখন গুলি চালান, তখন আমিই তো আপনার পাশে ছিলাম। তাই তো—

—না, তুমি ছিলে না। তুমি কিছুই দেখনি।

নির্বিকার গলায় চালিহা বলল, আপনি বলছেন যখন, তখন আমার সব ভুলে যেতে আপত্তি নেই। আমি না চেনার ভান করলে, কণাদ দত্তর সমস্ত জারিজুরিই শেষ হয়ে যাবে। ও সমস্তই করতে পারি একটি মাত্র শর্তে—কুড়ি হাজার টাকা চাই।

রমাপ্রসাদ রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কপালে অজস্র চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কিছুটা ক্লান্তও দেখাচ্ছে তাঁকে। বারকয়েক পায়চারি করে নিলেন মন্থর পায়ে। চালিহা জানে তার কথায় ওষুধ ধরেছে।

এক সময় তিনি বললেন, ধর, টাকা দিলাম। তারপর?

—পরের প্লেনেই আসাম রওনা হব।

—আবার যে আমাকে বিরক্ত করতে আসাম থেকে ফিরে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কি?

—কুড়ি বছর পরে দেখা হল। এর থেকেও কি বুঝতে পারছেন না, আমার আসা-যাওয়াটা ঘনঘন হতে পারে না।

—হুঁ। তুমি রাত এগারোটার সময় আমার বাড়িতে এস।

—আপনি জেগে থাকবেন তো?

—জেগে না থাকলে তোমায় ডাকব কেন। রাস্তার ধারের একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখবে। নক্ করলেই আমি দরজা খুলে দেব। এখন তুমি যেতে পার।

আর একটি কথাও না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল চালিহা।

মিনিট দশেক একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রমাপ্রসাদ। ঘোরাল চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। এত বছর ধরে নির্বিবাদে জীবন কাটাবার পর আজ একি ঝামেলার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন! সকালে ঘুম থেকে উঠে কোন অপয়ার মুখ দেখেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না।

টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে একটা সিগার তুলে নিয়ে ধরিয়ে নিলেন। বসলেন আবার এসে নিজের আসনে। এই কুড়ি বছর ধরে কণাদ দত্ত ছিল কোথায়? মামার বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে এতদিন খোঁজ-খবর নেয়নি কেন— লোকটা জেনুইন তো? রমাপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন, ধরে নেওয়া যাক, কণাদ দত্ত গৌর বসাকেরই ভাগ্নে।

সে মূল ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে, আসামে গিয়ে বিনয় চালিহাকে খুঁজে বার করে। তাকে লোভ দেখিয়ে টেনে আনে কলকাতায়। ভাবতে ভাবতে রমাপ্রসাদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সিগারটা চেপে ধরেন অ্যাসট্রেতে।

খামখেয়ালী গৌর বসাক তাঁর নামে সমস্ত কিছু উইল করে দেবার পরই তিনি মনস্থির করে ফেলেন। ওঁকে আর উইল পাল্টাবার সুযোগ দেওয়া চলবে না। পরিকল্পনা দ্রুত ছকে নিলেন রমাপ্রসাদ। শিকার করতে গিয়ে গৌর বসাক মারা পড়বেন। পুলিশ অবশ্য বুঝতে পারবে এটি নির্ভেজাল খুনের ঘটনা—কিন্তু তাঁকে ধরতে পারবে না। তিনি থাকবেন সমস্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বিনয় চালিহা তাঁর অধীনস্থ লোক। পাকা লক্ষ্যবিদ। ওকে দিয়েই কাজটা করাবেন স্থির করলেন। দিন দশেক ধরে মন বুঝে, আসল কথাটা পাড়লেন। চালিহা বেশ সহজভাবে ব্যাপারটা নিলেও, রাজী হল না গুলি চালাতে। ধাপে ধাপে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত উঠলেন রমাপ্রসাদ। লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। চালিহা সরাসরি নয়, অন্যভাবে রাজী হল। অর্থাৎ জঙ্গলে সে রমাপ্রসাদের সঙ্গে যাবে। একটা অস্ত্রও যোগাড় করে দেবে। তবে গুলি তাঁকেই চালাতে হবে—তিনি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, তাহলে সে কাজ শেষ করবে। উপায়হীন অবস্থায় এই প্রস্তাবেই রমাপ্রসাদকে রাজী হতে হয়েছিল।

তারপর এত বছর পরে, সেই ভুলে যাওয়া ঘটনা খোঁচা খেয়ে দগদগে ঘায়ের আকার নিচ্ছে। চালিহা দারুণ চাল চেলেছে এবার। তাঁর কাছ থেকে টাকা নেবে, আবার কণাদ দত্তর কাছ থেকেও টাকা নেবে। কিন্তু রমাপ্রসাদ এই পরিস্থিতিকে কখনই দীর্ঘতর হতে দেবেন না। একবার রক্তপাতের বিনিময়ে তিনি বিপুল সম্পদ হস্তগত করেছেন, তা রক্ষা করার জন্য আরেকবার না হয়—

কান্তিবাবু কি এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন? তিনিই কি কণাদ দত্তকে উপস্থিত করেছেন? কলকাতার অতি ঘুঘু দালাল, তাঁর পক্ষে—

বুকের মধ্যেটা মোচড দিয়ে উঠল হঠাৎ। ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। চিন্তা-ভাবনার চাপ থাকলে, এরকম অবশ্য হয় কালে-ভদ্রে। রমাপ্রসাদ ইন্টারকাম-এর নব্

ঘোরালেন. কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না। ঘামে ভেসে যাওয়া মুখ রাখলেন টেবিলের ওপর।

ওদিকে—

বারকয়েক সাড়া দিয়েও কোন উত্তর না পেয়ে অরূপ একটু আশ্চর্য হল। রমাপ্রসাদ তো এরকম করবার লোক নন! কিছু হল নাকি? আবার ও বার দুই সাড়া নিল। কোন উত্তর এল না। শুধু হালকা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে।

অরূপ দ্রুতপায়ে বড়কর্তার ঘরের দিকে চলল।

ততক্ষণে অবশ্য রমাপ্রসাদ নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছেন। টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুলে হেলে বসেছেন চেয়ারে। ঘামের সেই ধারা বন্ধ হয়েছে। অরূপ ঘরে প্রবেশ করেই বুঝতে পারল তাঁর শরীর ভাল নেই।

—আপনার শরীর কি স্যার—

—হঠাৎ ভীষণ আনইজি ফিল করছিলাম। এখন অনেকটা ভাল। তাহলেও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি ডাঃ সেনকে এখানে আসার জন্য খবর পাঠাও।

—আমি নিজে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসছি।

অরূপ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল অফিসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। সকলেই সচকিত। নিরুপমের কানে সংবাদ পৌঁছতেই সে ছুটে এল।

ডাঃ রেবতী সেন বৌবাজারে থাকেন। ডালহৌসী থেকে দূরত্ব কতটুকুই বা। অরূপ গাড়ি নিয়েই গিয়েছিল, তিনি তখন বিশ্রামের আয়োজন করছিলেন—সংবাদটা শুনেই চলে এলেন। রুগীকে পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, গুরুতর গলদ কিছু দেখছি না। বলকারক একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। তবে—

নিরুপম বলল, থামলেন কেন ডাক্তার সেন?

—গুরুতর মেন্টাল অ্যাংজাইটি থেকেই এরকমটা হয়েছিল বলে আমার ধারণা হচ্ছে। এখন ওঁর পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। কিন্তু উনি তো সে কথা শুনবেন না।

মৃদু হেসে রমাপ্রসাদ বললেন, তোমার ধারণাই ঠিক ডাক্তার। বিশেষ কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তোমার কথা রাখব এবার। তুমিই বল, কোথায় হাওয়া-বদল করতে যাওয়া যায়?

—মাস খানেকের জন্য সিমলা চলে যান।

—বেশ। অরূপ, খোঁজ নাও তো, কালকা মেলে আগামী বুধবার দুটো রিজার্ভেশন পাওয়া যায় কিনা তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

—দেখছি স্যার।

অরূপ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

ডাঃ সেন বললেন, এই তো গুড্ বয়ের মত কথা। একন বলুন তো হঠাৎ উত্তেজিত হবার কারণটা কি?

রমাপ্রসাদ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

—অসুবিধা থাকলে বলার দরকার নেই।

—অসুবিধা তেমন কিছু নেই। তবে—

নিরুপম বলল, কেউ কি এসেছিল আপনার কাছে? যার-তার সঙ্গে কেন যে দেখা করেন বুঝি না।

—এখন মনে হচ্ছে, বিনয় চালিহার সঙ্গে দেখা না করলেই ভাল করতাম। লোকটা আমার প্রথম জীবনের সঙ্গী। আমাকে ব্ল্যাক-মেল করবার চেষ্টা করছে।

ডাঃ সেন আর নিরুপম, দুজনেই অবাক—বলেন কি!

—কণাদ দত্ত নামে আরো একটা লোক ওই পথ ধরেই এগুচ্ছে। দুজনের বক্তব্য হল, আমি নাকি গৌর বসাককে খুন করেছি। অর্থাৎ টাকা না দিলে তারা আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে।

—কি ভয়ানক! ডাঃ সেন বললেন, গৌব বসাক, মানে আপনাকে যিনি নিজের সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। কুড়ি বছর পরে কি উটকো ঝামেলা বল তো?

—আপনি আর ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। নিরুপমবাবু, একটু সজাগ থাকবেন তো! লক্ষ্য রাখবেন, আর কোন আজেবাজে লোক যেন ওঁর সঙ্গে দেখা না করে। মিস্টার রায়, এবার আপনি বাড়ি যান। আমি ওষুধটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর সন্ধ্যার পর গিয়ে আপনাকে আরেকবার পরীক্ষা করে আসব না হয়।

রজনী ঘড়ির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। পাঁচটা বাজলেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বে। ঘণ্টা খানেক আগে অরূপ বেরিয়ে গেছে রমাপ্রসাদের সঙ্গে। যাবার সময় বলে গেছে, সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে যেন পার্ক স্ট্রীটের ফ্রেঞ্চ মোটরের সামনে ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকি।

পাঁচটা বাজতে ঠিক দু'মিনিট আগে, চেয়ার ছেড়ে ওঠবার মুখেই নিরুপম এসে উপস্থিত হল। রজনী শঙ্কিত হল। কোন কাজের চাপ আসছে, না ছোটকর্তার অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে?

নিরুপম বলল, মিস চৌধুরী, আপনি বেরুচ্ছেন নাকি?

—অফিস আওয়ার্স তো শেষ হল।

—কোন্ দিকে যাবেন?

—পার্ক স্ট্রীট।

—আমি ওধারেই যাচ্ছি। আমার গাড়িতে আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

—না...মানে...

—সঙ্কোচের কি আছে? মালিকদের সঙ্গে সব সময় যে বিরাট ব্যবধান রেখে চলতে হবে, তার কোন মানে নেই। আসুন—

মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতে পারল না রজনী। এরপর আপত্তি করলে ভীষণ অভদ্রতা প্রকাশ করা হবে। সে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে নিরুপমকে অনুসরণ করল।

গাড়ির মালিক স্বয়ং ড্রাইভ করবেন, সুতরাং পিছনের সিটে বসা চলে না।

পাশাপাশিই বসতে হল। কি বিড়ম্বনা! কর্মক্লান্ত ডালহৌসীকে পিছনে ফেলে তখন অজস্র যানবাহন পথকে একাকার করে রেখেছে। চৌবঙ্গী পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগে গেল।

নিরুপম বলল, প্রত্যেক দিন এই ভিড় ঠেলে বাড়ি পৌঁছন কিভাবে?

—অনেক দেরি হয়ে যায়। উপায় তো নেই।

—কাল থেকে আমিই আপনাকে পৌঁছে দেব।

—না, না, আপনি কেন নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন।

—অফিসের পর প্র্যাকটিকালি আমার কোন কাজই থাকে না। সময় নষ্টর কোন প্রশ্নই নেই। আপনি কোথায় থাকেন?

—বসন্ত রায় রোডে।

আর কোন কথা হল না। গাড়ি পার্ক স্ট্রীটে প্রবেশ করল। তারপর নিরুপম থামল গিয়ে অভিজাত সুইস রেস্তোরাঁ ফ্লুরির সামনে।

—আসুন, চা খাওয়া যাক।

রজনী এবার নিজেকে শক্ত করল। বলল, ক্ষমা করবেন। এখান থেকেই আমি নিজের গন্তব্যস্থল হেঁটে যেতে পারব।

নিরুপম আবার বলল, সারাদিন অফিসের খাটুনির পব ফ্লুরি আপনার শরীব তাজা করে দেবে, আসুন।

—আমায় ক্ষমা করবেন।

—অফিসের অন্য কোন মেয়ে এই সুযোগ পেলে কত খুশি হত জানেন? আপনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান না?

—সকলেই চায়।

—আসুন তাহলে। আমাকে অবলম্বন করার অর্থই হল, লং গুড্ টাইমকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া।

কথা শেষ করেই অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসল নিরুপম।

গলায় জোর দিয়ে রজনী বলল, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার আরো অনেক পথ আছে। অল্প দিনের মধ্যেই আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার সঙ্গে চা খেতে না গেলেও, তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই।—কথা শেষ করেই ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত এগিয়ে চলল ফুটপাথ ধরে।

হতভম্ব নিরুপম বসে রইল স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে। অনেক মেয়েকে সে হেলায় জয় করেছে। কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা সত্যিই বিস্ময়কর।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে রজনীর কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। অরূপ আসেনি। রমাপ্রসাদ লাউডন স্ট্রীটে থাকেন। ওখান থেকে অরূপের আসতে কতক্ষণ আর সময় লাগবে। রজনী দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রমে ছ'টা বেজে গেল। শ্রীমানের দেখা নেই। অধৈর্য রজনী এবার উদ্বিগ্ন হল। এরকম হবার তো কথা নয়। কথা দিয়ে কথা রাখেনি, এমন তো কখনও হয়নি। বিশেষ কিছু হল কি?

রজনীর আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

অরূপ তখন এক গুরুতর গোলমালে জড়িয়ে রয়েছে। কালকা মেলে দুটো বার্থ পেতে ওর কোন অসুবিধা হয়নি। রিজার্ভেশন অফিস থেকে বেরিয়ে, নিজেদের অফিসে ফেরেনি। সোজা চলে গিয়েছিল ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে। সকালে রমাপ্রসাদ বলে রেখেছিলেন, অ্যাটর্নিকে খবর দিতে। তিনি যেন পরের দিন সকালে এসে দেখা করেন।

অ্যাটর্নি অফিস থেকে বেবিয়ে অরূপ যখন লাউডন স্ট্রীটে পৌঁছল তখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। ও চিন্তা করে দেখল, রমাপ্রসাদের সঙ্গে একবার দেখা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রজনীর কাছে পৌঁছতে পারবে।

গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমেই লক্ষ্য করল, হাত কুড়িক দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস নন্দী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। অরূপের মনে পড়ল, ওই ভদ্রলোকই আজ সকালে রমাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ট্যাক্সি থামার শব্দে ওঁরাও মুখ ফিরিয়েছিলেন এদিকে। ওকে দেখেই তাড়াতাড়ি গাড়িতে চেপে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি সচল হল। ব্যাপার কি? ওঁদের ব্যস্ত ভাব দেখে অরূপ অবাক না হয়ে পারল না।

বাড়িতে প্রবেশ করে আগে নিজের কাজকর্মের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় নবতাল লাগান। তালা খুলে ঘরে গিয়েই ইলেকট্রিক বেলে চাপ দিল।

দ্রুত ঘরে প্রবেশ করল একজন বেয়ারা।

—বড়সাহেব এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অফিস ঘবে আছেন।

—তুমি যাও।

রমাপ্রসাদের কাছে যাবার জন্য তৎপর হবার মুখেই মনে পড়ে গেল, সকালে চেস্ট থেকে বার করা দশ হাজার টাকা ড্রয়ারের মধ্যেই রয়েছে। উনি টাকাটা আবার তুলে বাখতে বলেছিলেন। চেস্টের চাবি আসবার সময় চেয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে অরূপের কি মনে হল, আবার ফিরে এল। টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। উনি হয়ত মত পরিবর্তন করে বলতে পারেন, চেস্টে আর রাখতে হবে না, টাকাটা আমাকেই দাও।

'কী-কেস' হাতেই ছিল। দ্রুত হাতে ড্রয়ার খুলল অরূপ। কিন্তু একি! বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল ও। নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা নেই! তবে কি ওপরের ড্রয়ারে রাখেনি? কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে, এখানেই রেখেছিল নোটের বাণ্ডিলগুলো। তবু বাকি দুটো ড্রয়ার খুলে অনুসন্ধান করল। ব্যর্থ চেষ্টা। টাকার নাম-গন্ধ কোথাও নেই!

মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে উঠল অরূপের। কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার—কোথায় গেল এতগুলো টাকা? ড্রয়ারে চাবি দেওয়া ছিল, দরজায় লাগানো ছিল নির্ভরতার প্রতীক নবতালের মত তালা। ডুপ্লিকেট চাবিও অন্য কারোর কাছে নেই! অথচ বাস্তব দৃশ্য ভয়ঙ্করভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, টাকাটা চুরিই গেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু কিভাবে চুরি গেল? ভাবতে ভাবতে ঘেমে নেয়ে উঠল অরূপ। ওর অনুপস্থিতিতে যদি কেউ এই ঘরে না ঢুকে থাকে—আপাতদৃষ্টিতে যা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে ধরে নিতে হয়, সকালে চেস্ট থেকে টাকা বার করার পর, আর ঘরের দরজায় তালা লাগাবার মধ্যেকার সময়েই চুরিটা হয়েছে।

সেই সময়ের মধ্যে কে কে এসেছিল এই ঘরে? অরূপ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখল, একমাত্র মিসেস নন্দী এসেছিলেন। টাইপের খটখট শব্দ ভাল লাগছিল না বলে, মিনিট দশেকের জন্য ও বাগানের দিকে গিয়েছিল। ওই সময়টুকুর মধ্যেই কি মিসেস নন্দী টাকাটা বার করে নিয়েছেন? কিন্তু ড্রয়ারের চাবিটা তো ওর পকেটেই ছিল। তাছাড়া তিনি জানবেনই বা কিভাবে, হাজার দশেক টাকা ওই সময় ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে?

ছ'টা বেজে গেল শোচনীয় মনের অবস্থায় নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে। অরূপের একবারও মনে পড়ল না রজনীর কথা। দারুণ ভয় মনকে ক্রমে সাপটে ধরছে। ব্যাপারটা চেপে রাখা যাবে না। জানাজানি হবার পর রমাপ্রসাদ কি বিশ্বাস করবেন, টাকাটা চুরি গেছে? তিনি নিশ্চিতভাবে ধরে নেবেন টাকাটা সরিয়ে ও এখন এই চুরির গল্প খাড়া করছে। তারপর, পুলিশ...কোর্ট...

অরূপ আর ভাবতে পারে না।

এই সময় ইন্টারকাম-এ শব্দ হল। ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সাড়া দিল। রমাপ্রসাদ নিজের অফিস ঘর থেকে বললেন, খুব ব্যস্ত না থাকলে এখুনি একবার এঘরে চলে এস।

—এখুনি আসছি স্যার।

এইবার আসল পরীক্ষা আরম্ভ হল। ভয়ে, ভাবনায় নুয়ে পড়া মন নিয়ে অরূপ রমাপ্রসাদের ঘরের দিকে এগুলো। তিনি তখন একাই ছিলেন। ওকে বসতে বলে উনি সিগার ধরিয়ে নিলেন।

—বার্থ পেয়েছ নাকি?

—পাওয়া গেছে। একটা আপার আর একটা লোয়ার নিয়েছি।

—ভাল করেছ। তারুকে সঙ্গে নেব ভাবছি। ফাই-ফরমাস খাটার লোক না থাকলে খুব অসুবিধা হবে। তুমি কি বল?

—তারু খুব কাজের লোক। সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালই হবে। আপনি এখন কেমন আছেন স্যার?

—মোটামুটি ভাল। ডাক্তার এখুনি আসবে। আবেকবার চেকআপ করিয়ে নিতে হবে।

উনি পকেট থেকে চাবি বার করে টেবিলের ওপর রেখে আবার বললেন, টাকাটা চেস্টে তুলে রাখ গিয়ে।

বাস্তব এবার ভয়াল অক্টোপাশের মত ওকে পেঁচিয়ে ধরার জন্য এগিয়ে এল। এখন কি করবে অরূপ? কিভাবে বলবে আসল কথাটা? শরীর থরথর করে কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে উঠেছে মড়ার মত।

রমাপ্রসাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। বললেন, তুমি যেন খুব আনইজি বোধ করছ? শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি?

—শরীর ভালই আছে স্যার। টাকাটা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বল?

মরিয়ার ভঙ্গিতে অরূপ বলল, টাকাটা আমার কাছে নেই স্যার। ড্রয়ার থেকে চুরি গেছে।

—বল কি? চুরি গেছে!

—বিশ্বাস করুন স্যার, ড্রয়ারে টাকাটা লক্ করে রেখেছিলাম। লক্ ঠিকই আছে, কিন্তু টাকাটা নেই।

—অদ্ভুত কাণ্ড! সমস্ত ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখা দরকার। ঘটনাটা আমাকে খুলে বল তো?

অরূপ প্রথম থেকে বলল সমস্ত কিছু। নিজের ধারণার কথাও ব্যক্ত করল। গম্ভীর ভঙ্গিতে ভ্রূ-কুঁচকে রমাপ্রসাদ সমস্ত শুনে গেলেন। মিসেস নন্দী টাকাটা সরিয়েছেন ভেবে নেওয়াটা বড়ই কষ্ট-কল্পনা।

এই সময় নিরুপম ঘরে প্রবেশ করল। থমথমে আবহাওয়া লক্ষ্য করে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই রমাপ্রসাদ সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন তাকে।

নিরুপম বলল, চুরি কে করেছে, আপনি বুঝতে পারছেন না?

—এ-কাজ কার হতে পারে, তাই তো ভাবছি।

—কেন যে আপনি এ নিয়ে এত চিন্তা করছেন, বুঝতে পারছি না। চোর তো আমাদের অচেনা নয়।

—তুমি কার কথা বলছ?

—আপনি পুলিশে খবর দিন কাকা। তারা এসেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে।

—কি বলছ তুমি নিরুপম! পুলিশে খবর দেওয়ার অর্থই হল, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। ওটা ব্ল্যাকমানি। তারা যদি এসে খোঁজাখুজি আরম্ভ করে, তাহলে চেস্ট থেকে আরো বহু টাকা বেরিয়ে পড়বে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। না, না, ও পথ মাড়ানোই চলতে পারে না।

নিরুপম গম্ভীর মুখে বলল, আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। আমি শুধু এইটুকু বলব, চোরকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।

কথা শেষ করেই নিরুপম নিষ্ক্রান্ত হল। কি বলতে এসেছিল, তাও তার মনে রইল না।

বিস্মিত রমাপ্রসাদ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রায় এক মিনিট। তারপর অরূপের দিকে মুখ ফেরালেন।

অরূপের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, নিরুপমের ইসারা তাকে লক্ষ্য করেই। ও আরো মুষড়ে পড়ল। এরকম উটকো ঝামেলা কেন যে ঘাড়ে চেপে বসল, তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

—তুমি আর কিছু বলবে অরূপ?

—উনি আমাকেই সন্দেহ করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ জানি না।

ও কথা কানে না তুলে রমাপ্রসাদ বললেন, মনে করে দেখ তো, চাবির গোছাটা ভুল করে কিছুক্ষণের জন্যও কোথাও ফেলে রেখেছিলে কিনা?

—সব সময় চাবি আমার সঙ্গেই ছিল। হাতছাড়া করিনি।

—ওই ঘরের আর ড্রয়াবের ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে আছে, না?

—হ্যাঁ, স্যার। রমাপ্রসাদ চেয়ার ছেড়ে একটা দেওয়াল আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আলমারি খুলে নিজের ফোলিওটা বার করে আবার টেবিলের কাছে ফিরে এলেন।

চামড়ার 'কী-কেস' বার করলেন তার মধ্যে থেকে। এই কেসে নানা আলমারি ড্রয়ার ও দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে। রমাপ্রসাদ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, সেই বিশেষ চাবি দুটিও অনুপস্থিত। অর্থাৎ কেউ সরিয়ে নিয়েছে। যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, ব্যাপার তাহলে তত সহজ নয়! কে এই কাজ করতে পারে?

চিন্তিত গলায় রমাপ্রসাদ বললেন, ডুপ্লিকেট চাবি দুটো আমার কাছ থেকে চুরি গেছে দেখছি।

হতবাক অরূপ বলল, আপনার কাছ থেকে চুরি গেছে!

—তুমি এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। সমস্ত ব্যাপারটাকে এখন আমায় তলিয়ে ভাবতে হবে।

কথা শেষ করেই রমাপ্রসাদ সিগার ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে, ভেঙে পড়া মনে অরূপ বারান্দা ধরে কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ডাঃ সেনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

—কর্তা কোথায়?

—অফিস রুমে আছেন।

অরূপ আর অপেক্ষা না করে নিজেব ঘরে চলে গেল। এই বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানায় ও থাকে। ও একরকম বাড়ির ছেলের মতই। প্রকৃত অর্থেই রমাপ্রসাদ যে একজন স্নেহপ্রবণ মানুষ এটা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নিজের ঘরে এসে অরূপ পোশাক না বদলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ঘটনাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিভাবে টাকাটা চুরি গেছে কিছুতেই স্থির করতে পারল না। ওর জীবনে এরকম ঘোরাল দিন আসেনি। হঠাৎ এই সময় অরূপের মনে পড়ে গেল রজনীর কথা। ঘটনা প্রবাহ এতক্ষণ তাকে ওর মন থেকে সরিয়ে রেখেছিল।

তাই তো! রজনী অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। ওর ওপর ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। সে তো আর জানে না, কি রকম ঝড় বয়ে গেছে। অরূপ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। রজনীর খোঁজ করা দরকার। সমস্ত কথা শুনলে, সে নিশ্চয় রাগ করে থাকতে পারবে না।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময় নৈশ আহার শেষ করলেন রমাপ্রসাদ। খাওয়ার

টেবিলে প্রতিদিনকার মত নিরুপম আর অরূপ উপস্থিত ছিল। গৃহকর্তা অদ্ভুত গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করছেন বুঝতে পারা গেল।

নিরুপম চুরির সম্পর্কে দু-চারবার কথা ওঠাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি ও প্রসঙ্গে তেমন উৎসাহ দেখালেন না। আহার-পর্ব শেষ হবার পর, ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে রমাপ্রসাদ দোতলার দিকে অগ্রসর হবার মুখেই বেয়ারা এসে জানাল, কান্তিবাবু এসেছেন।

—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আরেকজন ভদ্রলোক সঙ্গে আছেন।

—বলে দাও, দেখা হবে না।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চললেন।

অরূপ নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। টাকাটা কে চুরি করল, আর কাল তার চাকরি থাকবে কিনা—এই দুই চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলল। আজ বোধহয় ঘুম আসবে না। বারান্দার ওয়াল ক্লকে এক সময় সশব্দে এগারোটা বেজে গেল। বাড়ি নিঝুম হয়ে গেছে অনেক আগেই।

বিছানা ছেড়ে ও উঠে পড়ল। এরকম বিশ্রীরাত জীবনে আর আসেনি। বেডরুমের আলোয় ঘরের চারধারটা আবছা। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লক্ষ্য করল, রমাপ্রসাদের অফিস ঘরের ঘষা কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এল শেপের বাড়ি হওয়ার দরুন এখান থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে সহজেই ওই ঘরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়।

উনি এখনও জেগে আছেন! কিন্তু ডিনারের পর তো ওপরে চলে গেলেন। নিচে তাহলে আবার নেমে এসেছেন! অরূপ জানলার কাছ থেকে সরে এসে চেয়ারে বসল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সন্ধ্যায় রজনীর সন্ধান পায়নি। খুব রেগে গেছে সন্দেহ নেই। অবশ্য তার অবস্থার কথা শুনলে, রাগ জল হতে বেশি সময় লাগবে না।

ঠিক এই সময় গুরুভার কিছু পতনের শব্দ হল। ঝটিতে অরূপ উঠে দাঁড়াল। শব্দটা বাগানের দিক থেকে এল যেন! বাগানের দিককার দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও লক্ষ্য করল, কে একজন রজনীগন্ধার কেয়ারির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল রাস্তার দিকে। রাস্তার আলো বাগানকে তেমন আলোকিত করতে পারে নি। অরূপ লোকটার মুখ দেখতে না পেলেও, ঘোলাটে একটা সন্দেহ মনকে নাড়া দিয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? গেটের দারোয়ানই বা গেল কোথায়? ডিউটি ছেড়ে সে তো অন্য কোথাও যেতে পারে না। গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। রমাপ্রসাদের অফিস ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে এখনও। উনি কি শব্দ শুনতে পাননি?

শব্দটা কিসের, অনুসন্ধান করবার জন্য অরূপ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। কারুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না—কেউ কিছু শুনতে পায়নি বলেই মনে হচ্ছে। অফিস ঘরের আলো লক্ষ্য করে গজ দশেক এগোবার পরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অরূপ। জানলার সামনেই কে যেন পড়ে রয়েছে!!

আবার পা চালিয়ে দেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল ও। আড় হয়ে প'ড়ে আছেন রমাপ্রসাদ। জানলার ঘষা কাচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে যেটুকু আলো বাইরে এসে পড়েছে তাতেই দেখা যাচ্ছে তাঁর হাত-পা-মুখ কেটে ছিঁড়ে গেছে। নিথর দেহ। ওর মত চিকিৎসাশাস্ত্রে আনাড়ির পক্ষেও বুঝতে অসুবিধা হল না, উনি আর বেঁচে নেই।

অরূপের সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। ঘটনার একি অকল্পনীয় আবর্ত। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, দোতলার ঝোলা বারান্দা থেকে উনি পড়ে গেছেন। এই রকম মর্মন্তুদভাবে ওঁর জীবনান্ত হবে চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যে লোকটা পালিয়ে গেল, সে এখানে কি করছিল?

ও-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। অরূপের মনের মধ্যেটা হু হু করে উঠল। রায়মশাই প্রকৃতই ওকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। সেই তিনি এইভাবে চলে গেলেন! কিন্তু না, এখন আর বিকারের ভাবে নুয়ে পড়ার সময় নয়—অরূপ ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে সচেতন করে নিল। এবার সকলকে ডাকতে হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আলোর বন্যায় ভাসতে লাগল বাগান। নিরুপম ও চাকর বেয়ারারা সকলে এসে উপস্থিত হল। কেউই এই শোচনীয় দৃশ্য দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। স্তম্ভিত ভাব সকলকে কিছুক্ষণের জন্য মূক করে রাখল।

ধুলো আর রক্তে মাখামাখি অবস্থায় একইভাবে পড়ে আছেন রমাপ্রসাদ। নিরুপমই প্রথমে নিজেকে স্বাভাবিক করে আনতে পারল।

গম্ভীর মুখে অরূপের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল: দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।

—উনি মারা গেছেন। এখন.

—আপনি ডাক্তার নন। দারুণ আঘাত পেয়ে উনি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। যা বলছি, তাই করুন। আমি ডাক্তার সেনকে ফোন করতে চললাম।

এরপর আর কথা চলে না। সকলে ধরাধরি করে রমাপ্রসাদের দেহ ড্রইংরুমে নিয়ে এল। শুইয়ে দেওয়া হল কার্পেটের ওপর। বেঁচে যে উনি আর নেই, তা একরকম অবধারিত। কিন্তু উপায় কি? আদেশ মত কাজ করতেই হবে।

আধ ঘন্টাটাক পরে ডাঃ সেন হন্তদন্ত হয়ে এলেন। ঘুমের আমেজ তখনও তাঁর চোখ থেকে মুছে যায়নি। ফোনেই তিনি শোচনীয় ঘটনাটা শুনেছিলেন। ওঁর দেহের ওপর একবার নজর বুলিয়েই চরম সত্যটা তিনি বুঝে নিলেন। পরীক্ষা করবার কিছু ছিল না। তবু হাঁটু মুড়ে বসে দেহ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিলেন রমাপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে।

উঠে দাঁড়িয়ে রেবতী সেন বললেন, মারা গেছেন—

—মারা গেছেন!

—সাদা চোখেই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে। আপনারা ওঁর বডি বাগান থেকে তুলে এনে ভাল করেননি। এখন কোন ঝামেলা দেখা দিলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

—ঝামেলা! কি রকম ঝামেলা?

—পুলিশের অনুমতি ছাড়া বডি তুলে এনেছেন। তারা ঝামেলা করতেই পারে।

—আপনি কি বলতে চান, কাকা সুইসাইড করেছেন?

ডাঃ সেন দ্রুত গলায় বললেন, ও প্রশ্ন এখন উঠছে না। আমি শুধু বলতে চাইছি, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের পর পুলিশকে খবর দেওয়াই হল আইনসম্মত কাজ।

নিরুপম ভীতভাবে বলল, কি দরকার ওসমস্ত ঝামেলায় যাবার। আমার তো মনে হয়—

—আইনকে নিজের হাতে নেবেন না। যা হবার হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকাল থানায় খবর পাঠান।

একটু ইতস্ততঃ করে নিরুপম টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

মাঝরাত্রেই স্থানীয় থানার ও-সি কার্তিক ঘটক সদলবলে এসে পড়লেন। মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেন, তারপর জানিয়ে দিলেন কাজটা মোটেই ভাল হয়নি। ডাঃ রেবতী সেন এই রকম আশঙ্কাই করেছিলেন। উত্তর দেবার কিছু নেই, সকলে চুপ করে রইলেন থমথমে মুখে।

মৃতদেহ খুঁটিয়ে দেখার পর কার্তিক ঘটক ডাঃ সেনের অভিমত নিলেন। তারপর গেলেন দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। যেখানে মৃতদেহ পড়েছিল, তার হাত কয়েক দূর থেকেই সুন্দরভাবে ছাঁটা দু'ফিট উঁচু মেহেদির বেড়া গেট পর্যন্ত চলে গেছে। জায়গাটা তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন কার্তিক ঘটক। ছাপকা ছাপকা গাঢ় রক্ত এখানে-ওখানে লেগে রয়েছে এখনও। চোখে পড়বার মত আর কিছুই নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা আত্মহত্যা, না দৈবাৎ ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা? আত্মহত্যা করে থাকলে তিনি নিশ্চয় চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছেন। তাঁর শোবার ঘরে নিশ্চয় তার সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে এখানে বিশেষ একটা কথা মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাঁর মত অভিজাত মানুষ এইভাবে আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন?

এই সময় কার্তিক ঘটকের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

—স্যার, এখানে একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে'

কনস্টেবল নরেনের কথায় সচকিত ঘটক দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মেহেদি বেড়ার ফাঁকে সত্যি একটা পিস্তল আটকে রয়েছে। রুমাল দিয়ে জড়িয়ে সন্তর্পণে ওটাকে তুলে আনলেন নিজের চোখের সামনে। বেঢপ সাইজের সেকেলে সার্ভিস পিস্তল। অথচ সাইলেন্সার লাগান। সরকারী প্রয়োজনে এই ধরনের অস্ত্রই ব্যবহার করা হত। চেম্বার খুলতেই দেখা গেল, একটা গুলিও খরচ হয়নি।

চিন্তিত ঘটক পিস্তলটা পকেটস্থ করে আবার ড্রইংরুমে ফিরে এলেন। তাঁর মন অন্যদিকে মোড় নেবার চেষ্টা করছে এখন। দুর্ঘটনার স্থলের কাছে পিস্তলের উপস্থিতি আর যাই হোক, সরল ব্যাপার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না।

প্রশ্ন করে ঘটক জেনে নিলেন মৃতদেহ কে আবিষ্কার করেছে। তারপর তিনি অরূপকে নিয়ে পড়লেন। প্রশ্নের ধাক্কায় বেচারার নাজেহাল অবস্থা। অবশ্য নিজের অভিজ্ঞতাই ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবার বর্ণনা করল। একজন লোকের বাগান থেকে পালিয়ে যাবার কথা শুনে একটা সন্দেহ আরো গভীরভাবে ঘটককে আঁকড়ে ধরল। তবে এখন নিশ্চিত হতে হবে, সেক্রেটারী মহোদয় সত্যি কথা বলছেন কিনা।

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে মনে হচ্ছে।

নিরুপমের দিকে তাকিয়ে ঘটক বললেন, এই মুহূর্তে আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে কেসটাকে আমি স্বীকার করে নিতে পারছি না। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাবার পর কনক্লুশানে আসার সম্ভাবনা আছে। যা হোক, আপনারা এই সম্পর্কে কোন নতুন কথা আমায় বলতে পারেন কিনা, ভেবে দেখুন।

নিরুপম বলল, এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা জানি না, গত সন্ধ্যায় আমরা জানতে পেরেছি, বাড়ি থেকে দশ হাজার টাকা উধাও হয়েছে।

—স্ট্রেঞ্জ! কোথায় ছিল টাকাটা?

—অরূপ সোমের ড্রয়ারে। ব্যবসার প্রয়োজনেই কাকা রাখতে দিয়েছিলেন টাকাটা।

কার্তিক ঘটক তির্যক দৃষ্টিতে অরূপের মুখের দিকে তাকালেন।

—আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?

নিজের ভীত ভাবকে দৃঢ়তার সঙ্গে সংযত করে অরূপ বলল, না।

—লোকে কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ করবে।

—জানি। মিস্টার রায় কিন্তু আমায় সন্দেহ করেননি। তিনি ব্যাপারটা নিয়ে অন্যভাবে চিন্তা করছিলেন।

বিচিত্র মুখভঙ্গি করে হাসলেন কার্তিক ঘটক।

—যে লোক মারা গেছে, তাকে ডিফেন্স হিসাবে খাড়া করা তেমন লাভজনক নয়। আচ্ছা, বাড়িতে এত বড় চুরি হয়ে গেল, অথচ আপনারা পুলিশে খবর দিলেন না কেন?

আবার নিরুপম উত্তর দিল, কাকা অত্যন্ত খেয়ালী লোক ছিলেন। পুলিশ না ডাকাটা তাঁর একটা খেয়াল বলতে পারেন।

আরো দু-চার কথার পর ঘটক দোতলায় রমাপ্রসাদের শোবার ঘরে গেলেন। এই ঘরের হ্যাঙ্গিং বারান্দা থেকে তিনি নিচে পড়েছেন। ধনী, রুচিশীল গৃহকর্তার শয়নকক্ষ যেমন হওয়া উচিত, এটি তার ব্যতিক্রম নয়। নিভাঁজ শয্যার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, তিনি বিছানায় আশ্রয় নেননি। অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা ঠেলে ঘটক ভেতরে গেলেন। ল্যাভাটরির ওধারে একটা দরজা। বিস্ময়ের বিষয় সেই দরজার পাল্লায় ছিটকিনি লাগান নেই। ফাঁক হয়ে যাওয়া পাল্লা দিয়ে ঘটক দেখতে পেলেন, পাক খেয়ে খেয়ে স্পাইরেল বাড়ির পিছনের অংশে নেমে গেছে।

এই দরজা তো খোলা থাকার কথা নয়? অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ কি রমাপ্রসাদের কাছে এই পথ দিয়ে এসেছিল, সে চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গেছে—না, তিনি স্বয়ং কোথাও গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন অথচ দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন? প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারা না গেলেও, গতি-প্রকৃতি যে সন্দেহজনক, সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই। ঘটক দরজার খিল লাগিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলেন।

ডাঃ সেন, নিরুপম আর অরূপ সেখানে অপেক্ষারত।

—মিস্টার রায়ের পিস্তল বা রিভলবারের লাইসেন্স ছিল?

নিরুপম বলল, না।

এরপর আর ঘটক কোন প্রশ্ন করলেন না। মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। রমাপ্রসাদের শোবাব ঘব আর অরূপের অফিস ঘর সীল করে তিনি সদলে যখন বিদায় নিলেন, তখন পূবের আকাশে আবিরের মাখামাখি।

অরূপ দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ল। ইন্সপেক্টারের ভাব-ভঙ্গিতে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেছে, টাকা চুরির ব্যাপারে তাকেই সন্দেহ করা হয়েছে। মিস্টার রায় যদি সত্যি খুন হয়ে থাকেন, তবে হত্যাকারী হিসাবে নিশ্চিতভাবে সে চিহ্নিত হবে।

কার্তিক ঘটক সদলবলে বিদায় নেবার আধঘন্টাটাক পরেই অরূপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এখন ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টিকে খুঁটিয়ে চিন্তা করার দরকার। ভোর হয়ে এলেও তখনও রাস্তায় লোকজন তেমন নেই বললেই চলে। মাঝে মধ্যে দু-একটা ধাবমান গাড়ি চোখে পড়ছে।

এই সময় তার মনে হল, রজনীর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? ওকে সমস্ত কথা বলা দরকার। দুজনের মিলিত চিন্তায় রহস্যজনক চুরির কোন সূত্র আবিষ্কৃত হলেও হতে পারে।

রজনী তার এক আত্মীয়ের বাড়িব সামনেব দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। ভাইবোন নেই, বিধবা মাই তার সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী। বিশেষ ডাকাডাকি করতে হল না। রজনী জেগেছিল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। এখানে আগেও সে এসেছে। সুতরাং সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

অরূপেব ঝড়ো কাকের মত চেহাবা দেখে রজনী বিস্মিত হল। গুরুতর কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। বলল, কি হয়েছে? তুমি যেন—

—কাল আমার জন্যে অপেক্ষা কবেছিলে?

—হ্যাঁ। এক ঘন্টারও বেশি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কি হয়েছে বল তো? তোমাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছে।

—গুরুতর ব্যপার ঘটে গেছে। চাকরি তো যাবেই, শেষ পর্যন্ত পুলিশ না গ্রেপ্তার করে বসে আমায়।

—পুলিশ!

যা ঘটেছে এবার অরূপ বলে গেল একে একে। সমস্ত শুনে দারুণ ভয় পেয়ে গেল রজনী।

কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ।

শেষে হতাশ কণ্ঠে অরূপ বলল, এখন কি করা যায় বল তো?

—তুমি কি কাউকে সন্দেহ করতে পারছ না?

—মিসেস নন্দী ছাড়া আমার ঘরে আর কেউ ঢোকেননি। তবে তাঁকে চোর হিসেবে মেনে নিতে মন চাইছে না। টাকাটা যে ওই সময় ওখানে থাকবে, তা তো তাঁর জানার কথা নয়।

রমাপ্রসাদের অফিসে বহুবার যাতায়াত করেছেন মিসেস নন্দী। কাজেই অফিসের সকলেই তাঁকে চেনে।

মিস্টার রায় যদি সত্যি খুন হয়ে থাকেন, তাহলে একজনের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে। পুলিশকে অবশ্য বলেছি সেকথা। কিন্তু তারা তাকে ধরতে পারবে কিনা সন্দেহ।

—লোকটি কে?

অতঃপর বিনয় চালিহার নাটকীয়ভাবে অফিসে আগমন এবং রমাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার জেদাজেদি ইত্যাদি সমস্ত বলল অরূপ।

চালিহার চেহারার বর্ণনা শুনে দ্রুত গলায় রজনী বলল, ওই কিম্ভুতকিমাকার লোকটাকে কাল রাত্রেও আমি দেখেছি।

—বল কি! কোথায়?

—রাজেন্দ্র পার্কে যাত্রা ফেস্টিভাল হচ্ছে। কাল রাত সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময় আমি আর মা ওখান থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, রাজেন্দ্র রোডের একটা বাড়ি থেকে ওই লোকটা আর একজনের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল।

—ব্যাপার খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে। এখন ও রাস্তায় গেলে তুমি সে বাড়িটা চিনতে পারবে?

—কেন পারব না।

অরূপ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, তা না হয় হল। কিন্তু আমি তো সেই অথৈ জলের মধ্যেই রয়ে গেলাম। পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার একটা পথ বার করতে না পারলে তো চলবে না।

—একটা কাজ অবশ্য করা যায়—

—কি বল তো?

—প্রাইভেট এনকোয়ারি করালে হয়ত প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়তে পারে।

—তুমি বাসববাবুর কথা বলছ? কিন্তু তাঁর ঠিকানা.

—টেলিফোন ডায়রেক্টারিতে পাওয়া যেতে পারে।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একাগ্র মনে বাসব বিলিতি ক্রিমিনাল রিপোর্ট পড়ছিল। শৈবাল পেসেন্স খেলছে।

ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করে বাসবের দিকে একটা শ্লিপ বাড়িয়ে ধরল।

—পাঠিয়ে দাও।

মিনিট দুয়েক পরে রজনী ও অরূপ ঘরে এল।

—বসুন। কোন গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েই এসেছেন বোধহয়?

অরূপ বলল, গুরুতর ব্যাপার বলতে পারেন। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে অনুমান করেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। আমাকে বাঁচান মিস্টার ব্যানার্জি। সাধ্যমত পারিশ্রমিক আমি দেব।

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, পারিশ্রমিকই আমার কাছে শেষ

কথা নয়। মক্কেল যদি প্রকৃতই নির্দোষ হন, তাহলে তাঁকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করাই হল আমার মোটো। তারপর পারিশ্রমিকের কথা। যা হোক, আপনারা প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিন, তারপর সমস্ত কিছু খুলে বলুন। তুচ্ছ বলে কোন কিছুই বাদ দিয়ে যাবেন না।

অরূপ গুছিয়েই সমস্ত কথা বলল। বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমস্ত শুনল। বিনয় চালিহাকে গতরাত্রে দেখার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করল রজনী। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না বাসব। মনের মধ্যে ব্যাপারটাকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করল বোধহয়।

—হুঁ। কত টাকা চেস্টের মধ্যে ছিল?

—এক লাখ ষাট হাজারের সামান্য কিছু কম।

—এত টাকা ব্যাঙ্কে না পাঠিয়ে বাড়িতে রাখা হয়েছিল কেন?

একটু ইতস্ততঃ করে অরূপ বলল, ব্যাঙ্কে পাঠাবার উপায় ছিল না। ওটা ব্ল্যাক মানি।

—অ্যান্টি-করাপসন সন্দেহ করলে যে-কোন দিন তো বাড়ি রেড করতে পারত। তখন—

—টাকা বেশিদিন বাড়িতে রাখতেন না মিস্টার রায়। সরিয়ে ফেলতেন অন্যত্র।

—এ সমস্ত কথা কে কে জানে।

নিরুপমবাবু জানেন। তবে বাঁকা পথ দিয়ে তিনি কি পরিমাণ টাকা রোজগার করেছেন, তার হিসেব আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। মিস্টার রায় আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন।

—টাকার অঙ্কটা বলবেন কি?

—আমি সাত বছর ওঁর কাছে চাকরি করেছি। এই সময়ের মধ্যে উনি লাখ দশেক টাকা রোজগার করেছিলেন।

—নিঃসন্দেহে হ্যাণ্ডসাম অ্যামাউণ্ট। ভাল কথা, আয়রণ চেস্ট খুলে দেখেছিলেন কি, বাকি টাকাটা ওর মধ্যে আছে কিনা?

—তা তো দেখিনি।

—দেখে নেওয়া উচিত ছিল। যাক, মিস্টার রায় নিজের কী-কেস রাখতেন কোথায়?

—কাছেই রাখতেন। এমন কি অফিস যাওয়ার সময়ও ফোলিওর ভরে নিয়ে যেতেন।

—যে চাবি চুরি করেছে, টাকাটা যে সেই নিয়েছে সন্দেহ নেই। আচ্ছা, একটা কথা ভেবে বলুন। মিস্টার রায় নিশ্চয়ই লাঞ্চ করতে বাড়ি বা হোটেলে যেতেন। গতকাল উনি যখন লাঞ্চে যান, তখন কি ওঁর হাতে ফোলিওটা ছিল?

—লাঞ্চে যাবার সময় আমি ওঁকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলাম। তখন ফোলিও হাতে ছিল না।

—তার মানে ফোলিও তিনি ঘরেই রেখে গিয়েছিলেন। ডিরেক্টর-রুমে সকলের নিশ্চয়ই যাতায়াত নেই?

—না, দরজাগোড়ায় বেয়ারা পাহারায় থাকে।

—বর্তমানে আমার আর কিছু জানার নেই। আপনারা এখন আসুন। দেখি কতদূর কি করতে পারি—

রজনী ও অরূপ উঠে পড়ল। নমস্কার জানিয়ে দরজার দিকে এগোবার মুখে বাসব আবার বলল, রাজেন্দ্র রোডের সেই বাড়িটার নাম্বার জেনে নিয়ে আজই কোন সময় আমায় ফোনে খবর দেবেন।

ওরা সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

শৈবাল তাস গুটিয়ে রেখে এতক্ষণ সমস্ত শুনছিল। এখন প্রতিবারের মত প্রশ্ন করল, কি রকম বুঝলে?

—প্রচুর জটিলতা আছে। টাকা চুরিটাই একমাত্র ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

—অর্থাৎ?

—আমার কি মনে হয় জান ডাক্তার? ওটা দুর্ঘটনা নয়, মিস্টার রায় নিশ্চিতভাবে খুন হয়েছেন। তবে চুরি ও খুন একই সুতোয় বাঁধা কিনা, তা এখুনি বলা সম্ভব নয়।

—উনি যে খুন হয়েছেন, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছো কি করে?

—দুটি বিষয় এ ব্যাপারে আমাকে ইশারা দিচ্ছে। এক, দুর্ঘটনা স্থলে একটা পিস্তলের উপস্থিতি। যদিও তা ব্যবহার হয়নি। দুই, ওই অসময় বিনয় চালিহার আগমন এবং পলায়ন। লোকটাকে আমি খুব সাধারণ চরিত্রের বলে মনে করতে পারছি না। ভেবে দেখ, সে একরকম বেপরোয়া ভঙ্গিতেই অফিসে মিস্টার রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—তুমি এখন কিভাবে এগোতে চাও?

—আজ সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট থানায় যাব। পুলিশের মতিগতির খবর নেওয়া দরকার। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টও দেখতে চাইব। মিস্টার রায় সত্যি খুন হয়ে থাকলে, স্বাভাবিকভাবে তার চাপ আমার মক্কেলের ওপর এসে পড়বে। কাজেই আমাকে ও ব্যাপারে ইণ্টারেস্টেড হতেই হবে।

আরো দু-চার কথার পর শৈবাল উঠে পড়ল।

—সন্ধ্যার মুখে কিন্তু এস ডাক্তার। দুজনে একসঙ্গে থানায় যাব।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু ওদের যাওয়া হল না। অন্য একটা কাজে বাসব খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। থানায় পৌঁছলো পরের দিন বেলা ন'টায়। ও-সি'র ঘরে দেখা হয়ে গেল হোমিসাইড স্কোয়াডের মিস্টার সামন্তর সঙ্গে।

সবিস্ময়ে সামন্ত বললেন, কি ব্যাপার মশাই, আপনি এখানে?

মৃদু হেসে বাসব পাল্টা প্রশ্ন করল, লালবাজার ছেড়ে আপনিই বা এখানে কেন?

রমাপ্রসাদ রায় নামে একজন ধনী ব্যক্তি দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাবার পর কিন্তু জানা গেছে তিনি খুন হয়েছেন। ওই কেসটা আমরা থানা থেকে টেক-আপ করছি।

—তাই নাকি! বলতে পারেন ওই কেসের ব্যাপারেই আমি এসেছি।

হাসতে হাসতে সামন্ত বললেন, তাই বলুন। ভাগাড়ের সন্ধান না পেলে তো শকুন আসে না। তা আপনার মক্কেলটি কে—ভাইপো?

—না, সেক্রেটারী!

—আপনার মক্কেলই কিন্তু সাসপেক্টেড। সমস্ত সন্দেহ তার দিকেই আঙুল উঁচিয়ে রয়েছে।

—সেটা অনুমান করেই তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?

—পেটে হোয়েসাইন পাওয়া গেছে। ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার পর তিনি মারা যাননি, মারা যাবার পর পড়ে গিয়ে ওঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, ভেরি ইণ্টারেস্টিং। আমার যতদূর মনে পড়ছে, বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার-এ বলা হয়েছে, হোয়েসাইন খেলে মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে হয় না। মৃত্যু আসে ধীরে-সুস্থে। তার মানে হত্যাকারী বেশ কিছুক্ষণ আগে ওই ভেষজ মিঃ রায়কে খাইয়েছিল।

—এক্সজ্যাক্টলি।

—ডেডবডির কাছাকাছি একটা পিস্তল পাওয়া গেছে শুনলাম। ওতে কারুর ফিঙ্গার প্রিণ্ট পাওয়া গেছে কি?

সামন্ত বললেন, হ্যাঁ। আশ্চর্যের বিষয় মিঃ রায়ের ফিঙ্গার প্রিণ্ট পাওয়া গেছে।

—হুঁ। ওঁর বিষয়-সম্পত্তি সব বোধহয় এখন ভাইপোই পাবে?

—ওঁর অ্যাটর্নির কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বসত বাড়ির অর্ধাংশ ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে সেক্রেটারী অরূপ মুখার্জি, বাকি সমস্ত ভাইপো।

—ব্যাঙ্কে কি রকম অ্যামাউণ্ট জমা আছে?

—দু লাখ পঞ্চাশ হাজারের মত।

—আমার মক্কেলের ওপর আপনাদের সন্দেহের কারণটা কি?

—মিস্টার ঘটক এ সম্পর্কে আপনাকে বিশদভাবে বলতে পারবেন।

থানা ইনচার্জ কার্তিক ঘটক ঘরেই উপস্থিত ছিলেন। বাসবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন সামন্ত। ঘটক বাসবের এই ব্যাপারে ওপর-পড়া হয়ে নাক গলানো মোটেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি শুনেছেন, এই লোকটির সঙ্গে লালবাজারের কর্তাদের বিশেষ দহরম মহরম। হোমিসাইড স্কোয়াডের লোক হয়েও মিঃ সামন্ত যখন কেসের সমস্ত গোপন কথা বলে দিচ্ছেন, তখন তাঁকেও বলতে হবে।

ঘটক বললেন, ঘুরিয়ে দেখলে যে-কোন ব্যাপারকেই জটিল মনে হবে। এই কেসে বিশেষ জটিলতা নেই। অরূপবাবুর মোটিভ পরিষ্কার। সে যে দশ হাজার টাকা সরিয়েছিল, মিস্টার রায় তা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে দুনিয়া থেকে সরে যেতে হল। হয়ত আরো টাকা তছরুপের ব্যাপার ছিল।

—আপনার ধারণায় খুনটা কিভাবে হয়েছে?

—খাওয়া দাওয়ার পর মিস্টার রায় নিজের শোবার ঘরে চলে যান। অরূপবাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাছে উপস্থিত হন, তারপর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, ঘরের আলো নিভিয়ে পেছনের স্পাইরেল দিয়ে নেমে যান। এইভাবে সরে পড়ার উদ্দেশ্য হল, আমাদের বিপথগামী করা।

—আপনার সঙ্গে এক মত হতে পারলে খুশি হতাম। সুযোগের সদ্ব্যবহার বলে বিষয়টিকে আপনি জলের মত স্বচ্ছ করে এনেছেন। ছোরা বা রিভলবারের ব্যবহার হলে আপনার পয়েন্টকে জোরালো মনে হতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। আপনি ভেবে দেখুন, অরূপবাবু গিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নিন—অমনি সুবোধ বালকের মত হোয়েসাইন খেয়ে নিয়ে মিস্টার রায় নিজের মৃত্যু ডেকে আনলেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাছাড়া, ওখানে মিস্টার রায়ের হাতের ছাপ দেওয়া পিস্তলের উপস্থিতি, ওই সময় একজন লোকের দ্রুত পলায়ন। এই বিষয়গুলি তদন্তের সময় মনে রাখা দরকার।

একটু চুপ করে ঘটক বললেন, একজন লোকের পালিয়ে যাওয়ার কথাটা অরূপবাবুর বানানো গল্পও হতে পারে।

—হতেও পারে। যাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি আপনার পথ ধরেই চলুন।

তারপর সামন্তর দিকে ফিরে বাসব বলল, কোন প্রমাণ না পেয়ে, শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমার মক্কেলকে গ্রেপ্তার করবেন না, এই অনুরোধ নিশ্চয় করতে পারি।

সামন্ত বললেন, আপাত দৃষ্টিতে যাই মনে হোক, আমারও ধারণা কেসটি জটিল। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, প্রমাণ অভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না।

বাসব আবার পাইপ ধরাল। পিস্তলটা কার নামে লাইসেন্স করা আছে, সন্ধান পেয়েছেন?

—কারোর নামে নয়। চোরাই পিস্তল।

—অস্ত্রটা একবার দেখতে পারি?

সামন্ত ঘটককে ইঙ্গিত করলেন। ঘটক চেয়ার ছেড়ে উঠে স্টিল আলমারির মধ্যে থেকে পিস্তল বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

বাসব তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আমেরিকায় তৈরি। মিলিটারি সার্জেণ্টরা এই ধরনের পিস্তল ব্যবহার করে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, আমেরিকার ছাপ মারা এই ধরনের প্রচুর অস্ত্র চোরাবাজারের মাধ্যমে মানুষ সংগ্রহ করেছিল।

চিন্তিত বাসব পিস্তল আবার টেবিলের ওপর রেখে বলল, মিস্টার ঘটক, আর একটি বিষয় জানবার আছে। আপনি মিস্টার রায়ের ঘরে চা বা কফির পেয়ালা কিংবা জলের কোন গ্লাস দেখেছিলেন কি?

বিস্মিত ঘটক বললেন, না। যতদূর মনে পড়ছে, দেখিনি।

—আশ্চর্য! এখন উঠলাম। আজ কোন সময় সকলের সঙ্গে কথা বলে নেব ভাবছি।

সামন্ত বললেন, দুপুরে আমি ওখানে যাচ্ছি। আপনাকে বরং তুলে নেব। আমি সঙ্গে থাকলে আপনার সুবিধাই হবে।

—বেশ।

স্পাইরেল যেখানে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে, বাড়ির সেই পেছন দিকে এসে বাসব দাঁড়াল। মিনিট দশেক হল ও রমাপ্রসাদের বাড়িতে এসেছে। নিরুপম প্রাইভেট এনকোয়ারির কথা কিছু জানত না। মিঃ সামন্তর মুখ থেকে শুনে কটমটিয়ে তাকিয়েছে অরূপের দিকে। অ্যাটর্নির মুখ থেকে উইলের বয়ান শোনার পর ওর মন-মেজাজ একেবারেই ভাল নেই। কাকার কি ভীমরতি হয়েছিল—মাইনে করা একজন কর্মচারিকে এত অনুগ্রহ না দেখালে কি চলত না? তারপর আবার এই উটকো ঝামেলা দেখা দিল।

বাসব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারধার। খুনের রাত্রে এখানে কেউ নেমে এসেছিল ওপর থেকে। হত্যাকারীই কি? হঠাৎ এক জায়গায় বাসবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দুটো আধপোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল। লেখা অংশ পুড়ে যাওয়ায় কোন্ ব্র্যাণ্ডের বুঝতে পারা গেল না। মনে হয় কেউ এখানে সিগারেট পুড়িয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছে।

বাসব স্পাইরেল বেয়ে ওপরে উঠল, আবার নেমে এল। উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না। এবার ওর দৃষ্টি পড়ল বাউণ্ডারি ওয়ালের সঙ্গে যুক্ত রঙের পাল্লা লাগানো সরু মত একটা দরজার ওপর। মেথর যাতায়াতের পথ বোধহয়। ওখানে কি একটা চকমক করছে যেন!

জিনিসটা কিন্তু বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাসব হাতে তুলে নিয়ে দেখল, ইঞ্চি আড়াই লম্বা কোন হালকা ধাতুর তৈরি উড়ন্ত পাখি। কোটের কলারে অনেকে যা ব্যবহার করে, তা কিন্তু নয়। মনে হয়, অন্য কোন কিছুর সঙ্গে আটকান ছিল, খুলে পড়ে গেছে। পাখিটা পকেটস্থ করে বাসব ফিরে চলল।

পার্লারে তখন মিঃ সামন্ত ড্রাইভারকে জেরা করছেন।

—আপনি তাহলে সেদিন গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করেননি?

—আজ্ঞে না। কর্তা বললেন, রাখাল, গাড়ি পোর্টিকোতেই থাক। গ্যারাজ করতে হবে না।

—রাত ভোর গাড়ি বাইরে ফেলে রাখার অর্থ কি?

—বোধহয়, উনি রাত্রে কোথাও যাবেন স্থির করেছিলেন।

—কোথায় যেতে পারতেন বলে আপনার ধারণা?

—আজ্ঞে, তা তো বলতে পারব না।

এরপর নাইট গার্ড প্রেমবাহাদুরকে ডাকা হল। সে রাত্রে নেপালী নন্দনটি তার ডিউটিতে উপস্থিত ছিল না। ফিরে এসেছিল পরের দিন বেলা আটটার সময়। সে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। এই কার্যকলাপ তাই বিস্ময়ের উদ্রেক করছে।

সামন্ত প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, তোমার সাহেব যে রাত্রে মারা যান—তুমি ডিউটিতে অনুপস্থিত ছিলে কেন?

—আমি ছুটিতে ছিলাম সাহাব।

—দিনভোর তো তোমার ছুটিই থাকে। রাত্রে সেদিন কি এমন কাজ পড়ল বল তো?

—বড়াসাহাব আমায় ছুটি দিযেছিলেন।

—তুমি না চাইতেই তোমায় ছুটি দিলেন?

—হ্যাঁ।

—অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি তোমায় হঠাৎ ছুটি দিলেন কেন?

বাহাদুরের মুখে ভয় বা আশঙ্কার কোন ছায়া নেই। সে সহজ গলায় বলল, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে বড়াসাহাব আমাকে বললেন, আজ রাত্রে তোমার ছুটি। তারপর তিনি আমায় পাঁচটা টাকা দিলেন।

—তুমি কি রাত্রে নিজের ঘরেই ছিলে?

—না, সাহাব। মৌলালিতে দেশের অনেক লোক থাকে। রাতটা সেখানেই ছিলাম।

সামন্ত বাহাদুরকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

বাসব এতক্ষণ পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন শুনছিল। বাহাদুর চলে যাবার পর সামন্তর দিকে তাকিয়ে হাসল।

—রাখাল আর বাহাদুরের স্টেটমেণ্ট আমাকে ভাবিযে তুলেছে। আপনার কি মত?

—ওরা মিথ্যে কথা বলেনি বলেই মনে হয়। আচ্ছা, বাগানে পড়ে থাকা পিস্তলটায় সাইলেন্সার লাগানো ছিল কি?

—আপনাকে দেখানো হয়নি। সাইলেন্সারটা এখনও বিশেষজ্ঞদের কাছে রয়েছে।

—ওঁরা ওটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

—সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বড় একটা দেখা যায় না। সচরাচর ওটা রিভলবারের সঙ্গেই যুক্ত দেখা যায়। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পিস্তল আমেরিকার হলেও সাইলেন্সার এখানকার তৈরি। প্রয়োজনীয় আরো কিছু জানার জন্য বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

—হুঁ। মিস্টার রায়ের খাসবেয়ারা নিশ্চয় আছে? তাকে একবার ডাকান না, কথাবার্তা বলে দেখি।

মিঃ সামন্তর ইঙ্গিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে কার্তিক ঘটক রঘুয়াকে এনে উপস্থিত করলেন। উত্তরপ্রদেশের লোক হলেও বহুদিন এখানে থাকায় ভাল বাংলা বলতে পারে। এখন তাকে বিশেষ ভীত দেখাচ্ছে। হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল।

বাসব বলল, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও। সাহেব সেদিন নিজের শোবার ঘরে গিয়েছিলেন কখন?

—খাওয়া-দাওয়ার পর দশটা আন্দাজ সময়।

—তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—কখন কি দরকার লাগে বলে আমি বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলাম।

—সে সময় আর কেউ ঢুকেছিল ঘরে?

—ছোটবাবু গিয়েছিলেন।

বাসব একটু থেমে বলল, তাঁদের কথাবার্তা তুমি শুনতে পেয়েছিলে?

—দরজা বন্ধ ছিল, পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারি নি। বড়বাবু বোধহয় বকাবকি করছিলেন।

—ছোটবাবু বেরিয়ে যাবার পর তুমি নিশ্চয় আরো কিছুক্ষণ ওখানে ছিলে? কোন শব্দটব্দ পেয়েছিলে ঘরের মধ্যে থেকে?

রঘুয়া একটু ভেবে বলল, ছোটবাবু বেরিয়ে যাবার পর কাচের গেলাস রাখার শব্দ পেয়েছিলাম।

—তুমি এখন যেতে পার, পরে তোমার সঙ্গে আবার কথাবার্তা হবে।

রঘুরা চলে যাবার পর বাসব বলল, একটা কাচের গেলাস নিশ্চিতভাবে মিঃ রায়ের ঘরে ছিল। নইলে রঘুয়া আওয়াজ শুনতে পেত না। পরে গেলাসটার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।

—এমনও হতে পারে,—সামন্ত বললেন, আর সেটাই স্বাভাবিক, হত্যাকারী যাবার সময় গেলাসটা নিয়ে গেছে।

—আপনার কথা মেনে নিলে কিন্তু কতকগুলো দিক একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন, বিষপ্রয়োগ যখন করাই হয়েছিল, তখন ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেবার কোন মানে হয় না। হত্যাকারী ভালভাবেই জানত, ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করা যাবে না। কারণ পোস্টমর্টেম রিপোর্টে প্রকাশ পাবে সমস্ত। আমার কি মনে হয় জানেন, হত্যাকারী সে সময় ঐ ঘরে ছিল না।

—এই ধারণার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে?

—রাখাল আর বাহাদুর কি বলেছিল মনে আছে নিশ্চয়ই? মিস্টার রায়ের হাতের ছাপ মারা পিস্তলটাকে সে-কথার সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করুন।

সচকিত হয়ে সামন্ত বললেন, কিন্তু—

—আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছি, মিস্টার রায় একজনকে রাত্রে আসতে বলেছিলেন। একথা জানাজানি হোক—তা তিনি চান নি। তাই বাহাদুরকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল হাতে নিয়ে তিনি ঝোলান বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই ব্যক্তি এলেই তাকে গুলি করে মারবেন—পোর্টিকোয় অপেক্ষারত গাড়িতে মৃতদেহ চাপিয়ে মৃতদেহ অন্য কোথাও ফেলে আসবেন, এই বোধহয় পরিকল্পনা ছিল।

—বলেন কি!

—আমার তো তাই মনে হয়। নইলে ড্রাইভারকে তাড়িয়ে দামি গাড়ি বাইরে ফেলে রাখার কারণটা কি বলুন? তাছাড়া তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমেত পিস্তলের উপস্থিতিই বা কেন?

—অরূপবাবু যাকে পালিয়ে যেতে দেখেছিলেন, সে বিনয় চালিহা। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেছে বলা চলে। কারণ তীব্র হোয়েসাইনের আক্রমণে এই সময় মিঃ রায়ের প্রাণ বেরিয়ে যায়। তাঁর দেহ স্বাভাবিক কারণেই তখন নিচে আছাড় খেয়ে পড়ে।

—উনি নিশ্চয়ই জেনে শুনে হোয়েসাইন খান নি?

—নিশ্চয়ই না। তিনি কেন খেয়েছিলেন বা তাঁকে কিভাবে খাওয়ানো হয়েছিল, তা আমাদের জানতে হবে।

—বিনয় চালিহা লোকটা কে? তাকেই বা মিস্টার রায় খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন কেন? অবশ্য আপনার থিওরি মত যদি সমস্ত ঘটে থাকে।

—চালিহার সন্ধানে আমি আছি। তাকে পাওয়া গেলে ব্যাপারটা সহজ হতে পারে।

—কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি, গেলাস কিভাবে অদৃশ্য হল, তার তো কোন কিনারা হল না!

—তাই তো দেখছি। এই গেলাস-রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হবে বলে মনে হয়। আমি মিস্টার রায়ের ঘরখানা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

—বেশ তো, ওপরে চলে যান। ঘটক ওখানেই আছেন।

—আর আপনি?

—আমি চেস্ট খুলে দেখি ওর মধ্যে কত টাকা আছে। সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো মনে হল, ওর মধ্যে যা আছে, সমস্ত ব্ল্যাকমানি।

—তাহলে তো সীজ করতে হয়। আমি তবে ওপরে যাই।

ইন্সপেক্টর ঘটক মৃত গৃহকর্তার ঘরেই ছিলেন। আরেকবার অনুসন্ধান করে দেখছিলেন যদি প্রয়োজনীয় কোন সূত্র পান। তাঁকে কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। এই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন বাসব ঘরে প্রবেশ করছে।

—আপনি এখানে কি মনে করে মশাই?

—আপনার কি মনে হয় আমি এখানে বেড়াতে এলাম?

কথাটা বলেই বাসব কাজে মন দিল। বাথরুমটা খুঁটিয়ে দেখে আসার পর ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ওয়ার্ডরোবের পাশে সোরাই রাখা রয়েছে। মুখে ঢাকা নেই, গেলাস দিয়েই ঢাকা ছিল বোধহয়। সোরাইয়ের হাতকয়েক এধারে সানমাইকার আবরণ দেওয়া সুদৃশ্য টিপয়টা রাখা আছে।

বাসব ঝুঁকে টিপয় পরীক্ষা করতে লাগল। হালকা হলদে রঙের গোল একটা দাগ। চা খেয়ে পিরিচ সমতে কাপ বোধহয় কখনো রাখা হয়েছিল, তারই দাগ। সাদা চোখে আর কিছু দেখা যায় না বলে বাসব পকেট থেকে সব সময়ের সহচর শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে সামনে মেলে ধরল। গেলাসের দাগ এবার আকার নেয়। আরো কি যেন লেপ্টে শুকিয়ে রয়েছে। বেশি মাত্রায় ঝুঁকে পড়তেই বাসব বিচিত্র এক গন্ধ পেল। যে জিনিসটা শুকিয়ে আছে, তারই গন্ধ হতে পারে।

—আমি এই টিপয়টা একদিনের জন্য নিয়ে যেতে চাই—

—দেখুন যদি ওই টিপয়টা আপনার মক্কেলকে বাঁচাতে পারে।

বাসব কোন উত্তর না দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ঘরখানা পরীক্ষা করল। তারপর টিপয় হাতে নিয়ে নেমে এল নিচে। সামন্ত জানালেন, চেস্টে একলাখ বাহান্ন হাজার টাকা পাওয়া গেছে। চেস্ট সীল করে পাহারা বসানো হয়েছে। আয়কর বিভাগের লোক এখন হিসাব পরীক্ষা করবেন।

বাসব বলল, নিরুপমবাবু কোথায়?

—উনি আর ডাক্তার সেন ড্রইংরুমে আছেন। আপনি গিয়ে কথাবার্তা বলুন। আমি ততক্ষণ অন্য কাজগুলো সেরে নিই।

মিঃ সামন্ত ওকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে দুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি অবশ্য আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। বাসব দুজনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। নিরুপমের এখনো সেই অপ্রসন্ন ভাব। ডাঃ সেনের মুখে সময়োচিত হাসি।

—পুলিশের সঙ্গে আপনাদের কি কথাবার্তা হয়েছে আমি জানি। হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর। তাকে সহজে ধরা যাবে না বুঝতেই পারছেন। পুলিশকে বলেন নি—এমন কোন কথা যদি এখন আপনাদের মনে পড়ে থাকে, তবে অনুগ্রহ করে বলুন।

নিরুপম বলল, তেমন কোন কথা আমার জানা নেই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে বলল, ডাক্তার সেন, আপনি কিছু বলতে পারেন?

সেন বললেন, আপনার কাজে লাগবে কিনা জানি না, তবে—

—বলুন?

সেদিন অফিসে শরীর খাবাপ হবার পর রমাপ্রসাদ, বিনয় চালিহা ও কণাদ দত্ত সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ডাঃ সেন তার বর্ণনা দিলেন। নিরুপম যে সে সময় ওখানে উপস্থিত ছিল, একথা বলতেও ভুললেন না।

—বিনয় চালিহাকে আপনারা দেখেছেন?

দুজনেরই এক উত্তব ঃ না।

—কণাদ দত্ত লোকটা কে?

নিরুপম বলল, বলতে পারব না।

—আচ্ছা, সেদিন আপনি ও মিস্টার বায কি একই সঙ্গে লাঞ্চ সাবতে বাড়ি এসেছিলেন?

—না। আমি লাঞ্চ হোটেলে করে থাকি।

—অফিস থেকে কে আগে বেবিয়েছিলেন, আপনি না উনি?

—উনি।

—সেদিন তাহলে কোন কারণেই আপনি বাড়ি আসেন নি?

—না। কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের কি কোন প্রয়োজন আছে?

—আমাদের অনেক কিছুই জানতে হয়। ডাক্তার সেন, আপনি তো সন্ধ্যার সময় এসেছিলেন, তখন কেমন দেখেছিলেন তাঁকে?

—সম্পূর্ণ নর্মাল।

—কি বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল?

—দশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছিল, তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

—তাই নাকি! কি বলছিলেন?

—বলছিলেন, এ ব্যাপাবে পুলিশকে ডাকবেন না। তিনি জানেন কে চুরি করেছে। আমি নাম জানতে চেয়েছিলাম, তিনি বলেন নি।

—হুঁ। নিরুপমবাবু, আপনার সঙ্গে সেদিন কখন তাঁর শেষ দেখা হয়।

—রাতের খাওয়া সেরে তিনি যখন ওপরে যাচ্ছিলেন তখন। বিশেষ কোন কথা হয় নি।

—ধন্যবাদ। আপনাদের আর বিরক্ত কবব না। অরূপবাবু বোধ হয় এখন নিজের ঘরেই আছেন। অনুগ্রহ করে যদি তাঁর ঘরখানা দেখিয়ে দেন।

নিরুপম বলল, বারান্দার দক্ষিণ দিকের শেয ঘর।

বাসব ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসে নির্দেশ মত পা চালাল।

বিমর্ষভাবে বিছানায় শুয়েছিল অরূপ। বাসবকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল।

বাসব চেয়ারে বসে বলল, আচ্ছা, অরূপবাবু মিস্টার বায়ের মোট কত ব্ল্যাকমানি ছিল, বলতে পারেন?

—আপনাকে তো একবার বলেছি, কারেক্ট ফিগার বলতে পারব না। দশলাখ টাকার মত হবে।

মিস্টার রায় কি তার কোন হিসাব রাখতেন?

—নিশ্চয়। চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা একটা খাতা ছিল তাঁর কাছে। তাতেই লিখে রাখতেন কোথা থেকে কত টাকা পেলেন।

—কারোর চোখে পড়ে যাবার ভয়ে সে খাতা নিশ্চয় কোন গুপ্তস্থানে থাকত। সেই গুপ্তস্থান আপনি জানেন?

একটু ভেবে নিয়ে অরূপ বলল, মনে হয়, অফিস-ঘরের কোথাও তিনি খাতাটা রাখতেন। ও-ঘরে কযেকদিন তাঁকে হিসাব লিখতেও দেখেছি।

বাসব বলল, অফিস-ঘব তাহলে আতিপাতি করে খুঁজে দেখতে হবে। কাল দুপুরে আসব। আপনিও তখন আমাকে সাহায্য করবেন।

—বেশ।

—এই সঙ্গে আরো একটা প্রবলেম সলভ হতে পারে। পুরো ব্ল্যাকমানির সন্ধানও আমরা ওই ঘরে পেতে পারি।

—টাকাটা তিনি বোধহয় বাড়িতে রাখতেন না।

—তাহলে রাখতেন কোথায়?

—ঠিক জানি না। তবে একবার, বলেছিলেন টাকাগুলো রাখার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করলেও হাতে কিছুই পাবে না।

—এবার আমার প্রশ্নে একটু ভেবে-চিন্তে উত্তর দিন। ধরুন, তিনি মারা যান নি। আজ সন্ধ্যাবেলা প্রত্যাশিত মোটা কালো টাকা হাতে এল। তখন তিনি কি করবেন?

দু-একদিনের জন্যে চেস্টের মধ্যে রেখেও দিতে পারেন। যেমন ছিল—যার থেকে দশ হাজার টাকা চুরি গেছে। নয়তো অ্যাটাচি কেসের মধ্যে টাকাটা ভ'রে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। কোথায় যাবেন আমায় পর্যন্ত বলবেন না।

—বাড়ির গাড়িতে যাবেন বোধহয়?

—না। বিশেষত্ব ওখানেই। তিনি যাবেন ট্যাক্সিতে।

—অর্থাৎ কোথায় যাচ্ছেন রাখাল তা জানতে পারবে, তাই এই সাবধানতা। এখন

আমি চললাম। বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। মনে তো হয় কেসটা আমি সলভ করে দিতে পারব।

বিনয় চালিহাকে রাজেন্দ্র রোডের যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল, তাব ঠিকানা রজনী ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল বাসবকে। পরের দিন ভোরবেলা বাসব নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হল। বারকয়েক কলিংবেল বাজাতেই এক ভদ্রমহিলা দবজা খুলে বেরিয়ে এলেন। যুগপৎ বিস্ময় আর বিরক্তির মেশামেশি তাঁর চোখে মুখে।

বাসব বুঝতে পারল ইনিই মিসেস নন্দী।

—কাকে চাই?

—আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে। রমাপ্রসাদ রায়ের হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই।

মিসেস নন্দীর মুখের ভাব এবার পালটে গেল। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কি পুলিশের লোক?

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে কিন্তু বেকায়দায় পডতে হবে। লালবাজারের বিশেষ সমর্থন আমার পক্ষে আছে জানবেন।

—ভেতরে আসুন।

বাসব মিসেস নন্দীর পিছু পিছু ভেতরে গেল।

মিসেস নন্দী বললেন, মিস্টার রায়ের মার্ডার কেসে আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারব বুঝতে পারছি না।

—বুধবার রাত্রের কথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে?

—বুধবার!

মিস্টার রায়ের খুন হওয়ার রাত্রের কথা বলছি। বিনয় চালিহা ও আরেকজন লোকের সঙ্গে আপনি কি কথা বলছিলেন বলতে পারেন?

—বিনয় চালিহা কে?

—আপনি আমার কথা অস্বীকার করছেন?

দৃঢ় গলায় মিসেস নন্দী বললেন, অবান্তর প্রশ্নের আর কি উত্তর দেব বলুন?

খুন হওয়ার আগের সন্ধ্যায় মিস্টার রায়ের বাড়ির কাছে আরেকজন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। অরূপবাবুকে দেখেই ট্যাক্সি নিয়ে সরে পড়েন—কথাটা মিথ্যে?

—ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। অরূপবাবুকে দেখে অনর্থক সরে পড়বই বা কেন?

বাসব কথা বললেও চোখ ঘুরছিল ঘরের চারধারে। ও এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে বলল, একি, এখানকার ডেকরেশনটা কোথায়?

—পড়ে গেছে কোথাও। আপনার আর কোন প্রশ্ন আছে কি?

—দেখুন তো, এই পাখিটা ওখানে আটকানো ছিল কিনা!

বাসব পকেট থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেটালের পাখিটা বার করেছে।

—মিথ্যার আর জাল বুনবেন না। ওটা এখান থেকেই খুলেছে। হয়ত ভাবছেন, জিনিসটা কোথায় পেলাম, তাই না? কুড়িয়ে পেয়েছি মিস্টার রায়ের বাড়ির পেছনের অংশ থেকে। এখানেই শেষ নয় মিসেস নন্দী, স্পাইরেলের সিঁড়ির সাহায্যে যে আপনি মিস্টার রায়ের ঘরে পৌঁছেছিলেন, তাও আমি বুঝতে পারছি। সিঁড়ি ও দরজার গায়ে আপনার একাধিক ফিঙ্গার প্রিণ্ট পাওয়া যাবে। যার...

বাসবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিসেস নন্দী বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি খুন সম্পর্কে কিছুই জানি না।

উদ্ধত ভঙ্গি আর নেই। মহিলা বেশ ঘাবড়েছেন। বাসব মনে মনে হাসল। ওষুধ কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

—যা জানেন তাই বলুন।

—সে এক অন্য ব্যাপার। তার সঙ্গে...

—তা হোক। আমাকে খুলে বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। আপনি নিশ্চয় চাইবেন না, পুলিশ এনে এখানে আমি উপস্থিত করি।

ইতস্ততঃ করে মিসেস নন্দী বললেন, শুনতে চাইছেন যখন, বলছি। আপনার উপকার হবে বলে মনে হয় না। যখন দিল্লীতে থাকতাম, কণাদ দত্তর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারপর দশ বছর পরে সেদিন মিস্টার রায়ের বাডিতে তার সঙ্গে আমাব হঠাৎ আবার দেখা।

সন্ধ্যার সময় তার আস্তানায় গেলাম। সে আমায় বলল, মিস্টার রায় নাকি তার এক ধনী আত্মীয়কে খুন করে সমস্ত কিছু হাতিয়ে নিয়েছেন। এখন সে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমার সহযোগিতা তার চাই।

ঘন ঘন কণাদ দত্ত আমার কাছে আসা যাওয়া করতে লাগল। সঙ্গে আসত বিনয় চালিহা নামে একটা অদ্ভুত লোক। সে নাকি খুনের সাক্ষী। আমি খুব বিপন্ন বোধ করছিলাম, কিন্তু আমার কিছু করারও ছিল না।

দত্তর পরামর্শ অনুসারে সেদিন সন্ধ্যার পর ফোন করলাম মিস্টার রায়কে। তাঁকে জানালাম তাঁর বিপদের কথা। এবং এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান কিনা তা জানতে চাইলাম। তিনি রাজী হলেন। বললেন, রাত দশটার পর পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমি যেন ওপরে চলে আসি। দরজা খোলা থাকবে।

—আপনারা তিনজনই গেলেন বোধহয়?

—না। এই নৈশ অভিযানের কথা চালিহার জানা ছিল না। আমি আর দত্ত গেলাম। সে নিচে দাঁড়িয়ে রইল, আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

—কি কথাবার্তা হল?

—উনি আমাকে প্রথমে এই ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতে অনুরোধ করলেন। আমি অক্ষমতা জানালাম। শেষে স্থির হল, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে রফা করতে রাজী আছেন। আগামী কাল বিকেলে 'রেড ফক্স' রেস্টুরেণ্টে দেখা করবেন। আমি ফিরে গেলাম। আর আমার কিছু জানা নেই। বিশ্বাস করুন মিথ্যা কথা বলি নি।

—আপনি যখন গেলেন তখন মিস্টার রায় কি করছিলেন?

—সোফায় বসেছিলেন চুপ করে।

—ওয়ার্ডরোবের পাশে একটা টিপয় লক্ষ্য করেছিলেন?

—ওয়ার্ডরোবের পাশে তো নয়। টিপয় ছিল সোফার পাশে। একটা গেলাস আর পেটমোটা বোতল রাখা ছিল তার ওপর।

—তার মানে পরে কেউ টিপয়টা সরিয়ে রেখেছিল। গেলাস আর বোতলটা অদৃশ্য হয়েছে ওই সময়। ভাল কথা, দত্ত আর চালিহাকে কোথায় পাব?

—রিপন স্ট্রীটের ওরিয়েন্ট হোটেলে।

—ধন্যবাদ। এখন চলি।

গাড়ি সঙ্গেই ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসব ওরিয়েন্ট হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হল। এনকোয়ারি থেকে জানা গেল কণাদ দত্ত গতকাল হোটেল ছেড়ে গেছেন। চালিহা আছেন। তাঁর ঘরের নম্বর তেত্রিশ।

তেত্রিশ নম্বর ঘর তেতলায়। দরজায় নক্ করতেই একজন অদ্ভুতদর্শন লোক দরজা খুলে উঁকি মারল। তার চোখে মুখে সন্দেহের ছায়া।

—আপনি বোধহয় মিস্টার চালিহা? আমি রমাপ্রসাদ রায়ের হত্যার তদন্ত করছি। আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

—কে রমাপ্রসাদ? আমি চিনি না।

চালিহা দরজা বন্ধ করার উপক্রম করতেই বাসব চৌকাঠের ওধারে পা গলিয়ে দিয়ে বলল, চেনেন বৈকি। পুলিশের চেয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা অনেক ভাল। চলুন, ভেতরে গিয়ে কথাবার্তা বলা যাক।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বাসবের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে শৈবাল পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। বাহাদুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছে, বাসব ভোরবেলা বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়েছে, এখনো তার পাত্তা নেই।

বাসব ফিরে এল আরো আধঘণ্টাটাক পরে। শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা।

—ছিলে কোথায়?

—এক জায়গায় কি ছিলাম? প্রথমে গেলাম মিসেস নন্দীর ওখানে, তারপর চালিহার সন্ধানে, তারপর মিঃ রায়ের বাড়ি, তারপর লালবাজার, তারপর 'উইলগার্ড অ্যাণ্ড টেরার' কোম্পানিতে, তারপর—

—উইলগার্ড অ্যাণ্ড টেয়ার কোম্পানিতে কেন?

সেফের সন্ধানে গিয়েছিলাম। দাম একটু বেশি বটে, তবে মজবুত।

—তোমার এই হেঁয়ালী আমার ভাল লাগে না। পরিষ্কার করে কিছু বলার ইচ্ছে বোধহয় নেই?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এ তো রাগের কথা ডাক্তার। আমি যে অনুমানের কথা বলেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তাই ঘটেছিল। চালিহা যাতে বার বার ব্ল্যাকমেল করতে না পারে, তাই তাকে খুন করারই পরিকল্পনা করেছিলেন মিঃ রায়। কিন্তু তিনি নিজেই খুন হয়ে গিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুললেন।

—অরূপবাবু তবে মিথ্যে কথা বলেন নি?

—না। চালিহা টাকার লোভে নির্দিষ্ট সময়েই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এই সময় সে মিঃ রায়কে ওপর থেকে পড়তে দেখে। অরূপবাবুও এসে পড়েন। তাকে বাধ্য হয়েই পিঠটান দিতে হয়।

—তারপর সে গেল কোথায়?

—রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে দেখা হয়ে গেল মিসেস নন্দী আর কণাদ দত্তর সঙ্গে। দুজনকে ওখানে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল চালিহা। যাই হোক, মিস্টার রায়ের দুর্ঘটনাব কথা বলে মিসেস নন্দীকে দুজনে রাজেন্দ্র রোডের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে এল। এই সময় রজনী ওদের দেখেছিল।

বাসব একে একে বলল মিসেস নন্দী আর বিনয় চালিহার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে। মিস্টার রায়ের বাড়ি গিয়ে অরূপের সহযোগিতায় অফিস-ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করতেই, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এক গুপ্ত খোপ থেকে চামড়া-বাঁধানো খাতাটা পেয়েছে—ইত্যাদি।

—হত্যাকারীর সন্ধান নিশ্চয়ই ওই খাতাতেই পাওয়া গেছে?

—পাওয়া যাবে আমিও আশা করেছিলাম। কিন্তু শুধু মাত্র লাভের হিসেব লেখা আছে। টাকাটা কোথায় রাখতেন তার কোন উল্লেখ নেই।

—ওই কয়েক লাখ টাকাই খুনের মোটিভ বলে তুমি মনে করো?

—নিঃসন্দেহে। মজার কথাটা কি জান ডাক্তার, টাকাটা হত্যাকারীব হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে নেই।

—তার মানে?

—সাদা কথায় উইলগার্ড অ্যাণ্ড টেরারের সেফ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি আবার হেঁয়ালী আরম্ভ করেছ!

—টাকা কোথায় রাখা হয়—সেকথা যে মিস্টার রায় কাউকে বলেন নি, হত্যাকারী তা ভালভাবেই জানত। কাজেই তিনি খুন হলে টাকার ব্যাপারে সকলে অন্ধকারেই থাকবে। কিন্তু লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে যে টেকনিক্যাল সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যে পরে তাকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে অব্যর্থ এক সূত্র হিসেবে দেখা দেবে, হত্যাকারী কখনই তা কল্পনা করে নি।

আট-ঘাট সে ভালই বেঁধেছিল। এমন কি অন্য একটা ব্যাপারের আড়াল নিতেও সে কসুর করে নি। তবে তুমি তো জান ডাক্তার, পারফেক্ট ক্রাইম দশ লক্ষে একটা হয় কিনা সন্দেহ।

—সবই যখন বুঝতে পেরেছ, তখন তাকে গ্রেপ্তার করাচ্ছ না কেন?

—কালো টাকা লুকিয়ে রাখার অপরাধে তাকে অবশ্য গ্রেপ্তার করা যায়। খুন যে করেছে তার তো কোন জোরাল প্রমাণ নেই। তাই আমি স্থির করেছি, শ্রীমানকে একটু খেলিয়ে তুলব।

—লোকটা কে?

বাসব কিছু বলার আগেই মিস্টার সামন্ত এসে উপস্থিত হলেন। বসতে বসতে

বললেন, কণাদ দত্তকে তো পাওয়া গেল না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে কলকাতা থেকে চম্পট দিয়েছে।

বাসব বলল, তাকে পাওয়া যাবে। দিল্লীর নাম-করা এক ফার্মের কর্মচারি সে। সুতরাং তার ঠিকানা পেতে অসুবিধা হবে না। তবে বোকার মত যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা।

—এখন আমাদের কর্তব্য কি?

—প্ল্যান অনুসারেই এগোতে হবে। চার ছেড়ে দিয়েছি; মনে তো হয় মাছ টোপ গিলবে। আপাতত ঘণ্টাখানেক এখানেই বসুন। চা-টা খান, তারপর যাওয়া যাবে।

চারটের সময় অরূপ বেরিয়েছিল। রজনীর সঙ্গে এতক্ষণ কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল বাড়িতে। এখন আর কিছু করার নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

—আসতে পারি?

—মুখ ফিরিয়ে অরূপ অবাক হয়ে গেল। দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিরুপম। মুখে ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে কেমন কিন্তু-কিন্তু ভাব।

—আসুন।

ভেতরে এসে নিরুপম বলল, অতীতের কথা আমি আপনাকে ভুলে যেতে অনুরোধ করব। কাকা নেই। এখন আমাদের মিলেমিশে থাকাই ভাল।

—আমার কোন আপত্তি নেই। মিলেমিশে থাকা না থাকাটা নির্ভর করছে আপনার বিবেচনাবোধের ওপর।

সেকথার উত্তর না দিয়ে নিরুপম বলল, পুলিশের ঝামেলা মিটলেই আপনি যাতে উইলের শর্ত অনুসারে টাকাটা তাড়াতাড়ি পান, সে নির্দেশ আমি অ্যাটর্নিকে দিয়ে রেখেছি।

—ধন্যবাদ।

—কিন্তু কাকার হিসেবের বাইরের টাকার কি হবে বলুন তো?

—হিসাবের বাইরে—

—ব্ল্যাকমানির কথা বলছি। ওই কয়েক লাখ টাকা তো এখন আমরাই ভাগ-যোগ করে নিতে পারি—

অরূপ এবার নিরুপমের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারল।

—টাকাটার সন্ধান পেয়েছেন নাকি?

—তার সন্ধান তো আপনার কাছে। কাকা বিশ্বাস করে তাঁর সমস্ত গুপ্তকথা আপনাকে বলেছিলেন।

—শুধু ওই কথাটা ছাড়া।

—আমি কিন্তু আপনার কথা বিশ্বাস করছি না—

—না করলে আমি নিরুপায়। আপনার বোধহয় আর কিছু বলার নেই? এবার আমাকে বিশ্রাম করার সুযোগ দিলে খুশি হব।

নিরুপমের শান্তভাব মিলিয়ে গেল। বলল, আমি একটা প্রোপোজাল নিয়ে এসেছিলাম। অথচ আপনি আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করছেন। ন দেবায় ন ধর্মায় এতগুলো টাকা চলে যাক—এই কি আপনি চান?

—আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি আসে যায়! টাকাটা কোথায় আছে তার সন্ধান পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনাব কাছে চাবি আছে?

—চাবি!

—আমি জানি, বিশেষ এক ধরনের সেফ'এ টাকা রাখতেন মিস্টার রায়। চাবি ছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও সেফ খোলা সম্ভব নয়। গলিয়ে ডালা খুলতে গেলে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। জানাজানি হবে। পুলিশ আসবে।

দ্রুত গলায় নিরুপম বলল, চাবিটা কাকার ঘরে খোঁজাখুঁজি করলে পাওয়া যেতে পারে।

—আমার মনে হয় পাবেন না।

—কেন?

—সে রাত্রে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মিস্টার রায়ের ঘরে একজন মহিলা গিয়েছিলেন। চাবিটা তিনি নিয়ে গিয়ে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

—মহিলা! আপনি কিভাবে জানলেন সেদিন কাকার ঘবে একজন মহিলা গিয়েছিলেন?

—পুলিশের সূত্রে জানতে পেবেছি।

—কাকা তখন বেঁচে ছিলেন?

—বলতে পারব না।

এই সময় ডাঃ সেন ঘরে প্রবেশ করলেন।

অরূপ বলল, আপনাকে দুপুরে আমি ফোন করেছিলাম ডাক্তারবাবু। আজ সকাল থেকে পিঠে বেশ ব্যথা হয়েছে। দেখুন তো ব্যাপারটা কি?

মুখ কুঁচকে নিরুপম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাঃ সেন অরূপকে মিনিট কয়েক পরীক্ষা করে বললেন, ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। একটু সাবধানে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে। ব্যাপারখানা কি বলুন তো, নিরুপমবাবু আপনার ঘরে?

রহস্যময় হেসে অরূপ বলল, স্বার্থের জন্যে মানুষ সব করতে পারে। এ তো অবজ্ঞার পাত্রকে একটু খোসামোদ করা—

রঘুয়া এসে জানাল, পুলিশসাহেব এসেছেন।

আর কথা হল না। দুজনে ড্রয়িংরুমে এসে উপস্থিত হল। বাসব, শৈবাল ও মিস্টার সামন্ত রয়েছেন সেখানে। নিরুপম কথা বলছে।

বাসব বলল, একজন চতুর হত্যাকারীকে ধরা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় নিরুপমবাবু। কিছু সময় লাগবেই। তবে দশ হাজার টাকার চুরির কেসটা হেরাহেরি করে আনা গেছে বলা যেতে পারে।

অরূপ সহর্ষে বলল, বলেন কি? আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। টাকাটা তাহলে পাওয়া যাবে!

—টাকাটা পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারব না। আমি শুধু চোরকে চিনিয়ে দেব।

ডাঃ সেন বললেন, তাহলে তো মালের সন্ধানও পাওয়া যাবে'

—নিরুপমবাবু, আপনি নিজেব স্টেটমেণ্টে ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলেছেন, বাসব বলল। আপনি বলেছেন, সে রাতে মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপনার শেষবাবের মত দেখা হয় সিঁড়ির মুখে। অথচ তদন্ত করে জানা গেছে, আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করে আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল।

নিরুপমের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে ঢোক গিলে বলল, আমার ঠিক মনে ছিল না। কাকার সঙ্গে দু-চার কথা হযেছিল তাঁর ঘরে।

—কি কথা হযেছিল?

—অফিস সংক্রান্ত।

—আপনি আবার সত্য চেপে যাবার চেষ্টা করছেন। মিস্টার রায় আপনাকে কি বলেছিলেন আমরা জানি। রঘুয়া বাইরে থেকে সমস্ত শুনেছিল। প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে চাপে পড়ে তাকে সব কথা বলতে হয়েছে।

—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—টাকাটা কিভাবে এবং কে চুবি করেছে মিস্টার রায় বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। কাঁচা কাজ করলে ধরা পডতেই হয়।

নিরুপম ক্রুদ্ধ গলায় বলল, আপনি অধিকারের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জি। নিজেদের টাকা আমি চুরি করতে যাব কেন?

—যেহেতু অসম্ভব খরচ মিট আপ করবার জন্য আপনার টাকার দরকার ছিল। পুলিশ আপনার গতিবিধি অনুসন্ধান করে দেখেছে। কোম্পানি থেকে যে অ্যালাউন্স পেতেন তাতে আপনার চলত না। বাড়তি টাকা সংগ্রহের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

—মুখ সামলে কথা বলবেন। নিজের মক্কেলের স্বার্থ রাখতে গিয়ে পাগলের মত যা-তা বলছেন কেন?

—নিশ্চিত না হয়ে কাউকে চিহ্নিত করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আজ দুপুরে বাড়ির এবং অফিসের সমস্ত বেয়ারাকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল জানেন বোধহয়? তখন প্রকৃত তথ্য জানা গেছে। মিস্টার রায় লাঞ্চে বেরিয়ে যাবার পরই আপনি তাঁর ঘরে ঢুকেছিলেন। বেয়ারা লক্ষ্মণ তার সাক্ষী। অর্থাৎ তাঁর ফোলিও ব্যাগ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি সংগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। তারপর বাড়ি এসে অরূপবাবুর কাজ করার ঘরে চাবি খুলে ঢোকেন। বাড়ির দুজন বেয়ারা আপনাকে ঘরে ঢুকতে এবং বেরুতে দেখেছে।

নিরুপম গুম হয়ে বসে রইল।

মিস্টার সামন্ত বললেন, গোলমাল এড়াবার একটাই পথ আছে। টাকাটা বাঁকা পথের—ওটা আমাদের হাতে তুলে দিন।

নিরুপম কিছু বলতে পারল না। ঘরে এক অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে

রজনী ও অরূপ হাঁটতে হাঁটতে ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছিল। গতকাল রাত্রে চোর ঢুকে মিস্টার রায়ের শোবার ঘর ওলোট-পালোট করে গেছে—ওদের কথা হচ্ছিল সেই নিয়েই।

রজনী বলল, পুলিশ পাহারা সরিয়ে না নিলে চোর কখনোই ঢুকতে পারতো না।

—চিরকাল তো পুলিশ পাহারা দেবে না। আমি অন্য কথা ভাবছি। চোর আলমারি খুলেছিল অথচ কোন দামী জিনিস নেয় নি! আশ্চর্য নয় কি?

—পুলিশ কি বলছে?

—তারও অবাক। বাসববাবু অবশ্য আমার কথা শুনে একটু হাসলেন।

রজনী দ্রুত গলায় বলল, মিসেস নন্দী—

ওরা ডি এন মিত্র পার্কের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। অরূপ দেখল, পার্কের সামনে কেমন জড়সড় ভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চালিহা কয়েক হাত এগিয়ে গেছে বাসস্টপের দিকে। দুজনে পা চালিয়ে মিসেস নন্দীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন বুঝতে পারা গেল তাঁব চোখে-মুখে রীতিমত ভয়ের চিহ্ন।

—কি হয়েছে?

হাসবার চেষ্টা করে মিসেস নন্দী বললেন, কিছু হয়নি। চালিহার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—আপনাকে দেখে কিন্তু খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে!

—ব্যাপারটা—হয়ত আমার ভুলও হতে পারে।

—কিসের ভুল?

—কাল থেকে একটা লোক আমার পিছু নিয়েছে। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেও যাচ্ছে। অপর ফুটপাথে তাকিয়ে দেখুন। ডোরাকাটা হাওয়াই সার্ট পরা ওই লোকটা—

রজনী ও অরূপ অপর পারে তাকিয়ে দেখল, একটা মোটর পার্টসের দোকানের সামনে ডোরাকাটা হাওয়াই সার্ট পবা একজন লোক নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট টেনে চলেছে। তাকে গুণ্ডা শ্রেণীর লোক বলে মনে হল না। বেশ শান্তশিষ্ট চেহারা।

রজনী বলল, এ তো ভাল কথা নয়। আপনি ভবানীপুর থানায় এখুনি গিয়ে সমস্ত কথা বলুন।

মিসেস নন্দী বললেন, আজ রাতটা দেখি, কাল থানায় যাব। আপনারা কোথায় চললেন?

অরূপ বলল, রজনী বাসায় ফিরছে।

মিসেস নন্দী আর দাঁড়ালেন না। ওদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এগিয়ে চললেন। ওরা তো অবাক। দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা সন্দেহ নেই। ডোরাকাটা হাওয়াই সার্ট পরা লোকটা কিন্তু একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তো তার পিছু পিছু যাবার কোন ইচ্ছে দেখা যাচ্ছে না! ব্যাপারখানা কি?

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় খাওয়া সেরে নিলেন মিসেস নন্দী।

মনের মধ্যে থেকে অস্বস্তি কিন্তু যাচ্ছে না। কণাদ দত্তর প্রস্তাব মেনে নিয়ে দিল্লী যাবার তোড়জোড় করলে ভাল হয়। কলকাতার তথাকথিত সমাজে প্রতিষ্ঠাও ক্রমে আলগা হয়ে আসছে। তার ওপর এই গুণ্ডা—

মিসেস নন্দী ট্রাঞ্জিস্টারের নব ঘোরালেন।

বি-বি-সিতে এই সময় ঐকতানের প্রোগ্রাম থাকে। চড়া সুরের বাজনা মনের মধ্যে হিল্লোল এনে দেয়। প্রায়ই শোনেন মিসেস নন্দী। বেডরুম ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে বড় আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বোধহয় মিনিট দশেকও কাটেনি, দরজায় কে নক্ করল। ফুল ভলিউমে রেডিও বাজতে থাকলে অবশ্য শুনতে পেতেন না।

এত রাতে আবার কে এল? মিসেস নন্দী একই ভাবে বসে রইলেন। আবার নক্ করলে সাড়া দেবেন। মিনিট খানেক পরেই দরজায় দীর্ঘস্থায়ী করাঘাত হল। কণাদ দত্ত কি?

—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল, দয়া করে দরজা খুলুন। আমি লালবাজাব থেকে আসছি।

—এত রাত্রে কি দরকার?

—মিস্টার সামন্ত পাঠিয়েছেন। দরজা খুলুন, সব বলছি!

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মিসেস নন্দী গিয়ে দরজা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। আগন্তুকেব এক ধাক্কায় তিনি কয়েক হাত দূরে আছড়ে পড়লেন। চেয়ারের একটা কোণ শরীরেব একাংশে বিঁধলো। কঁকিয়ে উঠলেন মিসেস নন্দী।

ঝটিতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগন্তুক বলল, চেঁচামেচি করবেন না। আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন।

গলার আওয়াজ কেমন চেরা চেরা। ইচ্ছাকৃত হয়ত। মুখ একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। রুমাল বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে চোখ পর্যন্ত ঢাকা। ঘরে হালকা আলো থাকার দরুন আরো সুবিধাই হয়েছে তার।

ভয়ে আধমরা মিসেস নন্দী। কোনরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললেন, কে আপনি? কি চান?

—চাবিটা চাই।

—কোন্ চাবি?

—মিস্টার রায়ের ঘর থেকে সেদিন যে চাবিটা নিয়ে এসেছেন।

—আমি তো কোন চাবি—

—মিথ্যে কথা বলবেন না। লকারের চাবিটা আমায় দিন।

অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন মিসেস নন্দী, বিশ্বাস করুন, আমি কোন চাবির কথা জানি না।

আগন্তুক পকেট থেকে বড় সাইজের একটা ছুরি বার করল। আবছা আলোতেও তার চকচকে ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন একজনের হাতে নড়েচড়ে উঠছে।

—এবার বলুন!

মিসেস নন্দী প্রায় কেঁদে ফেললেন, আমায় মারবেন না—বিশ্বাস করুন, আমার কাছে লকারের কোন চাবি নেই। আমি তো—এ কি বিপদে পড়লাম আমি?

—বিপদের এখনও কিছুই হয়নি।

বাঁ হাত দিয়ে আগন্তুক মিসেস নন্দীর কাঁধ চেপে ধরল। তারপর ছুরিটা চিবুকের একটু নিচে ঠেকিয়ে বলল, মিথ্যেবাদী মেয়েমানুষ, কেঁদে ককিয়ে পার পাবে ভেবেছো! চাবিটা বার করে দাও। নইলে আমি তোমাকে খুন করে রেখে যাব।

আর চাপতে পারলেন না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মিসেস নন্দী। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, সাধ্য-সাধনা করেও লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কল্পনার শেষ প্রান্তে গেলেও মনে আসতো না এরকম বিপদ দেখা দিতে পারে।

আগন্তুক আর কথা বাড়ালো না। চিবুকের তলা থেকে ছুরি সরিয়ে এনে বাঁট দিয়ে মিসেস নন্দীর মাথায় আঘাত করল। অস্ফুট আর্তনাদ কবে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। আঘাত একটু জোরেই হয়েছিল। সিঁথির পাশ থেকে অবিরাম গতিতে গড়িয়ে চলল রক্ত।

আগন্তুক এবাব ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে খোঁজাখুঁজি করল। সেখানে অভীষ্ট বস্তু না পেয়ে খাটের গদী ইত্যাদি উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর ঘরের চারধার লণ্ডভণ্ড করে দিল। অর্থাৎ যেখানে যা ছিল নির্মমভাবে সরিয়ে দেখে নিল। বাকি রইল শুধু আলমারি। চাবি পাওয়া গেল ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে। আগন্তুক দ্রুত হাতে আলমারি খুলে ফেলল। শাড়ি-ব্লাউজ সমস্ত ফেলতে লাগল টেনে টেনে। প্রতিটি তাক আঁতিপাতি করে খুঁজল। কিন্তু লকাবের চাবি পাওয়া গেল না।

নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়ল আগন্তুক। মূর্ছিতা মিসেস নন্দীর দিকে একবাব তাকাল। মরে যায় নি তো? আর এখানে কিছু করার নেই। উটকো কোন বিপদ আসার আগেই স্থান ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। সে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনি খুলল। পাল্লা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল চারিধার। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। আগন্তুক নিশ্চিন্ত মনে ঘর থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে পা দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে—

—দেখুন তো এই চাবিটা কিনা?

চমকে মুখ ফেরাল আগন্তুক। কাপড়ের আবরণ তখন তার মুখের ওপর ছিল না। সে দেখল, চার-পাঁচ হাত দূরে বাসব দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে বড় সাইজের একটা চকচকে চাবি।

—খুবই কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন ডাক্তার। আমার সন্দেহ ছিল, আপনি হয়তো ফাঁদে পা দেবেন না। ভদ্রমহিলাকে মেরে ফেলেন নি তো?

ডাঃ রেবতী সেন এইরকম নাটকীয় ভাবে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতে পারেন নি। নিদারুণ ভয় মনের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল। তিনি উপায়ান্তর না দেখে ছুটতে আরম্ভ করলেন। এরকম কিছু যে ঘটবে বাসবের অজানা ছিল না। আগেই সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রাখতে হয়েছিল। কিছুদূর দৌড়ে যাবার পরেই ডাঃ সেন ধরা পড়লেন। কয়েকজন কনস্টেবল তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছেন।

বাসব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বলল, আমি সমস্ত দিক থেকে তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার সামন্ত সদলবলে এখন আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। এই চাবিটা নিয়ে উপস্থিত হলেই কয়েক লক্ষ কালো টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

ডাঃ সেন কিছু বললেন না, হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালেন শুধু।

ইতিমধ্যে কার্তিক ঘটক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলেন।

বাসব বলল, অহঙ্কার ভাল জিনিস, তবে অকারণে কাউকে অবজ্ঞা দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এখন নিশ্চয় আপনি তা স্বীকার করবেন মিস্টার ঘটক? আমি আমার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছি। ইনি হলেন প্রকৃত আসামী। এঁকে হ্যাণ্ডকাফ পড়াতে পারেন। আমি এখন বৌবাজার চললাম। মিঃ সামন্ত অপেক্ষা করছেন।

পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যে বাসবের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে রজনী ও অরূপ। ড্রয়িংরুমে বসে কথাবার্তা হচ্ছে। শৈবালও এসে পড়েছে কিছুক্ষণ হল। আহত মিসেস নন্দীকে গতরাত্রেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

অরূপ বলল, কে ভেবেছিল ডাঃ সেনের মত লোক এই সমস্ত কাজ করতে পারেন!

বাসব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ডাঃ সেন অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। লোভ এমন একটা অনুভূতি যা জয় করা সময় সময় মহাপুরুষদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে ওঠে।

রজনী বলল, আপনি কিভাবে কেসটা সল্‌ভ করলেন জানবার খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার!

রজনীর কথায় মৃদু হেসে বাসব আরম্ভ করল, সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ক্রমে অভিজ্ঞতা আমাকে সাহস দিল। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছিলাম অর্থই অনর্থের মূল। রায়মশাই পুলিশকে ভয় পেতেন। ভয় পাবার কারণও ছিল। প্রথম জীবনের দুষ্কর্মের স্মৃতিকে তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। প্রচুর কালো টাকা রোজগার করতেন। কিন্তু বাড়িতে জমা রাখতে সাহস পেতেন না। আমার মনে হতে লাগল, টাকা তিনি কোথায় রাখেন তা একজন জানতে পেরেছিল। লোভের বশবর্তী হয়ে সে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

হত্যার পদ্ধতিতে বেশ অভিনবত্ব ছিল। হোয়েসাইন খেয়ে মারা গেছেন। আবার ওপর থেকেও পড়েছেন। ওপর থেকে পড়ার কারণ অবশ্য আমি আঁচ করেছিলাম। মিস্টার রায় চালিহাকে খুন করার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। লোকটা তাঁর প্রথম জীবনের কুকর্মের সঙ্গী। এতদিন পরে আবার ব্ল্যাক মেলিং আরম্ভ করেছে। এমন একজন বিরক্তিকর সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। তিনি তার সঙ্গে রাত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। আর অপেক্ষা করতে লাগলেন হ্যাঙ্গিং বারান্দায় পিস্তল নিয়ে। সে এলেই তাকে সাবাড় করে দেবেন। তারপর মৃতদেহ গাড়িতে তুলে ফেলে দিয়ে আসবেন কোথাও। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। তার আগেই তাঁর হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হল। তিনি সপাটে পড়লেন ওপর থেকে নিচে।

এখন একটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ওই মারাত্মক তরল পদার্থ নিশ্চয় খান নি! জোর করে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে তাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এত ঝামেলার মধ্যে হত্যাকারী যাবে কেন? সে তো স্বচ্ছন্দে গুলি বা ছোরার সাহায্যে তাঁকে শেষ করে দিতে পারতো! তা যখন হয়নি তখন ধবে নিতে হবে, মিস্টার রায় হত হবার সময় সে ধারে-কাছে ছিল না। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্যে এই পরিকল্পনা ছকে নেওয়া। তবে তাঁর শরীরের মধ্যে ওই ভেষজ গেল কিভাবে? অবশ্য কোন পানীয় বা ওষুধের সঙ্গে তিনি ওটা অজান্তেই খেয়ে ফেলে থাকতে পারেন। তাই সম্ভব। রঘুয়া ঘরের বাইরে থেকে গেলাসের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। অথচ গেলাসটার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ আমাব মনের মধ্যে বিদুৎ খেলে গেল। নিশ্চিতভাবে ওষুধের সঙ্গে বিষ মেশান হয়েছিল। তিনি সেদিন দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় ডাঃ সেনের ওষুধ নিয়ে আসবার কথা। তিনি এসেও ছিলেন। তবে কি—? এই ক্ষীণ সন্দেহই সমস্ত কিছুকে সহজ করে দিল। শোবার ঘরে টিপয়ের ওপর কিছু জলীয় পদার্থ শুকিয়ে ছিল। ওটা বাড়ি নিয়ে এসে পরীক্ষা করতেই বুঝলাম, প্রেসারের রুগীরা যা সময় সময় খেয়ে থাকেন—ভিটাজায়েম, আর তার সঙ্গে মিলে-মিশে রয়েছে হোয়েসাইন। মিস্টার রায় যখন বোতল থেকে ওষুধ গেলাসে ঢালছিলেন, তখন বোধ হয় চলকে টিপয়েব ওপর পড়ে গিয়ে থাকবে। ডাঃ সেন সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না।

হত্যাকারী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি কালো টাকা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা গুপ্ত ড্রয়ার থেকে বাঁকা পথের আয়ের হিসাব রাখা খাতা ও একটা স্টিলের বড় সাইজের চাবি পেলাম। চাবিটার গায়ে খোদাই করা ছিল 'উইল গার্ড অ্যাণ্ড টেরার', অর্থাৎ ওই কোম্পানির তৈবি চাবি। ডাইরেক্টারিতে কোম্পানির ঠিকানা পাওয়া গেল। আমি কিন্তু সেখানে একা গেলাম না। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য একজন পুলিশ কর্মচারিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। বিরাট অফিস। ম্যানেজার আমাদের খাতির করে বসালেন। আমি চাবিটা দেখিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি বললেন, তাঁদের কোম্পানির এক বিশেষ ধরনের দুর্ভেদ্য সেফের চাবি এটা। তবে এই সেফ কাকে বিক্রি করা হয়েছে, ব্যবসার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অবশ্য হেড অফিস দিল্লী থেকে অনুমতি পাওয়া গেলে স্বতন্ত্র কথা। তবে তিনি ক্রেতার নাম না বললেও, কিছু উপকারের কথা বললেন। যেমন, তাঁদের মিস্ত্রী গিয়ে ক্রেতার বাড়ির মেঝেয় সেফ বসিয়ে দিয়ে এসেছে। দুটি বিভিন্ন ধরনের চাবি দিয়ে লকার খোলা সম্ভব। ইত্যাদি। এর মানে দাঁড়াল, যে চাবিটা আমি পেয়েছি, এটা ছাড়া আরো একটা চাবি আছে। সেটা হত্যাকারীর কাছেই থাকা সম্ভব। লকার হয়তো তার বাড়িতেই ফিট করা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় চাবির অভাবে সে টাকা বার করতে পারে নি। ভেঙে ফেলতে গেলে নিশ্চিতভাবে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। জানাজানির ভয়ে সে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে হত্যাকারী দ্বিতীয় চাবিটা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে।

আপনারা টাকা সরিয়ে রাখার ব্যাপারটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন? মিস্টার রায় গৃহচিকিৎসক ডাঃ সেনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। কালো টাকা তাঁর কাছে জমা রাখাই মনস্থ করেন। তাঁর বাড়িতে সেফ বসিয়ে দেন। দুজনের কাছে দুটো চাবি থাকে। কেউ কারুর অনুপস্থিতিতে লকার খুলতে পারবে না। সেনকে বোধহয় মোটা কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই দিন থেকেই মিস্টার রায় পায়ে পায়ে মরণকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার লোভ ডাঃ সেনকে পেয়ে বসেছিল। তিনি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। চালিহা আর কণাদ দত্ত তাঁর মুশকিল আসান করে দিল। এই সময় তিনি মারা গেলে সমস্ত ব্যাপারটা অন্য লাইনে চলে যাবে। পুলিশ তদন্ত করে বুঝবে, এই কাজ চালিহা বা দত্তর। যাই হোক, আমি আবার কাজের কথায় ফিরে আসি। অনেক ভেবেচিন্তে টোপ ফেলতে হল। অরূপবাবুকে লকারের কথা জানিয়ে বললাম, তিনি যেন প্রচার করেন চাবিটা আছে মিসেস নন্দীর কাছে। প্রসঙ্গক্রমে লোভী নিরুপমবাবুকে কথাটা বলা হল, ডাঃ সেনকে বলার প্রয়োজন পড়ল না। কারণ, তিনি অরূপবাবুর ঘরে ঢোকার সময়ই কথাটা শুনলেন। তবু মিস্টার রায়ের ঘর খুঁজে-পেতে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। আমার কথায় পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ডাঃ সেন দুরন্ত রিস্ক নিয়ে তল্লাশি চালালেন। কিন্তু কাজ হল না। তখন তিনি নিশ্চিত হলেন, চাবিটা আছে, মিসেস নন্দীর কাছে। দুজন ওয়াচার ডাঃ সেন ও মিসেস নন্দীর ওপর বসানো হয়েছিল। তারা সব সময় চোখে চোখে রাখছিল দুজনকে। ডাঃ সেন মিসেস নন্দীর ঘরে ঢুকতেই আমরা ফোনে খবর পেলাম। সঙ্গে কিছু পুলিশ কর্মচারি নিয়ে আমি ভবানীপুর চলে এলাম, মিস্টার সামন্ত সদলবলে গেলেন বৌবাজারে সেনের বাড়ি। তারপর কি হয়েছে আপনারা জানেন।

অরূপ বলল, গেলাস আর বোতল কিভাবে অদৃশ্য হয়েছিল তা বললেন না তো?

—মনে হয় কাছাকাছিই তিনি ছিলেন। মিসেস নন্দীকে ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে দেখেছেন। মিস্টার রায় ওপর থেকে পড়ার পরই তিনি ওই পথ দিয়ে গিয়ে গেলাস আর বোতলটা সরিয়ে নেন। সরিয়ে নেওয়া দরকার ছিল। কারণ, ও দুটোই তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার সহায়ক।

অরূপ একটু উসখুস করে, পকেট থেকে চেক বার করে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার মূল্য টাকা দিয়ে হয় না। অবশ্য—মানে—

বাসব চেকটা হাতে নিয়ে বলল, এত সঙ্কোচ করছেন কেন? চমৎকার অঙ্ক সাজিয়েছেন। ধন্যবাদ!

—এবার আমরা উঠি!

—চা'টা না খেয়েই উঠবেন কি রকম? ডাক্তার, দেখ তো বাহাদুর এত দেরি করছে কেন?

শৈবাল সোফা ছেড়ে উঠল।

গোল্ডেন ডোর

বেওয়ারি ইলেকট্রিক ট্রান্সফবমার কেন্দ্রের ঘড়িতে সশব্দে আটটা বাজল। সুখেন্দু আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। এখনও ওর ডিউটি শেষ হতে চার ঘণ্টা বাকি। বারোটার সময় পাণ্ডে আসবে। ছুটি হবে তখন ওর।

সুখেন্দু কলকাতার ছেলে। অনেক চেষ্টা করেছে ওখানে চাকরির। জীবনের তিনটি বছর এ-অফিস ও-অফিস ঘোবাঘুবি করেও কোন কাজ না পেয়ে বিহার ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এতদূর আসবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু উপায় কি?

প্রথমে ওর পোস্টিং হয়েছিল গয়ায়। ওখানে বছরখানেক কাজ করার পর বদলি হয়ে এল এই রেওয়ারিতে। রেওয়ারি কোন শহর নয়। অজ পাড়া-গাঁ বলা চলে। এখানে ট্রান্সফরমার স্টেশন স্থাপিত হবার পর কিছুটা প্রাণ-চাঞ্চল্য এসেছে। এখান থেকেই কাছাকাছি কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহে সহযোগিতা করা হয়।

এই স্টেশন পরিচালনা কবতে খুব বেশি লোকের কিন্তু প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয় অটোমেটিক প্রথায়। কর্মী আছে মোট পনেরোজন। তার মধ্যে আবার দু'জন গার্ড। পালা করে তারা এই কেন্দ্রকে পাহারা দেয়।

সুখেন্দু সিগারেট ধবাল। ওর সামনের বোর্ডে অজস্র সুইচ। বহু বর্ণের আলোকবিন্দু জ্বলছে-নিভছে। দেখতে ভালই লাগে। সুখেন্দুর কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি ছিল না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিল আগামীকালের কথা। অফ ডিউটি আছে। একবার গয়পুর ঘুরে এলে মন্দ হয় না। বহুদিন সিনেমা দেখা হয়নি। কোন একটা হলে ম্যাটিনি শো'র সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হওয়ায় সুখেন্দু চমকে উঠল। ও দ্রুত মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। একজন লোক ওর হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগন্তুকের দেহ ভারি গ্রেটকোটে ঢাকা। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। মুখের নিম্নাংশ রুমাল দিয়ে আড়াল করা। সুখেন্দু প্রথমে কিছু বলতে পারল না।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে অসংলগ্ন গলায় বলল, কে—কে আপনি? এখানে কিভাবে এলেন?

চাপা গলায় আগন্তুক হিন্দীতে বলল, চেঁচিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। ওপাশের ঘরে আরো কয়েকজন রয়েছে। তাদের কানে আপনার কথা যাক, তা আমি চাই না।

কিন্তু আপনি কে?

শেষবারের মত বলছি, আস্তে কথা বলুন। আমার হাতে কি আছে দেখছেন!

সভয়ে সুখেন্দু দেখল আগন্তুক পকেট থেকে রিভলবার বার করেছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠল। কোনদিন এরকম অবস্থায় ওকে যে পড়তে হবে, স্বপ্নেও ভাবেনি।

আ—আপনি কি চান?

সেই কথাই এবার বলব।

আগন্তুক দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

এগিয়ে এল পায়ে পায়ে একেবারে কাছে। বলল, আমার ঘড়িতে এখন আটটা বারো। আর তিন মিনিট পরে রায়পুরকে অন্ধকার করে দিতে হবে।

অ্যাঁ! কি বলছেন!

আমি যা বলছি, তা না করলেই বিপদ ঘটবে। বেশিক্ষণের জন্য নয়, মাত্র দু'মিনিট অন্ধকার থাকলেই আমার কাজ হবে।

কিন্তু...

ট্রিগারের ওপর আমার আঙুল আছে। কথা শুনে চললেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন।

আগন্তুক নিজের বাঁ-হাতের কোটের হাতটা সরিয়ে রিস্টওয়াচটা নিজের দৃষ্টির সামনে রাখল। ডানহাতে অবশ্য যথানিয়মে রিভলবার উদ্যত রয়েছে। সেকেণ্ডের কাঁটা তড়িৎগতিতে এগিয়ে চলেছে। আর সুখেন্দু? জানুয়ারী মাসের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও মিনমিনে ঘামে ভিজে উঠেছে ওর সারা মুখ।

এরকম বিপদেও মানুষ পড়ে? কিন্তু উপায় কি? লোডেড রিভলবারের সামনে অবাধ্যতা প্রকাশ করার অর্থ হল, নিজের জীবনের ওপর যবনিকা ফেলে দেওয়া। লোকটার নির্দেশ মত কাজ করতেই হবে। কিন্তু রায়পুরকে দু' মিনিটের জন্য অন্ধকার করে ওর লাভ কি?

চল্লিশ বছর আগে রায়পুরকে আধা শহর বলা চলতে পারত। এখন পরিপূর্ণ একটি অতি আধুনিক শহর। ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী এই জনপদ স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবেও চিহ্নিত। শহরের একধারে বিশাল আকার নিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে—অন্যধারে বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের শাখা। শীতকালে নানা প্রদেশের অজস্র মানুষ এখানে এসে ভিড় করেন।

এই করণে অনেকগুলি হোটেল গড়ে উঠেছে। গঙ্গার ধারে বা মনোরম পরিবেশেই এগুলির অবস্থান। যাত্রীদের নানারকম সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য এগুলি সুখ্যাতও বটে। অবশ্য ওই হোটেলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল 'গোল্ডেন ডোর', হীরাচাঁদ-রামরতন কনসার্ন এটির পরিচালক।

শেঠ হীরাচাঁদ একজন বিখ্যাত ব্যবসাদার। অভ্রের খনি আছে, টিম্বারের ব্যবসা আছে, এছাড়া ন্যূনপক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দশটি সামগ্রীর তিনি হোলসেলার। হোটেলের ব্যবসাও যে করবেন এরকম ইচ্ছে তাঁর মনের কোণে কোনদিনও দানা বাঁধেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে 'গোল্ডেন ডোরে'র দরজা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হল। এর জন্য দায়ী অবশ্য মগনরাম কেশরী। ব্যবসার জগতে হীরাচাঁদের যোগ্য প্রতিপক্ষ এই কেশরী। দুজনের বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই। ব্যবসাও করেন একই ধাঁচের।

একরকমভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ হীরাচাঁদ শুনলেন, কেশরী গঙ্গার ধারে বিরাট হোটেল ফেঁদেছে। নাম দিয়েছে 'ব্লু ফক্স'। প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তাঁর চিন্তা তত বাড়তে লাগল। চিন্তার কারণ হল, 'ব্লু ফক্সে'র প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। এমন কি ব্যবসাদার মহলেও সকলে বলাবলি করছে, একখানা হোটেলের মত হোটেল রায়পুরকে উপহার দিয়েছেন বটে মগনরাম কেশরী।

হীরাচাঁদ আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

এতকাল প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে থেকে এখন পিছিয়ে পড়বেন? ঘোড়ের চালে তাঁকে কেশরী মাৎ করে দেবে, তা হতে পারে না। তিনিও ওই ব্যবসায় নামবেন। এমন একখানা হোটেল তৈরি করবেন, যা দেখে রায়পুরের লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

মনস্থির করবার এক বছর পরই 'গোল্ডেন ডোরে'র দ্বার উদঘাটন হল। হীরাচাঁদের পার্টনার রামরতনের অবশ্য এই কাজে পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল। রামরতন তাঁর ভাইপো। ছেলেমেয়ে নেই হীরাচাঁদের। এমন কি স্ত্রীও গত হয়েছেন বছর কয়েক হল। নিজের বলতে ভাইপো ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই এই দুনিয়ায়।

আজ সেই 'গোল্ডেন ডোরে'র প্রতিষ্ঠা-তিথি উৎসব।

শহরের গণ্যমান্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন হীরাচাঁদ। প্রতিপক্ষ মগনরাম কেশরীও বাদ পড়েননি। নানা বর্ণের আলোয় হোটেলের বহিরাংশই যে শুধু ঝলমল করছে তা নয়, হলটিকেও সাজানো হয়েছে মনোরমভাবে। বুফে ডিনারের ব্যবস্থা।

অতিথিরা এসে পড়েছেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই।

বিশাল বপু-ডেক্রনের গলা-বন্ধ কোটে সজ্জিত হীরাচাঁদ মহাব্যস্ততার সঙ্গে সকলকে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন। ক্ষীণকায় রামরতন হলের এধার থেকে ওধার ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখনাই ব্যস্ততা তার হাবভাবে উগ্র আকারে প্রকট। জেলা-নরেশ দয়াচাঁদ শারিনই প্রথমে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এই উন্নত মান প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সময়োচিত দু'চার কথা বললেন। এরপর আরো কয়েকজন এগিয়ে এলেন মাইকের কাছে। সবশেষে হীরাচাঁদ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, বার কয়েক ঢোক গিলে সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বুফে ডিনার আরম্ভ হল।

ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন—ওই রোগা লোকটা কে?

মগনরাম কেশরী বসেছিলেন দেওয়ালের ধার ঘেঁষেই। বয়স পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করেছে। তামাটে বর্ণের মাঝারি সাইজের মানুষ। তবে মুখের কঠিন দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রকে কাচের মতই স্বচ্ছ করে তুলেছে। স্পষ্টভাষী হিসেবেও উঁচুমহলে তাঁর খ্যাতি এবং অখ্যাতি দু-ই আছে।

উমানাথের দিকে তাকিয়ে কেশরী বিস্মিত গলায় বললেন, ওকে আপনি চেনেন না? ওই তো রামরতন—হীরাচাঁদের ভাইপো।

উমানাথ মল্লিক কলকাতার নামকরা টিম্বার মার্চেন্ট। কাঠ সংগ্রহ ও ব্যবসার অন্যান্য কাজে বছরের মধ্যে অন্তত বারদশেক তাঁকে রায়পুর আসতে হয়। এখানকার তরাই অঞ্চলের সমস্ত জঙ্গলটা ইজারা নিয়েছেন তিনি। এখানে এলে ওঠেন 'ব্লু ফক্সে।' কেশরীর সঙ্গে তাঁর রীতিমত বন্ধুত্বের সম্পর্ক—হীরাচাঁদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা আছে।

নাম শুনেছিলাম বটে। আগে কখনও দেখিনি। ছোকবাব মুখ-চোখ থেকে যেন ধূর্ততা ঝরে পড়ছে।

প্রথম শ্রেণীর বদমায়েস। কেশরী বললেন, আমাব ভাবতেও খারাপ লাগে, ওই ছোঁড়াটা হীরাচাঁদের উত্তরাধিকারী।

অর্থেকটা ডেভিল মুখের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে, বার কয়েক এ-গাল ও-গাল কবে গিলে ফেলার পর উমানাথ বললেন, কপাল—কপালেব জোরে মশাই কত দুরি-তিরিও তরে যাচ্ছে!

তাই তো দেখছি। একবাব একটা টেণ্ডারের ব্যাপাবে ওর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগেছিল। সেই থেকেই আমি ছোঁড়াটার ওপর দারুণ চটে আছি। শুধু বদমায়েস নয়, আস্ত শয়তান একটা।

একজন সুবেশ তরুণ তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। রাকেশ ভাওলা। গোল্ডেন ডোরের খ্যাতিমান ম্যানেজার। আগে সে আগ্রার কোন প্রসিদ্ধ হোটেলের ম্যানেজমেণ্ট সেকশনে কাজ করত। বছর দুয়েক আগে হীরাচাঁদ তাজ দেখতে গিয়েছিলেন। তখনই আলাপ হয়েছিল রাকেশের সঙ্গে। ছেলেটিকে বিশেষ পছন্দ হওয়ায় ম্যানেজারের পদ দিয়ে নিয়ে এসেছেন নিজের হোটেলে।

রাকেশ মিষ্টি হেসে বলল, কোন অসুবিধা হচ্ছে মা তো আপনাদেব?

কেশরী বললেন, অন্য কোন অসুবিধা নেই, তবে

বলুন? হয়ত সে অসুবিধা আমি দূর করতে পারব।

ওই লোকটাকে হল থেকে বাব করে দিতে পারেন! বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি।

কার কুথা বলছেন?

আপনাদের ছোটকর্তাব কথা বলছি।

রাকেশ রীতিমত ভড়কে গেল। একজন অতিথি এই হোটেলের একজন মালিককে হল থেকে তাড়িয়ে দিতে বলছেন! এরকম অদ্ভুত কথা কেউ বোধহয় কখনও শোনেনি। সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

পারবেন না যে, তা তো আমি জানি। যান, অন্যান্যদের অসুবিধা দূর করুন গিয়ে।

উমানাথও কম অবাক হননি। ঠোঁটকাটা হিসেবে কেশরীর বদনাম আছে। তাই বলে শত্রু-শিবিরে আমন্ত্রিত হয়ে একজন শত্রু সম্পর্কে কটূক্তি করে বসবেন, তা কখনই ভাবা যায় না।

আপনার সাহস আছে মশাই।

এই সাহসের জোরেই রায়পুরে রাজার হালে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি, তা কি আপনি জানেন না?

কথাটা শেষ করেই কেশরী উঠলেন।

কোথায় চললেন?

আসছি।

ওদিকে—

হীরাচাঁদের এই সময় খেয়াল হল, হেড ওয়েটারকে তিনি যেন একবারও হলে

প্রবেশ করতে দেখেননি। এরকম তো হবার কথা নয়। আজকের ডিনারের ব্যবস্থাপনা তারই হাতে ন্যস্ত। কিছুটা বিরক্ত হলেন তিনি। ভাওলা করেটা কি? এ সমস্ত দিকে তার নজর দেবার সময় হয় না?

কাছাকাছি একজন ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে ইশারায় তাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, এনায়েত কোথায়?

আজ্ঞে, সে ডিউটিতে নেই।

কেন?

শরীর খারাপ বোধ হওয়ায় সে ছুটি নিয়েছে।

এই সময় একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে তাঁর দিকে আসতে দেখা গেল। আধময়লা পোশাক পরা লোকটি এই পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান। সে নিজেও বোধহয় তা বুঝেছিল। ত্রস্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

মহাবিরক্ত হয়ে হীরাচাঁদ চাপা গলায় বললেন, তুমি আবার এখানে এলে কেন? মাল তো পৌঁছে গেছে।

হাত কচলাতে কচলাতে সে বলল, আজ্ঞে, তা পৌঁছেছে। তবে...

তবে কি? ভনিতা না করে যা বলবার তাড়াতাড়ি বল।

কর্তা পাঠালেন রসিদের জন্যে।

টাকা পেয়েও বলব পাইনি—এই তোমার কর্তাদের ধারণা? বসিদের জন্যে একটা রাত সবুর করা গেল না!

আজ্ঞে হিসাব অডিটে যাবে, তাই—

থাক, আর কথা বাড়িও না। রসিদ আমার পকেটে রেডিই আছে। বিল এনেছ?

লোকটি তাড়াতাড়ি বিল এগিয়ে দিল। হীরাচাঁদ বিল পকেটস্থ করে রসিদ দিলেন, তারপব হাতের ইশারায় তাকে বিদায় হতে বললেন। এরকম অসময়ে রসিদের জন্য তাগাদা পাঠানোকে অত্যন্ত অশোভন কাজ বলে তিনি মনে করলেন। কাল সকালেই 'গুপ্তা ব্রাদার্স'কে বেশ করে ধাতানো দরকার।

কল-গুঞ্জনের সঙ্গে বুফে ডিনার তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে।

ডাঃ ঘোষাল জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, ক'টা বাজল মিস্টার লাল?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ লাল বললেন, ঠিক সওয়া আটটা।

তাঁর কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই হলের প্রতিটি আলো একই সঙ্গে নিভে গেল। এক সেকেণ্ড নিস্তব্ধতার পরই কোলাহল আরম্ভ হল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, বারান্দাতেও আলো দেখছি না—হোটেলের সার্কিট গেল নাকি?

এখানে-ওখানে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যেই হোটেলের কর্মচারীরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এখন কি করণীয় বুঝে উঠতে পারছে না। সকলের গলা ছাপিয়ে এই সময় কে বলে উঠল, সমস্ত শহর অন্ধকার হয়ে গেছে। চিন্তার কারণ নেই, আলো এল বলে।

সত্যিই তাই। আচম্বিতে আবার আলো জ্বলে উঠল। অসংখ্য বাল্বের তেজ বিরাট

হলকে যেন ঝলসে তুলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সকলে। আজকের মানুষ কৃত্রিম আলোকে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি সকলকে দাঁড়াতে হল যার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না।

একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সকলকে প্রথমে সচকিত করে তুলল।

একি! কাকা—কাকা ওখানে এমন করে পড়ে কেন?

অনেকেই এবার দেখতে পেয়েছেন, কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা হীরাচাঁদকে। রামরতনের আর্তরব সকলের কানেই গিয়েছিল। হলের অন্যান্য ধারে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হুড়মুড় করে ঘটনাস্থলে এগিয়ে এলেন। গোটা কয়েক চেয়ার এধার-ওধার ছিটকে গেল। সামনের সারিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে ভয়ে নীল হয়ে উঠেছেন।

হীরাচাঁদের ভারী শরীরের তলা থেকে গাঢ় রক্ত কার্পেটের ওপর বেশ কিছুটা গড়িয়ে এসেছে। শরীর নিথর, নিষ্কম্প। হতবুদ্ধি ভাবটা কেটে যাবার পরই অর্থহীন চিৎকারে ভরে উঠল সমস্ত ঘর। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশ লালই একমাত্র মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি দ্রুত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি কালবিলম্ব না করে এই শোচনীয় পরিস্থিতিকে প্রাথমিকভাবে সামলাবার জন্য অগ্রসর হলেন।

তিনি চিৎকার করে বললেন, আপনারা নিজেদের উত্তেজনা দমন করুন। পরিস্থিতি অত্যন্ত গম্ভীর। এখন আমাদের ধৈর্যের দরকার।

লালের কথায় সকলে চুপ করলেন।

ডাক্তার ঘোষাল, ওঁকে পরীক্ষা করে দেখুন তো!

ডাঃ ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে নীলডাউন হয়ে হীরাচাঁদের দেহ পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, মারা গেছেন।

এতক্ষণ ধারণা ছিল, বুঝি হীরাচাঁদ আহত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে আছেন। মারা গেছেন শুনে রামরতন হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। অন্যান্যরা বিচিত্র এক অনুভূতিতে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। রায়পুরের অভিজাত মহলের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন এক বিমূঢ়তা আর কখনো দেখা যায়নি।

লাল আরেকবার সকলকে শান্ত হবার অনুরোধ জানিয়ে রাকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার ভাওলা, পুলিশকে সংবাদ দিন।

রাকেশ ছুটল অফিসঘর থেকে ফোন করতে।

পুলিশ আসছে। আপনারা কেউ হলের বাইরে যাবেন না, তদন্তের অসুবিধা হতে পারে তাতে।

ভেঙে-পড়া মনোভাব নিয়ে যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই টাউন থানা থেকে ইন্সপেক্টর চৌরাসিয়া উপস্থিত হলেন সদলবলে। বড়কর্তাও যে এই পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। স্যালুট জানালেন তাঁকে।

লাল বললেন, এই হত্যাকাণ্ড তাঁর উপস্থিতিতেই ঘটেছে। তবে অন্ধকার থাকায়

কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি। যা হোক, চৌরাসিয়া সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ করুন।

অনুমতি নিয়ে প্রথমে সকলকে সার্চ করা হল। রিভলবার বা আর কোন অস্ত্র কারুর কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এবাব বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিয়ে এজাহার নিতে আরম্ভ করলেন চৌরাসিয়া। এজাহাব শেষ হতে রাত এগারোটা বেজে গেল, আলো নিভে যাবার সামান্য আগে হীবাচাঁদ একজন আধময়লা পোশাক পরা প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ ছিল না।

একজন ওয়েটার নিজের স্টেটমেন্টে বলল, হীরাচাঁদ তার কাছ থেকে হেড ওয়েটার এনায়েতের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইছিলেন। তখনই সেই লোকটি আসে। দুজনের মধ্যে কি কথা হয়েছিল শুনতে না পেলেও, কর্তা একবার 'গুপ্তা ব্রাদার্স' বলে উঠেছিলেন, তা ওর কানে গিয়েছিল।

বাকিদের কাছ থেকে কোন প্রয়োজনীয় কথা সংগ্রহ করা গেল না। সকলকে ছেড়ে দেওয়া হল এবার। আমন্ত্রিতরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। চৌরাসিয়াকে পরের দিন ভোরে দেখা করতে বলে লালও বিদায় নিলেন।

এবার এনায়েতের ডাক পড়ল। হোটেল কম্পাউণ্ডের মধ্যেই কর্মচারিদের জন্য একটি বাড়ি আছে। সেখানে ও থাকে। মন্থব পায়ে এসে সে দাঁড়াল ইন্সপেক্টরের সামনে।

সারাটা সন্ধ্যা তুমি কোথায় ছিলে?

আমি নিজের ঘরেই ছিলাম ইন্সপেক্টাব সাব।

আজ এত বড় পার্টি ছিল। ডিউটিতে আসনি কেন?

দুপুরের পর আর শরীর বইল না। বমি হয়ে গেল বার কয়েক। আমি ছুটি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলাম।

আর কোন প্রশ্ন না করে ওকে যেতে বললেন চৌরাসিয়া। তারপর হল সীল করে বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। হীরাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ কিভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহরে। এত রাত হয়ে যাওয়ার পরও হোটেলের সামনে তখন লোকে লোকারণ্য।

থানায় ফেরার পথে চৌরাসিয়া ভাবতে লাগলেন, হঠাৎ ইলেকট্রিক ফেল করবে, তা আগে থেকে হত্যাকারীর জানার কথা নয়। তবে সে তৈরি হয়েই পার্টিতে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আলো নিভে যাওয়ায় সুযোগটা চমৎকারভাবে নিতে পেরেছে। তবে তৈরি হয়েই যখন গিয়েছিল, তখন আলো না নিভলেও অন্য কোন উপায়ে সে নিজের কাজ সারত। কিন্তু সমস্যা হল, অস্ত্রটা পাওয়া গেল না কেন? হত্যাকারী নিশ্চয় ওই বিরাট হলের কোথাও না কোথাও সেটাকে লুকিয়ে রেখেছে। ভালভাবে ঘরখানাকে সার্চ করা দরকার।

পরের দিন সকালে এস. পি. মিঃ লালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চৌরাসিয়া গুপ্তা ব্রাদার্সে গেলেন। নানা ধরনের মাল দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার ব্যবসা তাদের। তারা অনেক দিন থেকে হীরাচাঁদ-রামরতন কনসার্নের সঙ্গে কারবার করছে।

গুপ্তা ব্রাদার্সের সিনিয়ার পার্টনার রামকুমার গুপ্তা বললেন, শেঠ হীরাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ গত রাতেই লোক-পরম্পরায় তিনি পেয়েছেন। সত্যি, খুবই দুঃখের কথা। শেঠজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রায় বিশ বছরের। আজকের দিনে এ-রকম এককথার ব্যবসাদার বড় একটা দেখা যায় না।

চৌরাসিয়া প্রশ্ন করলেন, পার্টি চলাকালীন ওখানে একজন কর্মচারিকে কেন পাঠিয়েছিলেন বলুন তো?

বাহান্ন হাজার টাকার নানা ধরনের মাল ওঁদের কাছ থেকে কিনেছিলাম আমরা। মালও সকালে ডেলিভারি পাওয়া গিয়েছিল। দুপুরে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—রসিদটা আনতে পাঠিয়েছিলাম সন্ধ্যায়।

টাকা দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে রসিদ নেননি কেন?

অনেকদিনের কারবার দুই কোম্পানির। বিশ্বাসটাই হল বড় কথা। এমন বহুবার হয়েছে, পেমেন্টের এক সপ্তাহ পরে রসিদ পেয়েছি। লোক চিনেই ব্যবসা করি।

এবার তবে রসিদের জন্য আপনাদের এত তাড়া ছিল কেন?

হিসাব অডিটে যাবে। সমস্ত কিছু আপ টু ডেট কবে রাখার জন্য একটু ব্যস্ততা ছিল। তাই লোক পাঠিয়েছিলাম।

রসিদ পেয়েছেন?

তা পেয়েছি।

চৌরাসিয়া আরো দু'চার কথার পর ওখান থেকে বিদায নিলেন। থানায পৌঁছবার পর এক বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাঁকে। কিছুক্ষণ আগে রেওয়ারি পাওয়ার স্টেশন থেকে একজন কর্মচারি এসে অভিযোগ কবে গেছে, গতকাল রাত আটটা পনেরয় একজন লোক রিভলবার দেখিয়ে রায়পুরের আলো দু' মিনিটের জন্য নিভিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। মুখে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকায়, রিভলবারধারী আগন্তুককে চেনবার উপায় ছিল না।

একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে এনকোয়ারি করতে পাঠিয়ে দিয়ে চৌরাসিয়া দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। দুটো ঘটনা কি একই সূত্রে গাঁথা? হত্যাকারী কি নিজেব কোন সঙ্গীকে আটটা পনেরয় শহরের আলো নিভিয়ে দেবাব জন্য ওখানে পাঠিয়েছিল? মনে হচ্ছে তা-ই!

গত সন্ধ্যায় আলো নাও নিভতে পারত। প্রতিদিনই কাবেন্ট ফেল করে না। হত্যাকারী সেই অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর করে কাজে কখনই নামতে পারে না। সে সমস্ত কিছু করেছে একটা নিটোল প্ল্যানের মাধ্যমে। কিন্তু কে হতে পারে লোকটা? এত জটিল প্ল্যানকে যে নিখুঁতভাবে কার্যকরি করেছে, সে কোন হেঁজিপেঁজি মানুষ হতে পারে না।

নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে পরিস্থিতিকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যালোচনা করলেন চৌরাসিযা। কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারলেন না। একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর দীর্ঘ চাকরি-জীবনে এমন জটিল কেসের মুখোমুখি আর হননি। এই সময় তাঁর ঘরে রামরতনবাবুকে ধীর পায়ে ঢুকতে দেখা গেল। শীর্ণ মানুযটিকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

আসুন শেঠজী।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে রামরতন বললেন, কোন সন্ধান পেলেন?

এত ব্যস্ত হলে কি চলে? অনুসন্ধান চলছে।

কাকাকে খুন করে একজন গা ঢাকা দিয়েছে—আমি ব্যস্ত হব না, কি বলছেন?

আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করব বলুন, এত তাড়াতাড়ি এ রকম জটিল খুনের কেস সল্‌ভ করা সম্ভব নয়।

আমি জানি কে করেছে।

চৌরাসিয়া প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, বলেন কি? কাল তো এজাহার দেবার সময় কিছু বললেন না?

তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কি যে আপনাদের বলেছি, আমার নিজেরও মনে পড়ে না।

আপনার কাকে সন্দেহ?

চাপা গলায় রামরতন বললেন, সন্দেহ নয়, দৃঢ় বিশ্বাস। এ কাজ নিশ্চিতভাবে মগনরাম কেশরীর।

আপনি ব্লু ফক্সের ওনারের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। লোকটা চিরকাল কাকাকে হিংসা করে এসেছে।

হিংসা তো অনেকেই করে অন্যাকে। তাই বলে সকলেই কি হিংসার পাত্রকে খুন করতে পারে? শুধু সন্দেহ হলে চলবে না শেঠজী। প্রমাণ কিছু আছে হাতে?

স্থুল প্রমাণ কিছু নেই। তবে—

কংক্রিট প্রমাণ হাতে না পেয়ে কাউকে দোষী বলাটা ঠিক নয়। যা হোক, আমি আপনার সন্দেহটা যাচাই করে দেখব। এবার গোটাকয়েক অন্য প্রশ্ন করি। অনুগ্রহ করে ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন।

রামরতন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মনে হল।

বিরস গলায় বললেন, বলুন?

আপনার কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে?

না।

আপনার কাকার ছিল?

বছর তিনেক আগে তিনি অনেক কষ্টে রিভলবারের লাইসেন্স যোগাড় করেছিলেন। তবে—

শেষ পর্যন্ত রিভলবার কেনা হয়নি বুঝি?

হয়েছিল। তবে গতকাল বিকেলে উনি আমায় বলেছিলেন, রিভলবারটা খুঁজে পাচ্ছেন না।

তারপর?

আমি বলেছিলাম, যাবে আর কোথায়? ভাল করে খুঁজে দেখ। অন্য কোথাও রেখেছ হয়ত। উনি উত্তর দিলেন, তাই হবে। পার্টিটা চুকে যাক, তারপর খুঁজে দেখব।

আপনারা দুজন একই বাড়িতে থাকতেন নিশ্চয়?

আগে তাই থাকতাম। সদর বাজারের বাড়িতে বছর খানেক ধরে আমি, আমার স্ত্রী আর বাচ্চাটা থাকি।

উনি কোথায় থাকতেন?

কি খেয়াল হল, একদিন হোটেলে উঠে গেলেন। গোল্ডেন ডোরে একটা স্যুট ওঁর জন্য আলাদা করা ছিল।

মেয়েদের প্রতি ওঁর কোন দুর্বলতা ছিল নাকি?

না, সে সমস্ত কিছু ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে একটু-আধটু হুইস্কি খেতেন। নিয়মিত ভাঙ খাওয়ার অভ্যাস ছিল।

আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কাকার হত্যাকারীকে ধরবার সব রকম চেষ্টাই আমরা করব।

রামরতন আর কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

হীরাচাঁদ খুন হওয়ার পর একমাস কেটে গেছে।

চৌরাসিয়া নানা চেষ্টা করেও হত্যাকারীকে ধরতে পারেননি। রেওয়ারি পাওয়ার স্টেশনে যে হানা দিয়েছিল তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। এই দুটি ব্যাপারই এখন শহরের বহুল আলোচিত বিষয়। প্রদেশের দুটি দৈনিক এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। হত্যাকারী ধরা না পড়ায় পুলিশকে যে ধিক্কার দেওয়া হয়নি, এমন নয়।

সেদিন ডাঃ ঘোষাল কল পেয়ে এসেছিলেন রামরতনের বাড়ি।

রুগী দেখার পর তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলতে চাই!

বলুন না?

আপনার কাকার হত্যার এখনও কোন কিনারা হল না। ব্যাপারটা এতদিন ঝুলে থাকবে আমি ভাবতে পারিনি।

আমি কি করব বলুন? পুলিশকে তো বলেছিলাম, এ কাজ মগনরামের। তারা তেমন গা করল না।

প্রমাণ না পেয়ে কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা তো ঠিক নয়। সকলে কি বলাবলি করছে জানেন?

কি বলছে?

হীরাচাঁদজীর মৃত্যুতে আপনারই হাত আছে। সমস্ত কিছু তাড়াতাড়ি ভোগ দখল পেয়ে গেছেন।

উত্তেজিতভাবে রামরতন বললেন, বলেন কি? লোক এই সমস্ত অপবাদ দিচ্ছে আমায়! পুলিশ যদি হত্যাকারীকে ধরতে না পারে, তাহলে আমি কি করব বলুন তো?

অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন না! হত্যাকারী চিরকাল চোখের আড়ালে থেকে যাক, এটা তো ঠিক নয়। আমি বলছিলাম—অবশ্য কিছু টাকা খরচ হতে পারে—

খরচেব জন্য কিছু আটকাবে না, আপনি বলুন।

কলকাতা থেকে সুবিখ্যাত বাসব ব্যানার্জিকে আনিয়ে প্রাইভেট এনকোয়াবির ব্যবস্থা করুন। আমার বিশ্বাস, তিনি হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারবেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ? বেশ তো, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?

যদি বলেন, আমি কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। হীরাচাঁদজীর হত্যাকারীকে ধরবার জন্য আমাকে এটুকু কষ্ট স্বীকার করতেই হবে।

আপনি প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষীর মত কথা বলেছেন ডাক্তারবাবু। তাহলে আজকের গাড়িতেই চলে যান।

এরপর দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা হল। বাসব যদি আসতে রাজি হয়, তাহলে কোথায় এনে তাকে তোলা হবে, তাও স্থির হয়ে গেল। ডাঃ ঘোষাল বিদায় নিলেন বেলা এগারোটার সময়। তাঁর ট্রেন বিকেলে।

'গোল্ডেন ডোরে'র সবচেয়ে ভাল ঘরখানাই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে রায়পুর পৌঁছল সকাল সাড়ে আটটায়। যদিও ডাঃ ঘোষাল সঙ্গে ছিলেন, তবু হোটেলের ম্যানেজার রাকেশ ভাওলা ওদের রিসিভ করতে গিয়েছিল স্টেশনে।

হাল্কা কিছু খেয়ে নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ওরা বিশ্রাম করে নিল। হাজার আরামে আসা যাক, তবু ট্রেন জার্নির একটা ধকল আছেই। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল চুপচাপ। তারপর বলল, হোটেলখানা চমৎকার, কি বল ডাক্তার?

শৈবাল জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ছোট শহরে এরকম সর্বাধুনিক হোটেলের কথা ভাবাই যায় না।

শেঠ হীরাচাঁদের রুচিবোধ ছিল স্বীকার করতেই হবে। তবে আমার কি মনে হয় জান, টাকা থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে রুচি আপনা থেকেই এসে যায়।

দরজায় কে নক করল।

ভেতরে আসুন।

রাকেশ ঘরে প্রবেশ করে বলল, শেঠ রামরতনজী ফোনে জানতে চাইছেন, কখন তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

তিনটের পর এলেই হবে।

রাকেশ বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাসব আবার বলল, এই ঘরের বয়কে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো—

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বছর পঁচিশেকের এক ছোকরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ আগে খাবার পরিবেশনের সময় তাকে অবশ্য আরেকবার দেখা গিয়েছিল। সপ্রতিভ ভাবে এসে দাঁড়াল সে।

তোমার নাম কি?

প্রভুদয়াল।

চমৎকার নাম! তুমি বোধহয় শুনে থাকবে, শেঠজীব হত্যাকারীকে ধরবাব জন্যই আমরা এখানে এসেছি?

প্রভুদয়াল ঘাড় নেড়ে জানাল, সে শুনেছে।

যেদিন শেঠজী খুন হন, সেদিনকার সমস্ত কথা তোমাব মনে আছে?

মনে আছে সাব।

তুমি হলের মধ্যে একবাবও গিয়েছিলে?

না সাব, সেদিন আমার ডিউটি ছিল না।

দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তোমার কিভাবে সময় কেটেছিল?

গ্রাম থেকে আমার একজন আত্মীয় এসেছিল—তাকে নিয়ে ঘরেই ছিলাম। তারপব ছ'টার শো'য়ে সিনেমা দেখতে যাই। ফিরে এসে শুনলাম শেঠজীকে কে খুন করেছে।

বাসব বুঝল কথাবার্তায় অত্যন্ত পটু প্রভুদয়াল।

এনায়েত কি তোমার সঙ্গেই থাকে?

আমার তিনটে ঘরের পবে থাকে সাব।

সেদিন যখন তুমি সিনেমা যাচ্ছিলে, তখন এনায়েতকে তার নিজের ঘবে দেখেছিলে? খুব ভেবে বল!

একটু ভেবে প্রভুদযাল বলল, সে নিজের ঘরে ছিল না। যতদূর মনে পড়ছে দরজায় তালা ঝুলছিল।

পুলিশ তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?

না, সাব।

আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হল, তা অন্যকে বললে কিন্তু বিপদে পড়বে।

প্রভুদয়াল চলে যাবার পব শৈবাল বলল, ব্যাপার কি? ওয়েটার এনায়েতকে নিয়ে তুমি তদন্তের সূত্রপাত করলে নাকি?

ডাক্তার ঘোষালের মুখ থেকে আমরা মোটামুটি ঘটনাটা শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে, খুন এবং আলো নিভিয়ে দেওয়া—এই দুটো বিষয় একই সূত্রে গাঁথা। এত বড় পার্টিতে এনায়েতের ডিউটিতে আনুপস্থিত থাকাটা আমি সন্দেহজনক মনে করি। প্রভুদয়াল যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছ, তার অসুখটা অজুহাত মাত্র—

তুমি বলতে চাও, এনায়েত হত্যাকারীর সহকারি? তার নির্দেশে ও রায়পুরের পাওয়ার স্টেশনে গিয়েছিল?

এই মুহূর্তে আমি জোর দিয়ে কিছুই বলতে চাইছি না। শ্লেটে নয়, আকাশে দাগ কাটছি বলতে পার। চল, ওঠা যাক।

কোথায়?

হোটেলটা ঘুরে-ফিবে দেখলে মন্দ হয় না।

দুজনে ঘর থেকে বেরোল। তারপর এ-বারান্দা ও-বারান্দা, এ তলা ও-তলা করে হোটেলের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াল। সত্যি, মনোরম পরিকল্পনার মাধ্যমে এটিকে খাড়া করা হয়েছে। ঘরে ঘরে নানা প্রদেশের অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।

শেষে ওরা একতলার কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে তখন কয়েকজন নবাগত ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা নিয়ে রাকেশ বিশেষ ব্যস্ত ছিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাঁদের কয়েকজনকে বয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের দিকে তাকাল রাকেশ।

বলুন?

বাসব বলল, আপনি ব্যস্ত না থাকলে আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হতে পারত—

এখন আর ব্যস্ততা নেই। আসুন, অফিসঘরে গিয়ে বসি।

রাকেশ ওদের অফিসঘরে নিয়ে গেল।

বসুন। দু'কাপ কফি আনতে বলি?

দরকার হবে না। আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই লাঞ্চ সেরে আমরা একটু বেরোব। কাজের কথাটুকু তাহলে সেরে নিই। শেঠ হীরাচাঁদ তো হোটেলেই থাকতেন। দুর্ঘটনার দিন একবারও হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন কি?

রোজ সকাল আটটায় যেমন বেরোতেন, সেদিনও তেমনি বেরিয়েছিলেন। তবে প্রতিদিন ফিরতেন রাত ন'টায়, কিন্তু সেদিন ফিরে এসেছিলেন বেলা দুটোর সময়।

দুপুরে খেতেন কোথায়?

হোটেল থেকেই অফিসে খাবার পাঠানো হত।

সেদিন দুটো থেকে পার্টির আগে পর্যন্ত ওঁর অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

দুটো থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত তিনি নিজের স্যুটেই ছিলেন। তারপর হলে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করতে থাকেন।

দুটো থেকে ছ'টার মধ্যে ওঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল কি?

উমানাথ মল্লিক এসেছিলেন জানি। আর কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য রামরতনবাবু কয়েকবার তাঁর স্যুটে গিয়েছিলেন।

উমানাথ মল্লিকে কে?

একজন নামকরা টিম্বার-মার্চেণ্ট।

থাকেন কোথায়?

কলকাতা থেকে এখানে এলে 'ব্লু ফক্সে' ওঠেন। সেদিন পার্টিতেও আমন্ত্রিত ছিলেন।

এখন এখানে আছেন কি?

এখন তো ওঁর বিজনেসের সিজিন, এখানেই আছেন মনে হয়।

আরো দু'চার কথার পর ওরা নিজেদের ঘরে ফিরে এল।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে থানায় পৌঁছল দেড়টার সময়। চৌরাসিয়া তখন থানায় ছিলেন না। বাসব কার্ড পাঠিয়ে দিল তাঁর কোয়ার্টারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাধারণ পোশাকে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, বাসবের খ্যাতির কথা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

কুশল-বিনিময়েব পব চৌরাসিয়া বললেন, ওঁরা আব আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না। কেসটা জটিল সন্দেহ নেই। এক হিসেবে অবশ্য ভাল হল, আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনার সহযোগিতা ছাড়া কিছু করতে পাবব বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে, বেসবকারী তদন্তের অনুমতি নেওয়া হয়ে গেছে। সকলের স্টেটমেণ্টের ওপর চোখ বোলাতে পারি কি?

নিশ্চয়ই।

চৌরাসিয়া দেরাজ থেকে মোটা একটা খাতা বার কবে এগিয়ে দিলেন। বাসব মন দিয়ে পড়ল অনেকক্ষণ ধবে। তারপর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে চিন্তিতমুখে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। চৌরাসিযা ও শৈবালের মধ্যে তখন নিচু গলায় কথা হচ্ছিল।

পোস্টমর্টেমেব রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?

বাসবের প্রশ্নেব উত্তরে চৌরাসিয়া বললেন, তেমন কিছু নয়। খুব কাছ থেকে পয়েণ্ট থার্টি টু বোর দিয়ে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। গুলিটা পাওয়া গেছে শরীবের মধ্যেই।

সংশ্লিষ্ট কার কার রিভলবার আছে?

অনুসন্ধান করে দেখেছি কারোরই নেই। হীরাচাঁদের অবশ্য ছিল। তবে সেটাও নাকি তিনি হারিযে ফেলেছিলেন।

ভেরি ইণ্টারেস্টিং। এ সংবাদ কে দিল আপনাকে?

রামতনবাবু বলেছিলেন। পার্টি শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে হীরাচাঁদ একথা জানিয়েছিলেন।

হুঁ! খুনের মোটিভ কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?

সহাস্যে চৌরাসিয়া বললেন, ভিক্‌টিম একজন অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। খুন হওয়ার পক্ষে এটাই কি বড় কারণ নয়?

কিন্তু ওই সঙ্গে তো আমাদের জানা দরকার, কি পরিমাণ অর্থ তাঁব খোযা গেছে! গুপ্তা ব্রাদার্স থেকে সেদিন তিনি যে বাহান্ন হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়েছেন কি?

রামরতনবাবুব কাছ থেকে জানতে পেরেছি টাকা ওঁদের তহবিলে জমা হয়েছে।

তাহলে তো চিন্তার কথা হল!

কেন? টাকাটা তো খোয়া যায়নি!

খোয়া গেলেই আমি খুশি হতাম ইন্সপেক্টর। অন্তত মোটিভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। ওঁর স্যুট থেকেও বোধহয় কিছু হারায়নি?

দেখে-শুনে রামরতনবাবু তো তা-ই বললেন। স্যুট এখনো সীল করা আছে, আপনি দেখতে চাইলে—

কাল সকালের দিকে যদি হোটেলে আসেন, তাহলে দেখার সুবিধা হয়।

বেশ!

বর্তমানে আব কাজের কথা ছিল না। বাসব ও শৈবালকে অবশ্য চৌরাসিযা তখনই

ছাড়লেন না। ধরে নিয়ে গেলেন নিজের কোয়ার্টারে। কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চ-পর্ব সমাধা হওয়া সত্ত্বেও ওদের মিষ্টিমুখ না করিয়ে তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে ওদের বেলা চারটে হয়ে গেল।

রামরতন সাড়ে তিনটের মধ্যেই এসে পড়েছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন অফিসঘরে। বাসব ওঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে গেল। কয়েক মিনিট সাধারণ আলাপের পর কাজের কথা আরম্ভ হল।

গুপ্তা ব্রাদার্সের লোক টাকা নিয়ে ক'টার সময় এসেছিল আপনি জানেন?

আমি তাকে দেখিনি। সন্ধ্যার মুখে কাকা আমায় বলেছিলেন, টাকা নিয়ে লোক এসেছিল সাড়ে তিনটের সময়।

টাকার কথা শুনেছিলেন। টাকা যে অফিস-তহবিলে জমা হয়েছিল, তা আপনি তাহলে প্রত্যক্ষ করেননি?

না।

খুন হওয়ার পর বোধহয় অফিসের লেজারে ওই টাকার অঙ্কের উল্লেখ দেখেছেন?

না।

বিস্মিত গলায় বাসব বলল, সেকি! তাহলে আপনি পুলিশকে কিভাবে বললেন, টাকাটা অফিস-তহবিলে জমা হয়েছে?

ইতস্ততঃ করতে লাগলেন রামরতন।

আপনাদের স্বার্থেই আমি এখানে এসেছি। আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেললে তদন্ত সঠিক পথে চালিত করা যাবে না। খুলে বলুন সমস্ত। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও কাজে লাগাবার অভিপ্রায় আমার নেই।

বার কয়েক ঢোক গিলে রামরতন বললেন, পুলিশকে ওকথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কেন?

আমরা প্রচুর ব্ল্যাকমানি সংগ্রহ করি নিশ্চয় অনুমান করেছেন। খাতায় বাহান্ন হাজার টাকা জমা পড়েনি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল আমাদের যেখানে ব্ল্যাকমানি জমা থাকে, কাকা কোন কারণে টাকাটা সেখানে রেখেছিলেন। তাই পুলিশকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

পরে গুণে দেখেছেন কি, আপনার অনুমান ঠিক কিনা?

মৃদু হেসে রামরতন বললেন, হিসেব করে ব্ল্যাকমানি রাখা সম্ভব হয় না ব্যানার্জিবাবু। গুণে দেখে কি হবে? কাকা ওখানে সেদিনের বাহান্ন হাজার টাকা রেখেছিলেন কিনা তা মোটেই বুঝতে পারা যাবে না।

ব্ল্যাকমানি কি আপনারা এই হোটেলেই কোথাও রেখে থাকেন?

না। তবে কোথায় রাখা হয় সে-প্রশ্ন করবেন না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়ার জাল বুনল। তারপর বলল, এনায়েত এখানে কতদিন থেকে কাজ করছে?

বছর খানেক থেকে?

ওকে আপনারা সংগ্রহ করেছিলেন কিভাবে?

এনায়েত আগে 'ব্লু ফক্সে' কাজ করত। ওখানে কিসের জন্য যেন ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। কাকা ওকে হোটেলের হেড ওয়েটারের পদ দিয়েছিলেন।

আপনার সঙ্গে কথা শেষ হলে অনুগ্রহ করে তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না।

কেন?

সে দিন দশেকের ছুটিতে আছে। আগামী সপ্তাহে তার কাজে যোগ দেবার কথা।

কে ছুটি দিল তাকে?

আমি।

কাজটা ভাল করেননি। এই কেসে সে একজন অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র বলে আমার বিশ্বাস। এখন সে ফিরে না-ও আসতে পারে!

মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে সে ছুটি চাইল, কি করে 'না' বলি বলুন?

যাক, যা হবার হয়ে গেছে। হোটেলের খাতায় তার ঠিকানা পাওয়া যাবে। এবার বলুন তো, এ ব্যাপারে আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেন?

আমি ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। কাকার মত নির্বিরোধ লোকের খুন হয়ে যাওয়াটা রীতিমত বিস্ময়কর। তবে—

এই সময় দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাকেশ বলল, শেঠজী, মগনরাম কেশরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এরকম একটা সাক্ষাৎকারের জন্য রামরতন প্রস্তুত ছিলেন না।

বিস্মিত গলায় বললেন, আমার সঙ্গে! পাঠিয়ে দাও।

রাকেশ চলে যাবার পর তিনি বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপার কিছুই বুঝছি না। লোকটা আমাদের ঘোর শত্রু। কি মনে করে দেখা করতে এসেছে কে জানে।

তাঁকে এখানে আসতে বলে ভালই করলেন। হয়ত এতদিন পরে তিনি মিত্রতার হাত বাড়িয়ে আসছেন।

মগনরাম কেশরী ঘরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আরেকজন রয়েছেন। শৈবাল খুঁটিয়ে দেখল কেশরীকে। অভিজাত চেহারা বলতে যা বোঝায়, তার অধিকারী তিনি। সাজ-পোশাকেও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গী পুরুষটিও কম যাঁন না।

ঘরের চারধারে সতর্কভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কেশরী বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা ছিল—

গম্ভীর গলায় রামরতন বললেন, এঁদের সামনে বলতে পারেন।

আমি এই হোটেলের ব্যাপারেই এসেছিলাম।

হোটেল!!

একে নিশ্চয় চেনেন? উমানাথ মল্লিক—মাল্টি-মিলিওনিয়ার। আপনার কাকার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল।

বিলক্ষণ চিনি। আমাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কারবারও করে থাকেন। কিন্তু আপনি হোটেলের কথা কি বলছিলেন?

মিস্টার মল্লিক আপনার 'গোল্ডেন ডোর' কিনে নিতে চান।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন রামরতন। বাসব এবং শৈবালও কম অবাক হল না। মিনিট খানেক পরিপূর্ণ স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করার পর, নিজেকে সামলে নিয়ে রামরতন বললেন, আমি হোটেল বিক্রি করছি, আপনাকে কে বলল?

কেউ না। শেঠ হীরাচাঁদের প্রখর ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল। আপনার কিন্তু তা নেই। এত ভাল হোটেলটা নষ্ট হয়ে যাবে! তাই একজন উপযুক্ত ক্রেতা এনেছিলাম।

কেশরীর ফিচকেল বুদ্ধি এবং সাহস দু-ই আছে, এ সম্পর্কে বাসব নিশ্চিত হল। এদিকে রামরতনের মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠেছে। ওই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ তাঁকে সাপটে ধরল। শরীর কাঁপতে আরম্ভ করেছে। কি উত্তর দেবেন প্রথমে স্থির করতে পারলেন না।

শেষে রাগ চেপে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি আমার হোটেলে এসে আমাকেই অপমান করছেন।

কেশরী মুখে বিচিত্র শব্দ করে বললেন, ছি, ছি, ছি! এ কি বলছেন রামরতনজী? অপমান আবার করলাম কোথায়? খোলামনে ব্যবসার কথা বলেছি। এতে কিন্তু আপনার রাগ করা উচিত নয়।

আপনার মনের ভাব আমি ভাল রকমই জানি। শুনে রাখুন, হোটেল আমি বেচব না। আর ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমার আছে কিনা, তার পরিচয় আপনি ক্রমে ক্রমে পাবেন।

ভাল কথা। খুবই ভাল কথা। শেঠ হীরাচাঁদের ভাইপোর মুখে এই রকম কথাই শোভা পায়। আমরা এখন তাহলে আসি!

বাসব বলল, দাঁড়ান, আপনাদের সঙ্গে কথা ছিল!

দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছিলেন কেশরী। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি! ওহো, কেসটা তদন্ত করতে আপনিই বোধহয় কলকাতা থেকে এসেছেন?

ঠিকই বলেছেন। ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার শৈবাল রায়।

নমস্কার! পুলিশ তো হালে পানি পেল না। আপনি একজন নামকরা লোক শুনেছি। দেখুন, যদি হত্যাকারীকে ধরতে পারেন!

আপনি আমার নামের সঙ্গে পরিচিত জেনে খুশি হলাম। চেষ্টার ত্রুটি হবে না। অবশ্য এই সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতা চাই।

রামরতন বললেন, আমাকে বোধহয় আর দরকার নেই? যেতে পারি?

যান। পরে আবার কথা হবে।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর কেশরী গোল্ডফ্লেকের বাক্স এগিয়ে ধরলেন।

চলে নাকি?

চলে। তবে পাইপ। আপনি তো সেদিন পার্টির একজন গেস্ট ছিলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আপনি যা শুনেছেন, তার এক বর্ণও বেশি জানি না। বড় ব্যবসাদারের শত্রুর

অভাব হয় না। বন্ধুর মুখোস-পরা এমনি কোন লোক হীরাচাঁদকে খুন করেছে বলে আমার ধারণা।

হতে পারে। আচ্ছা, সেদিন কোন ব্যতিক্রম আপনার চোখে পড়েছিল?

তেমন কিছু মনে পড়ছে না। আমি আর মল্লিকবাবু গল্পগুজব করে সময় কাটিয়েছি। আগে থেকে খুন হবার কথা জানা থাকলে একটু সজাগ নিশ্চয় হতাম।

আপনি ব্যাপারটাকে খুব লাইটলি নিয়েছেন মনে হচ্ছে। যা হোক, এনায়েত নামে একজন ওয়েটার আপনার হোটেলে কাজ করত কি?

করত বোধহয়। কেন, বলুন তো?

তাকে তাড়ানো হয়েছিল কেন?

'ব্লু ফক্সের' ম্যানেজার কাশ্যপ বলতে পারে, আমি ওসবের কিছু জানি না।

আপনার হোটেলে তাহলে একদিন যেতে হচ্ছে।

নিশ্চয় আসুন। ব্যাপারটা কি বলুন তো? এনায়েতের সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?

আমার তদন্ত করার পদ্ধতিই এই রকম। চতুর্দিক বাজিয়ে দেখি।

বাসব পাইপ ধরাল।

মিস্টার মল্লিক, আপনি কি সত্যিই 'গোল্ডেন ডোর' কিনতে চাইছেন?

উমানাথ মল্লিক থেমে থেমে বললেন, মিস্টার কেশরী বলছিলেন, রামরতন হোটেলটা চালাতে পারবে না। তাই ভাবলাম, যদি সুবিধা মত দরে পাওয়া যায় তাহলে কিনে নেব।

হুঁ! আপনি সেদিন—মানে পার্টির আগে দুপুরবেলা এসেছিলেন?

এসেছিলাম।

হীরাচাঁদের সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়, বলতে আপত্তি আছে কি?

কিছুমাত্র না! আমি ওঁর কাছে এসেছিলাম, আমার পুরো মাল ট্রাকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারবেন কিনা জানতে। উনি আমায় পরের দিন অফিসে ডেকেছিলেন।

আর কোন কথা হয়নি?

বাজার মন্দার কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, একসময় বলেছিলেন, ওঁর রিভলবারটা নাকি পাচ্ছেন না। ওটা খুঁজে না পেলে খুবই মুশকিলে পড়বেন। আইনের চোখে লাইসেন্স করা অস্ত্র হারানো বিরাট বড় এক অফেন্স।

ধন্যবাদ! আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

ওঁরা উঠলেন। বাসবকে ব্লু ফক্সে আসবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে দুজনে বিদায় নিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কফির ট্রে নিয়ে প্রভুদয়াল ঘরে এল। গরম পানীয় দুজনেরই তখন অভিপ্রেত ছিল।

একসময় কফি শেষ করে শৈবাল বলল, মগনরাম কেশরী অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক।

বুদ্ধিমান এবং সুবিদাবাদীও। আমার দৃঢ় ধারণা, রামরতনকে ও শান্তিতে কখনই ব্যবসা করতে দেবে না।

হীরাচাঁদের মৃত্যুতে কেশরী খুশি হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে ওই সঙ্গে রামরতনও খুশি হয়েছে। ধনকুবের কাকারা পথ থেকে সরে যান, এটা অনেক ভাইপোই মনে-প্রাণে চেয়ে থাকে।

দেখ ডাক্তার, একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা দারুণ স্বার্থপর, আবার সেই সঙ্গে ভীতুও। রামরতনকে সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমাদের বিচার করতে হবে।

তুমি বলতে চাও.

বর্তমানে আমি কিছুই বলতে চাই না। এখন কত চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে, তা কি বুঝতে পারছ না?

শৈবাল সহজেই বুঝতে পারল, বাসব এখন আর কিছু বলবে না। মনের অতলান্তে হাবুডুবু খাবে এখন নানা সূত্রের সন্ধানে।

পরের দিন সকালে চৌরাসিয়া এলেন। তাঁকে আগেই বলা ছিল। সীল ভেঙে বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন হীরাচাঁদের স্যুটে। মনে হল, মহা শূন্যতা বিরাজ করছে সেখানে। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার দরুন ধুলোর আস্তরণ পড়েছে চতুর্দিকে।

বাসব চারধার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। হীরাচাঁদ যে ঘরে শুতেন, সেখানে আসবাবের কোন বাড়াবাড়ি নেই। খাট, গদরেজের আলমারি আর ড্রেসিং-টেবিল। আগেই জানা গিয়েছিল, ওঁর রিভলবারটা নাকি ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে থাকত।

ঘরে নির্ভরযোগ্য কিছু না পাওয়ায় বাসব কিছুটা নিরাশ হল। স্যুট বন্ধ করে ইন্সপেক্টর বিদায় নেবার পর ওরা নেমে এল নিচে। কাউণ্টারের সামনে তখন ভিড় ছিল না। রাকেশ চোখ বোলাচ্ছিল দৈনিকপত্রে। ওদের দেখে কাগজ সরিয়ে রেখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল।

বাসব বলল, এনায়েতের ঠিকানাটা আমার দরকার ছিল।

সে তো ছুটিতে আছে।

রাকেশ একটা মোটা খাতা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, কি ব্যাপার মিস্টার ব্যানার্জি? এনায়েত কি—

ওকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। একবার বাজিয়ে দেখা দরকার।

ঠিকানা পাওয়া গেল। নিচা মহল্লায় থাকে। একুশ নম্বর বাড়ি। নিচা মহল্লায় রিক্সায় যাওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি খোঁজ নিয়ে বাসব প্রশ্ন করল, লোকটার সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে পারেন?

তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা আমি জানি না, তবে, সে কাজের লোক। ওবিডিয়াণ্ট কর্মচারি বল্‌তে যা বোঝায়, সে তাই।

দুর্ঘটনার দিন সে কি সত্যিই অসুস্থ ছিল?

আমাকে অত্যন্ত পেটের গোলমালের কথা বলেছিল। আমি গোটাকয়েক সালফাগুয়ানিডিন খেতে দিয়েছিলাম তাকে।

হুঁ! ও কিন্তু বিকেলের পর থেকে নিজের ঘরে ছিল না বলে খবর পেয়েছি। যাক ওকথা। আপনি আগে কোথায় চাকরি করতেন?

আগ্রার একটা হোটেলে—রিজ ইণ্টারন্যাশনাল। হীরাচাঁদজী আমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসেন।

আমাকে একটা রিক্সা ডাকিয়ে দিন মিস্টার ভাওলা। আমি একবার ব্লু-ফক্সে যাব। এনায়েত আগে ওখানে কাজ করত। ওর সম্পর্কে কিছু সংবাদ ওখানে পাওয়া যেতে পারে।

রিক্সার কি দরকার? আপনি হোটেলের গাড়িতে যান।

সেই ভাল। ডাক্তার, তুমি ঘরেই থাক, আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

রাকেশ বাসবকে পোর্টিকোর দিকে নিয়ে গেল।

বাসব গোল্ডেন ডোরে ফিরে এল বেলা পাঁচটার সময়।

শৈবাল বিশেষ চিন্তার মধ্যে ছিল। সকাল দশটায় বেরিয়েছে ব্লু ফক্স থেকে ঘুরে আসছে বলে—এত দেরি হবার কারণটা কি? দুপুরের খাওয়াটা সারলই বা কোথায়? যা হোক, চিন্তার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে বাসব কাঁটার কাঁটায় পাঁচটার সময় হাসিমুখে দেখা দিল।

এতক্ষণ ছিলে কোথায়? আমার কি রকম চিন্তা হচ্ছিল তা কি বুঝতে পারনি? শৈবাল ঘরে একা ছিল না, রামরতনও ছিলেন।

আর বল কেন, ভীষণ জড়িয়ে পড়েছিলাম। কাজটা অবশ্য শেষপর্যন্ত মিটেছে। শেঠজী, ট্রাঙ্কে কলকাতা কতক্ষণে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

আমরা তো সাধারণতঃ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পাই।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কোথাও ট্রাঙ্ককল করবে নাকি?

হ্যাঁ।

কেসটার কতদূর কি হল ব্যানার্জিবাবু?

রামরতনের কথার উত্তরে বাসব বলল, ব্যস্ত হবেন না শেঠজী, ধীরে ধীরে কাজ ঠিকই এগিয়ে চলেছে। আচ্ছা, কেশবী লোকটা কেমন বলুন তো? মানে

বলেছি তো লোক ভাল নয়। তবে মানুষ খুন করার মত সাহস আছে কিনা বলতে পারব না।

একসময় প্রভুদয়াল এসে জানাল, উকিলবাবু এসেছেন। কথাটা শোনা মাত্র রামরতন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কি ব্যাপার? উকিল?

উকিল নয়, মনে হয় এটর্নি। হীরাচাঁদের বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারেই বোধহয় এসেছে। ওকথা থাক, খুনের মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলতে পার ডাক্তার?

তুমিই বল শুনি?

অর্থ-অনর্থম।

অর্থাৎ গুপ্তা ব্রাদার্সের বাহান্ন হাজার টাকা?

ওই সঙ্গে হয়ত আরো টাকা। এদিকে প্রভুদয়ালের জন্যে যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দেখ তো, চা দিয়ে যাচ্ছে না কেন?

এবপর দুটো দিন বাসব ও শৈবালের শুয়ে-বসে কাটল।

গোল্ডেন ডোর থেকে এক-পা বাইরে বেরোয়নি ওবা। নিজেদের ঘরে বই পড়ে আর গল্প করে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ইন্সপেক্টব চৌরাসিয়া এসেছিলেন দু'বার। তাঁর সঙ্গে কিছু সলাপরামর্শ হয়েছে।

আজ রাতটা ওরা হোটেলে থাকবে না এই রকম কথা ছিল। মগনরাম কেশরী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং একটা রাত ব্লু ফক্সে কাটাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বাসব রাজি হয়নি। বলেছে, এখন নয়। কলকাতা ফেরার দিন আপনার হোটেলে লাঞ্চ সেরে যাব।

সন্ধ্যা কিছু আগেই উতরে গেছে।

রাকেশ কাউণ্টারেই ছিল। সারাটা দিন আজ তাব বেশ পরিশ্রম গেছে। কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাই। এই বকমই হয এক একদিন। কাজেব চাপে স্নান-খাওয়ার অবসর পাওয়া যায না। সবে ও সিগারেট ধরিয়েছে, উমানাথ মল্লিক কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মল্লিক বললেন, ভাওলা, আপনাব সঙ্গে কিছু কথা আছে।

বলুন?

এখানে নয়। আপনার অফিসঘরে চলুন।

বিস্মিত রাকেশ উমানাথকে নিয়ে অফিসঘরে গেল।

বলুন এবার।

আপনি বোধহয় জানেন না, আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই আপনার ভালর জন্যেই একটা প্রস্তাব দিতে চাই।

প্রস্তাব!

এখানে কত টাকা মাইনে পান, আমি জানি। এর চেয়ে অনেক ভাল মাইনের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। আরো স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটাতে আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন?

আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতার্থ মিস্টার মল্লিক। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারিনি।

এটুকু নিশ্চয় আগেই বুঝতে পেরেছেন, শেঠ রামরতনের সাধ্য নেই গোল্ডেন ডোরকে টিকিয়ে রাখার। মালিকানা ভাল না হলে কোন হোটেল সুনামের সঙ্গে চলতে পারে না। তাই বলছিলাম, আপনি ব্লু ফক্সে চলে আসুন।

কিন্তু...

কিন্তু কি বলুন?

ব্লু ফক্সের মালিক তো শেঠ মগনরাম। আপনি...

কেউ যা জানে না সেই কথাটাই আপনাকে বলি, ওই হোটেলে আমারও শেয়ার আছে। এখুনি পাকা কথা চাইছি না। আপনি চব্বিশ ঘণ্টা ভাবুন, তারপর না হয় বলবেন।

এই সময় একজন দীর্ঘদেহী লোক ঘরে প্রবেশ করল।

তাকে দেখে বিস্মিতগলায় রাকেশ বলল, তোমার তো আজ আসবার কথা নয় এনায়েত? তোমার চিঠি অবশ্য আজই আমি পেয়েছি।

এনায়েত ভারি গলায় বলল, ছ'দিন ছুটি আমার আরো ছিল। প্রভুদয়াল গিয়ে বলল মালিক আজই ডেকেছেন, তাই চলে এলাম। আপনি চিঠির কথা কি বলছিলেন?

উমানাথ বললেন, আমি তাহলে এখন উঠি মিস্টার ভাওলা। কাল এই সময় আপনাকে ওখানে আশা করব।

রাকেশ কিছু না বলে, চেয়ার ছেড়ে তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তিনি অফিসঘরের বাইরে এসে বাসব ও শৈবালকে দেখতে পেলেন। ওরা কাউণ্টার ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন।

হ্যালো, মিস্টার মল্লিক!

হ্যালো—হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি।

কি ব্যাপার, ছুটতে ছুটতে চলেছেন?

ইয়ে মানে...একটু ব্যস্ত আছি। চলি, পরে দেখা হবে।

তিনি দ্রুত অদৃশ্য হলেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, যে যার তালে।—এস, ডাক্তার।

দশ মিনিট পরে।

এনায়েত কথা শেষ করে অফিসঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছে—বাসব, শৈবাল ও চৌরাসিয়া প্রবেশ করলেন। এনায়েত অজানতেই দু-পা পেছিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করতেই চৌরাসিয়া তার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, তোমার নাম এনায়েত?

হ্যাঁ, সাব।

তোমাকে শেঠ হীরাচাঁদের হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে এনায়েতের মুখ কালো হয়ে উঠল। এখন কি বলবে, প্রথমে বোধহয় স্থির করতে পারল না। তারপর কোনরকমে বলল, খুন! শেঠজীকে আমি খুন করিনি সাব।

বাসব বলল, নিজের হাতে যে তুমি খুন করনি, তা আমরা জানি। তবে তোমার সাহায্য না পেলে শেঠ হীরাচাঁদ হয়ত সেদিন খুন হতেন না। এ সম্পর্কে আপনার কি মত মিস্টার ভাওলা?

আমার?—শীর্ণ গলায় রাকেশ বলল, এ সবের আমি কি জানি?

জানেন বৈকি! পাওয়ার স্টেশনে গিয়ে এনায়েত নির্দিষ্ট সময়ে আলো নিভিয়ে ফেলার ব্যবস্থা না করলে, আপনি কি পার্টি চলাকালে হীরাচাঁদকে খুন করতে পারতেন?

তীক্ষ্ণ চিৎকারে সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তুলল রাকেশ।

আপনি নিজের অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছেন! আমি—

আমার অধিকারের বিস্তার কতটা, তা আমি সব সময় মনে রাখি মিস্টার ভাওলা। চমৎকার প্ল্যান করেছিলেন, আঁটঘাটও বেঁধেছিলেন ভালই। তবু ফাঁক রয়ে গিয়েছিল।

আসল কথাটা কি জানেন, নিখুঁত ক্রাইম করাটা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা তাহলে এখন নিজেব ঘবে যাই ইন্সপেক্টব।—এস, ডাক্তাব।

ইতিমধ্যে এনায়েতের হাতে হ্যাণ্ডকাপ পবিয়েছিলেন চৌরাসিয়া। এবার রাকেশকে দ্রুতহাতে লোহাব বাঁধনে আটকালেন। বলা বাহুল্য, অফিসঘরের দবজার অপরপ্রান্তে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছেন।

পরের দিন সকালে বাসবের ঘরে ছোটখাট একটা বৈঠক বসেছে। ওরা দুজন ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত রযেছেন রামরতন, ডাঃ ঘোষাল ও ইন্সপেক্টর চৌরাসিয়া। বাসবদের আজ সন্ধ্যাব ট্রেনে ফেরার কথা।

ডাঃ ঘোষাল বললেন, রাকেশকে আপনি কিভাবে সন্দেহ করলেন, তা কিন্তু এখনও বলেননি?

সমস্ত কথাই আপনাদের বলব। বাসব পাইপটা সেণ্টারটপের ওপর রেখে বলল, আমার তদন্তের পদ্ধতি হল ছোটখাট বিষয়গুলির ওপর সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া। পার্টি চলাকালীন এনায়েতকে অনুপস্থিত দেখে হীরাচাঁদ বিস্মিত হয়েছিলেন। সে সত্যিই অসুস্থ ছিল কিনা এই প্রশ্নটাকেই আমি বড করে দেখলাম। কারণ, বিভলবার দেখিয়ে শহবের আলো নেভানো, আব খুনেব মধ্যে একটা যোগাযোগ যেন দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং হত্যাকারীর একজন সাহায্যকাবী নিশ্চযই আছে। প্রভুদয়ালকে জেবা করে জানা গেল, সন্ধ্যাব সময় এনায়েত নিজেব ঘরে ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ ঘনীভূত হল তাব ওপব।

এদিকে, ছোট্ট একটা ব্যতিক্রম রাকেশকে সন্দেহের জালে জড়িয়ে ফেলল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'সেদিন দুপুবে কে কে দেখা কবতে এসেছিল শেঠ হীরাচাঁদের সঙ্গে?' বাকেশ বলেছিল, উমানাথ মল্লিক ছাডা আর কেউ নয়। পরে জানতে পারলাম, গুপ্তা ব্রাদার্সের কর্মচারিও এসেছিল। এই বিযযটা চেপে যাবার অর্থ কি? এবার আমি মূল ঘটনার উৎসমুখের আঁচ পেলাম। হয়ত ওই বাহান্ন হাজার টাকার জন্যই হীরাচাঁদ প্রাণ দিয়েছেন। তাই রাকেশের ভীত মন আমার কাছে প্রকাশ করতে সাহসী হয়নি কর্মচারি আসার কথাটা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, হীরাচাঁদ যে টাকাটা হোটেলেই রেখেছিলেন, তার প্রমাণ কি? সঙ্গত প্রশ্ন। তবে সঙ্গত উত্তরও আমার কাছে রয়েছে। শেঠজী দুটোয হোটেলে এসেছিলেন। গুপ্তা ব্রাদার্সের কর্মচারি এসেছিল তার পরে। ব্যাঙ্কের লেনদেন কাঁটায় কাঁটায় দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার উপায় ছিল না—তাছাড়া আমৃত্যু তিনি এখান থেকে বেরোননি। কাজেই নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া চলে টাকাটা হোটেলেই ছিল।

এতটা বলার পর বাসব থামল।

আর সকলে একাগ্র মনে শুনছেন। বাসব আবার আবম্ভ কবল, মনে হয় এইভাবে কেউ মাঝে মাঝে টাকা হীরাচাঁদকে হোটেলে দিয়ে গেলে তিনি ম্যানেজারের কাছে জমা রাখতেন সে-রাত্রের মত। ধীবে ধীরে রাকেশেব লোভ উগ্র হয়ে উঠেছে। এনায়েত কিভাবে তার অংশীদার হয়ে উঠল বলতে পারব না। তবে স্থির হয়েছিল বোধহয়,

এবার মোটা অঙ্কের টাকা এলেই তা আত্মসাৎ করতে হবে. ওই সঙ্গে অবশ্য হীরাচাঁদকে সরাতে হবে। না হলে তিনি বুঝতে পারবেন কে টাকা নিয়েছে।

যাই হোক, আমি ওদের দুজনের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলাম। এনায়েতের ভুল ঠিকানা দিয়েছিল রাকেশ। আমি ব্লু ফক্স থেকে আসল ঠিকানা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। জায়গাটা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে। আমার কাছে সে কোন কথাই ভাঙল না। তখন অন্য পথ ধরতে হল। রেওয়ারি যাওযার কোন ট্রেন নেই। সেদিন পার্টি ছিল, হোটেলের মোটরে যাওয়া নিশ্চয় সম্ভব হয়নি। চৌরাসিয়ার সাহায্যে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে খোঁজ খবর করলাম। জানা গেল, সেদিন সন্ধ্যায় একজন রেওয়ারি গিয়েছিল এবং মিনিট কুড়ির বেশি ওখানে অপেক্ষা করেনি। ড্রাইভার যাত্রীর যে বর্ণনা দিল, তা হুবহু এনায়েতের সঙ্গে মিলে যায়। আমি গেলাম তার কাছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাকে সনাক্ত করবে—একথা জানিয়ে চেপে ধরলাম। এবার সে ভয় পেয়ে গেল। তবু মুখে কিছু স্বীকার করল না। ইতিমধ্যে আমাকে আরেকটা কাজ করতে হল। আমার অনুরোধে চৌরাসিয়া আগ্রা পুলিশকে ট্রাঙ্ককলে জানালেন, ভাওলা সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ তাঁর চাই। আগ্রায় যে হোটেলে সে কাজ করত, তার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কাজেই খোঁজ-খবর নিতে ওখানকার পুলিশের অসুবিধা হল না।

জানা গেল, ভাওলার মামা আগ্রার একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। তার চেষ্টাতেই সে রিভলবারের লাইসেন্স পেয়েছিল। কেন সে তখন এই মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েছিল, তা জানা যায়নি। সুযোগ-সুবিধা পেলেই ওখানকার হোটেলের টাকা সরাতো। তবে সেসব অতি সামান্য অঙ্কের। কর্তৃপক্ষ বার বার তাকে ক্ষমা করেছেন। এবার ব্যাপারটা সোজা হয়ে এল। বুঝতে পারা গেল, ওই রিভলবারে সায়লেন্সার লাগিয়ে কাজ সেরেছে ভাওলা। এনায়েত ব্যবহার করেছিল হীরাচাঁদের অস্ত্রটা। হোটেলের 'মাস্টারকী' দিয়ে শেঠজীর স্যুট খুলে ওটা সরাতে ভাওলার কোন অসুবিধা হয়নি। আপনারা এবার নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন. ঘটনাটা কিভাবে গড়িয়েছিল। আমার মনে হয়, অসময়ে কোন টাকা এসে পড়লেই হীরাচাঁদ ভাওলার কাছে সেদিনের মত জমা রাখতেন। রতনে রতন চেনে। সুতরাং এনায়েতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে তার অসুবিধা হয়নি। তারপর প্রথম সুযোগেই দুজনে কাজ হাসিল করেছে।

একনাগাড়ে এতটা বলার পর বাসব থামল।

রামরতন বললেন, এনায়েত তো ছুটিতে ছিল। কাল যে সে এখানে আসবে, জানলেন কিভাবে?

হাত-গুণে নিশ্চয়ই নয়! আসল কথা, কায়দা করে আমিই তাকে এখানে এনেছিলাম। কায়দাও আবার তেমন ঘোরাল নয়। এনায়েতের বকলমে একটা চিঠি পাঠালাম ভাওলাকে। হিন্দীতে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিল একজন কনস্টেবল। চিঠিতে জানানো হয়েছিল, এনায়েতের আরো টাকা চাই। নইলে সে আসল ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে দেবে। শীগগিরই সে আসছে টাকা নিতে। ভাওলা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

হযত সুযোগ পেলে সে এনাযেতকে পথ থেকে সবিযে দিত। এদিকে আমি প্রভুদযালকে পাঠালাম এনাযেতেব কাছে। সে গিযে বলল, মালিক আজ সন্ধ্যায ডেকেছেন বিশেষ প্রযোজনে। তাবপব কি ঘটেছে আপনাবা সবই জানেন।

শৈবাল বলল, উমানাথ আব কেশবীব হাবভাব ওবকম সন্দেহজনক ছিল কেন?

ওটা প্যাঁচালো স্বভাবেব বাইবেব ৰূপ ডাক্তাব। আসলে ওঁবা এই চালু হোটেলটাকে নষ্ট কবাব চেষ্টায বযেছেন।

বামবতন বললেন, ওঁদেব সে সাধ পূর্ণ হবে না। আমি 'গোল্ডেন ডোবে'ব প্রতিষ্ঠাব জন্য প্রাণপাত কবব। কাকাব আত্মা তাতে সুখী হবে। হত্যাকাবী ধবা পডেছে—এতে যে আমি কি আনন্দিত, তা ভাষায প্রকাশ কবতে পাবব না। কৃতজ্ঞতাব মূল্যস্বৰূপ আমাব এই সামান্য ভেট

পকেট থেকে চেক বাব কবে তিনি এগিযে ধবলেন। বাসব হাত বাডিযে চেকটা নিযে, অঙ্কেব ওপব চোখ বুলিযে বলল, ধন্যবাদ বামবতনজী। সামান্য কই, ভেট তো বেশ অসামান্য অঙ্কেব দেখছি। খুশি হলাম।

এতক্ষণ পবে চৌবাসিযা বললেন, আজ থেকে গেলে হত না?

উপায নেই, অনেক কাজ পডে বযেছে। জটিল একটা ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ! আবাব না হয আসব।

কথা শেষ কবে বাসব পাইপ আব মিক্সচাব নিযে ব্যস্ত হযে পডল।

পঙ্কিল প্রণয়

কালীকিঙ্করবাবুর ঘুম আসছিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন অনেকক্ষণ ধরে। সমস্ত দিন খাটাখাটুনি কম হয় না—সারা রাত তাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাতেই তিনি অভ্যস্ত। আজ তার ব্যতিক্রম হবার কারণ বোধহয় নতুন জায়গায় রাত কাটাচ্ছেন। আগেও কতবার অনুভব করেছেন, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র রাত কাটালে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

তিনি এতদিন যেখানে ছিলেন, সেখানে আজ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাই ঘুম চোখের কানাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না। অবশ্য কালীকিঙ্করবাবু জানেন এই কারণটিই কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। মনের নিদারুণ দুশ্চিন্তাই তাঁকে এইভাবে জাগিয়ে রেখেছে। তাই মনে হচ্ছে ফেলে-আসা সন্ধ্যায় রেবতী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর না দেখা হলেই ভাল হত। ওই ধুরন্ধর লোকটি যে তাঁকে এক ঘোরালো পরিবেশের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেছে, তখন তিনি বুঝতে পারেননি।

কালীকিঙ্কর নিয়োগী হাওড়ার এক গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশ আগে। আজকের ভাষায়, বড় এক জোতদারের ঘরকে তিনি আলো করেছিলেন বলা চলে। দুরন্ত প্রশ্রয়ের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুণ লেখাপড়া বিশেষ হল না। তবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার দরুণ সেই গণ্ডগ্রাম তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে এসেছেন নগর কলকাতায়।

পৈতৃক টাকা আর বুদ্ধির জোরে পরবর্তী কালে ঠিকেদারির মাধ্যমে প্রচুর আয় করেছেন। পরিচিতজনেরা বলে, সাদা ও কালো মিলিয়ে লাখ দশেক টাকা তাঁর আছে। তবুও তাঁর জীবন পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারেনি। বিয়ে করেছিলেন যথাসময়ে। শ্যামবাজারে একখানা দোতলা বাড়ি কিনে চমৎকারভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন দুজনে। কিন্তু দশ বছরের বেশি স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলেন না।

কেমন সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল।

স্ত্রী তাঁকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেননি। কাজেই কোন পিছুটান ছিল না। বাড়ি বেচে দিয়ে হোটেলে এসে উঠলেন। সেই থেকে তাঁর ভেসে বেড়ানো জীবন আরম্ভ হয়েছে। এই ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছিল রেবতী। শ'চারেক টাকা ভাড়া হলেও বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল কালীকিঙ্করের। আজ সকালেই তিনি এখানে উঠে এসেছেন।

রেবতী চৌধুরীর সঠিক পরিচয় দেওয়া শক্ত। এইটুকু অবশ্য বলা যায়, অর্থের বিনিময়ে যে কোন উপকার বা অপকার সে করতে সব সময় প্রস্তুত। এই রকমই এক সূত্রে কালীকিঙ্করের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তারপর থেকে সে আর তাঁকে পিছু ছাড়েনি।

দূরের কোন পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজল।

কালীকিঙ্করের দু'চোখের পাতা এবার ভারি হয়ে আসতে লাগল। কতক্ষণ আর জেগে থাকবেন! তিনি এবার পাশ ফিরে শুলেন। তিনতলা সুদৃশ্য ফ্ল্যাটবাড়িটাও অন্ধকারের মধ্যে ঝিমোচ্ছে। কোথাও এতটুকু সাড়া নেই, নেই কোন আলোর রেখা।

এই বাড়ির প্রতি তলায় তিনটি করে ফ্ল্যাট আছে। কালীকিঙ্কর থাকেন মাঝের তলায়। ওঁর পাশে আছেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান। সব শেষের জন হলেন সলিসিটার। বলা বাহুল্য কারুর সঙ্গে কারুর বিশেষ আলাপ নেই। গুটি কয়েক স্বচ্ছল মানুষ একই জায়গায় থাকলে, এক অজানা কারণে নিজেদের অন্যের কাছ থেকে গুটিয়ে রাখেন।

ওদিকে তিনটে বাজার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সলিসিটার সুবীর সান্যালের। দ্রুত তিনি উঠে বসলেন বিছানায়। পাশের ফ্ল্যাটে কাচের কোন কিছু ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারি কিছু পড়ে যাবার শব্দ পেলেন। তারপরই অতি চাপা কাতরানি কানে ভেসে এল।

সুবীর সান্যালের মনে হল সিভিলিয়ান ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে কিছু যেন একটা ঘটেছে। খাট থেকে নেমে ড্রেসিংগাউনটা গায়ে চাপাতে চাপাতেই তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অন্ধকার হাতড়ে সুইচটা টিপতেই বারান্দায় আলো জলে উঠল। একটু ইতস্ততঃ করলেন সান্যাল।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে ভাব কাটিয়ে করাঘাত করলেন সিভিলিয়ানের দরজায়। নেক্সট-ডোর নেবার যদি অসুবিধায় পড়ে থাকেন, তাহলে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যাওয়ার নৈতিক দায়িত্ব তাঁর রয়েছে। দরজায় করাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ভেসে এল দ্রুত পায়ের শব্দ।

তিনি আবার করাঘাত করলেন।

দরজা খুলল না।

সান্যাল এবার চাবির ফুটোতে চোখ লাগালেন। অতি অল্প ফাঁক দিয়ে বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়ার কথা নয়। চাপা আলো জ্বলছিল ঘরে। শুধু দেখতে পেলেন একজন মানুষের নিম্নাংশ। সে অন্য একটা দরজা দিয়ে ওধারে চলে যাচ্ছে।

ব্যাপার খুব সুবিধার বলে মনে হল না সুবীর সান্যালের।

কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে এই ফ্ল্যাটের মধ্যে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ সাড়া দিলেন না, এ তো হতে পারে না! তাছাড়া যে লোকটির নিম্নাংশ দেখা গেল সে আর যে হোক সিভিলিয়ান দাশগুপ্ত নয়।

চোর নয় তো?

দুজনকে অজ্ঞান করে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে? সুবীর সান্যাল দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে কালীকিঙ্করের দরজায় বারকয়েক ধাক্কা মারলেন গিয়ে। তিনি ভাবপ্রবণ মানুষ বলেই একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কালীকিঙ্কর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সবেমাত্র ঘুম এসেছিল। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর মনে বিরক্তি মিশে রয়েছে।

কি হয়েছে।

সুবীর সান্যাল নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

নিজের আলস্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কালীকিঙ্কর এবার সজাগ হলেন। তাই তো, ওই ফ্ল্যাটে ঘোরালো কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে! দুজনে বারান্দার বাগানের দিকের অংশে ছুটে গেলেন। সত্যিই যদি ওই ফ্ল্যাটে কেউ ঢুকে থাকে, তাহলে সে ওধারের মেথর যাবার ঘোরান সিঁড়িটাই ব্যবহার করে থাকবে। তাই যদি হয়, তাহলে তাকে ওই

পথ দিয়েই পালাতে হবে। এমুড়ো-ওমুড়ো কিছু নেই, একফালি ফুলের বাগান। চাঁদ পশ্চিমে অনেক হেলে পড়লেও, ওখানে অন্ধকার কিছুটা তরল।

দুজনে বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, একটি লোক ঝড়ের বেগে ফুলগাছগুলিকে নির্মমভাবে মাড়িয়ে পেছনের নিচু বাউণ্ডারিওয়াল টপকে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। কে পালাল তাকে চেনা না গেলেও, সে যে একজন যুবকশ্রেণীব ব্যক্তি তা বুঝতে পারা গেল।

দুজনে এবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ব্যাপার যে গুরুতব তা বুঝতে আর কোন অসুবিধা হয় না। তাঁদের সাড়া পেয়েই লোকটা চম্পট দিয়েছে। কিন্তু—, কালীকিঙ্করই প্রথমে কথা বললেন।

লোকটা কিন্তু খালি হাতে পালাল। আমরা জেগে উঠেছি বুঝতে পেরে কোন কিছু নিয়ে যেতে আর সাহস করেনি।

সুবীর সান্যাল বললেন হয়ত টাকাকড়ি পকেটে ভরে চম্পট দিয়েছে। আর কিছু নেবার তার ইচ্ছে ছিল না। আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি—

কি বলুন তো?

সস্ত্রীক দশাগুপ্তর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? আমবা দবজা ধাক্কানোতে চোর ভড়কে পালাল। অথচ তাঁরা একেবারেই চুপচাপ।

আমারও কথাটা মনে হয়েছে। দুজনকে অজ্ঞান করে ফেলাও হয়ে থাকতে পারে। আর আমাদের গবেষণা চালিয়ে লাভ নেই। এখন পুলিশে খবব দেওয়া দবকার।

অবস্থা-উপযোগী যুক্তি। তবু সিভিলিয়ান দাশগুপ্তর দরজায় জোরে জোরে কয়েকবার ধাক্কা মারা হল। আগের মতই কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দুজনে পুলিশে খবর দিতে তৎপর হলেন। অবশ্য থানা পর্যন্ত যেতে হল না। সুবীর সান্যালের ঘবে ফোন আছে।

ও. সি থানায় ছিলেন না। সাব-ইন্সপেক্টর মোহিত মিত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে এলেন ঘটনাস্থলে। যতটুকু জানা গেছে সমস্তই বলা হল তাঁকে। তিনিও কয়েকবার দরজা ধাক্কা দিয়ে দাশগুপ্ত পরিবারের সাড়া পাবার ব্যর্থ চেষ্টা কবলেন।

এখন একটি মাত্র পন্থাই বাকি রইল।

দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে দেখা প্রকৃত ব্যাপারটা কি। দিনের আলো তখন ফুটতে আরম্ভ করেছে। পুলিশের আগমনের পর কিভাবে যেন সমস্ত ফ্ল্যাটবাড়িটা জেগে উঠেছে। একতলা ও তিনতলার বাসিন্দরা উৎসুকভাবে এদিক-ওদিক করছেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে আসতে সাহসী হচ্ছেন না। মোহিত মিত্র সকলকে ডেকে পাঠালেন।

সকলের সামনে তিনি দরজা ভাঙতে চান।

দুজন কনস্টেবলের সাহায্যে বার কয়েক চেষ্টার পরই ইয়েল লক বিকল হয়ে গিয়ে দরজার পাল্লা খুলে গেল। সাব-ইন্সপেক্টর একাই ঢুকলেন ঘরে। বেডরুম ল্যাম্পের হাল্‌কা আলো চারধারকে কেমন ছায়াময় করে রেখেছে। তাছাড়া তীব্র ক্লোরফর্মের গন্ধ মোহিত মিত্রকে সজাগ করে তুলল।

তিনি কয়েক পা এগিয়েই হোঁচট খেলেন একটা টিপয়ের সঙ্গে। টাল সামলে নেবার পরই তাঁর দৃষ্টি পড়ল সোফার ওপর। একজন আড হয়ে পড়ে আছে। পুরুষ

নয়, মহিলা। এভাবে কাজ চলতে পাবে না। জোরালো আলো দরকার। পর্দাগুলি টানা না থাকলে বাইরের আলো ঘরে প্রবেশ করত। সঙ্গে টর্চ ছিল। টর্চের সাহায্যে অচিরেই সুইচবোর্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সুইচ অন করতেই তীব্র আলোয় ভরে গেল ঘর।

মোহিত দেখলেন সুশ্রী, সুগঠনা মেয়েটি মড়ার মত পড়ে রয়েছেন সোফার ওপর। বয়স বছর পঁচিশের মধ্যেই হবে। ইনিই বোধহয় মিসেস দাশগুপ্তা। মাবা গেছে নাকি? মিত্র এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করলেন দেহটি। প্রাণ রয়েছে—ক্লোরফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু অপরজন—মিঃ দাশগুপ্ত গেলেন কোথায়?

তাঁর প্রশ্নের বিস্ময়কর উত্তর অপেক্ষা করছিল সোফার পেছন দিকে। মোহিত মিত্র সাজানো ঘরখানি দেখতে দেখতে ওধারে এগোতেই থমকে গেলেন। দীর্ঘকায় এক পুরুষ রক্তে মাখামাখি অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সোফার পেছন ও পাশের ঘরে যাবার দরজার মাঝামাঝি জায়গায়। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে দেহে প্রাণ নেই। জমাট রক্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ আগে এই প্রাণসংহার-পর্ব শেষ হয়েছে।

কিছু কাচের টুকরোও ছড়িয়ে আছে মৃতদেহের এধারে-ওধারে। ফ্ল্যাওয়াব ভাস বা ওই জাতীয় কিছুর অংশ হতে পারে। ওই অংশের দেওয়ালের কয়েক জাযগায় রক্তের দাগও রয়েছে। মোহিত মিত্র সহজেই বুঝতে পারলেন, দুটি গুলি শরীর ভেদ করেছে। কোন্ গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তা অবশ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকেই জানা যাবে। বহুদিন পরে এ অঞ্চলে এরকম একটি মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল।

আগে মৃতদেহ সনাক্তকরণের কাজ শেষ করা দরকার। মিত্র কয়েকজনকে ঘরেব মধ্যে ডেকে আনলেন। সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই রক্তাক্ত ব্যাপার দেখে। পরে একবাক্যে স্বীকার করলেন, মৃতদেহ নীরেন দাশগুপ্তর। প্রাক্তন এই সিভিলিয়ানটি এখন একটি নামকরা প্রাইভেট ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে-থাকা মহিলাটি তাঁর স্ত্রী।

ব্যাপারটি যে অত্যন্ত রহস্যময়, এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন মোহিত মিত্র। দ্রুত প্রাথমিক কাজগুলো তিনি সেরে নিতে চাইলেন। সুবীর সান্যালের ঘরে ফোন আছে জানতে পেরে তিনি প্রথমে নিজের থানার ও.সি.র সঙ্গে কথা বললেন। তারপর যোগাযোগ করলেন হোমিসাইড স্কোয়াডের সঙ্গে। সবশেষে অ্যাম্বুলেন্সকে দ্রুত এখানে চলে আসার জন্য বললেন।

আধঘণ্টার মধ্যে হোমিসাইড স্কোয়াডের মিঃ সামন্ত দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন। অ্যাম্বুলেন্সও এসে পড়ল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মিসেস দাশগুপ্তাকে তুলে দেওয়া হল গাড়িতে। মহিলাটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনা দরকার। নিঃসন্দেহে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু বলতে পারবেন।

ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন, অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক আগে মারা গেছেন ভদ্রলোক। দু'বারই বুলেট নিক্ষেপ করা হয়েছে খুব কাছ থেকে। বিশেষ বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে খানকয়েক ছবি তুলে নিল ফটোগ্রাফার। এবার মৃতদেহ চালান দেওয়া হল মর্গে।

নীরেন দাশগুপ্তর তিনকক্ষ-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটটি খুঁটিয়ে দেখলেন মিঃ সামন্ত। চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে হত্যাকারী এখানে এসেছিল বলে মনে হয় না। ওয়ার্ডরোব, সেফ ইত্যাদি

অক্ষতই রয়েছে। তাছাড়া ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে একজোড়া ···নের দামী গয়না, রিস্টওয়াচ ও শ' তিনেক টাকা দেখতে পাওয়া গেল। চোর হলে এ··· ··খে যেত না।

ল্যাট্রিনের ওধারে স্পাইরেলের মুখে যুক্ত দরজাটি সামন্ত পরী··· ··· দেখলেন। এই পথ দিয়েই একজনকে পালাতে দেখা গেছে। প্রশ্ন অবশ্য ··· ···, দরজার ছিটকিনি আগে থেকে খোলা না থাকলে আগন্তুক ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না। কে খুলে রেখেছিল ছিটকিনি? হত্যাকারীর সুবিধার জন্য এ-কাজ কার পক্ষে করা সম্ভব? এবং কেন?

স্পাইরেলের মুখের দরজার পাল্লা এবং বিট ডাস্ট করার আদেশ দিলেন মিঃ সামন্ত। ওখানে আগন্তুকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। দেওয়ালে যে রক্তের ছোপ পড়েছিল, তাও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হল। সাদা চোখে অন্তত মানুষের রক্ত বলেই মনে হয়।

এবার এজাহার নেবার পালা।

কালীকিঙ্কর ও সুবীর সান্যাল আবার নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। একথাও তাঁরা জানালেন, আগন্তুকের মুখ তাঁরা দেখতে পাননি। জোরালো আলোর অভাব তাঁদের বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। তবে তার পাঁচিল টপকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে একজন যুবা পুরুষ।

মিস্টার দাশগুপ্ত কি কোন কাজকর্ম করতেন?

সুবীর বললেন, সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি 'হাইফাই এণ্টারপ্রাইজে' যোগ দিয়েছিলেন।

একটু চিন্তা করে সামন্ত বললেন, আপনি কতদিন এখানে আছেন?

প্রায় বছর দুয়েক।

মিস্টার দাশগুপ্ত?

আমার আগে থেকেই এখানে আছেন।

আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওঁর হৃদ্যতা ছিল?

কারুর সঙ্গে হৃদ্যতা করবার মত স্বভাব বোধহয় ওঁর ছিল না। গম্ভীর ও একলাসেড়ে ধরনের লোক ছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন নিতান্ত স্বার্থের খাতিরে।

কি রকম?

আমি পেশায় সলিসিটার। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। খসড়াও তৈরি করে ছিলাম আমি। কিন্তু কেন জানি না, রেজিস্ট্রি করে সমস্ত কিছু পাকা করতে চাননি। অবশ্য সেই থেকে আমাদের দেখা হলেই শিষ্টাচার বিনিময় হত।

উত্তরাধিকারী কাকে করতে চেয়েছিলেন?

স্ত্রী আর তৃপ্তি সেন নামে একটি মেয়েকে।

মোহিত মিত্র দ্রুতহাতে সমস্ত লিখে নিচ্ছিলেন।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, সম্পত্তির পরিমাণ কি রকম?

বর্ধমানে দু'খানা বাড়ি ও শ'খানেক বিঘা জমি। এছাড়া ফিক্সড্ ডিপোজিটের লাখ দুয়েক টাকা।

ভদ্রলোক তাহলে অবস্থাপন্ন ছিলেন। কতদিন আগে আপনাব সঙ্গে বিষয-সম্পত্তি নিযে কথা হযেছিল?

মনে মনে হিসেব কবে নিযে সুবীব সান্যাল বললেন মাস আষ্টেক আগে।

তৃপ্তি সেন ওঁব কোন আত্মীযা বোধহয?

ঠিক বলতে পাবব না।

এই ফ্ল্যাটবাডিব আব কোন বাসিন্দাব সঙ্গে দাশগুপ্তব ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলতে চান?

আমাব তো তাই ধাবণা।

এখনকাব মত আব একটা প্রশ্ন আছে—

বলুন।

মিস্টাব দাশগুপ্তব সঙ্গে তাঁব স্ত্রীব দুস্তব বযসেব পার্থক্যেব কাবণটা কি?

ইনি ভদ্রলোকেব দ্বিতীয পক্ষ, এইটুকুই জানি।

সুবীব সান্যালকে বিদায দিযে এবাব কালীকিঙ্কবকে নিযে পডলেন সামন্ত।

দাশগুপ্তব সঙ্গে আপনাব সম্পর্ক কি বকম ছিল?

তাঁব সঙ্গে আমাব আলাপ ছিল না। মাত্র গতকাল এই ফ্ল্যাটে আমি ভাডাটে হিসাবে এসেছি।

আগে কোথায ছিলেন?

লোয়াব বেঞ্জেব একটা ফ্ল্যাটে।

হঠাৎ এখানে চলে এলেন যে?

কসমোপলিটন পাডায মন টিকছিল না। এই বাডিব বাসিন্দা বেবতী চৌধুবীব সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে আমাব আলাপ ছিল। তিনিই আমাকে এই ফ্ল্যাটেব সন্ধান দেন। এসে দেখি আমাব পূর্বপবিচিত মিঃ সান্যালও এখানে বযেছেন।

বেবতী চৌধুবী কোন্ তলায থাকেন?

একতলায।

আপনাব কিসেব ব্যবসা?

কণ্ট্রাক্টাবী কবি।

আচ্ছা, কোনবকম শব্দ-টব্দ পেযেছিলেন কি এই ফ্ল্যাট থেকে?

আমি বাত তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলাম। কোন শব্দ তো কানে আসেনি।

সামন্ত এবাব বেবতী চৌধুবীব খোঁজ কবলেন। জানা গেল গত সন্ধ্যায কোথায বেবিয়েছেন, এখনো নিজেব ফ্ল্যাটে ফেবেননি। বাডিব অন্যান্য ভাডাটেদেব সঙ্গে তখন তাঁব কথা হল। কাজে লাগতে পাবে এমন কোন কথা অবশ্য জানা গেল না। তবে একটি বিষযে সকলে একই বকম মত প্রকাশ কবলেন---মিঃ দাশগুপ্ত অত্যন্ত কডা মেজাজেব লোক ছিলেন এবং এই বাডিব কাকব সঙ্গে মেলামেশা কবতে চাইতেন না

এই সময স্থানীয থানাব ও সি কনক বায দুটি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কাব কবলেন। প্রশ্ন উত্তবেব পালা চলাকালীন তিনি দুর্ঘটনাস্থলেব প্রতিটি ইঞ্চি জমি খুঁটিযে দেখছিলেন তাতেই সফল ফলেছে। কাল্‌চে নীল বঙেব বিভলবাবটি পাওযা গেল সোফাব তলা থেকে। আব ড্রেসিং টেবিল ও ওযার্ডবোবেব মাঝামাঝি জাযগায পডে ছিল সবজ বঙেব খামখানা।

রুমালে মুড়ে বিভলব'ারটি পকেটস্থ করলেন সামন্ত।

সবুজ খামের মধ্য থেকে একটা প্যাডের কাগজ বেরুল। নীরেন দাশগুপ্ত নিজের লেটার হেডে চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানি নিম্নরূপ—

১৫/১১/৬৯

রীতা,

বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে বিকেলের ট্রেনে বর্ধমান যেতে হচ্ছে। অফিস থেকেই গাড়ি ধরে নেব। বৃহস্পতিবাব সকালে ফিরে আসছি।

—নীরেন

ভ্রূ-কুঁচকে সামন্ত চিন্তা কবলেন গতকাল পনেরো তারিখ গেছে। অর্থাৎ গতকাল বিকেলে ওঁর বর্ধমান চলে যাবাব কথা চিঠিব ভাষা অনুসারে। কিন্তু কেন তিনি গেলেন না, তা বোঝা মুশকিল। বর্ধমান চলে গেলে বোধহয় এইভাবে খুন হতেন না। রহস্য ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে।

বর্তমানে আর এখানে কিছু করণীয় নেই। দাশগুপ্তর ফ্ল্যাট সীল করে দেওয়া হল। তারপর দুজন কনস্টেবল মোতায়েন কবে, পুলিশের অনুমতি ছাড়া কাউকে কলকাতার বাইবে পা দিতে নিষেধ কবে সদলবলে মিঃ সামন্ত ওখান থেকে বিদায় নিলেন।

বেলা দশটার সময় মিঃ সামন্ত হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলেন।

রীতার জ্ঞান ফিরে এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে। সে নিজের বেডে শুয়ে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তার সৌন্দর্যের ওপর কিছুটা শীর্ণ ভাব বিস্তার করেছে। যদিও বলকারক ওষুধ তাকে খাওয়ানো হয়েছে, তবু মনে বা শরীরে এখনও তেমন বল পাচ্ছে না।

মিঃ সামন্ত তার বেডেব পাশে এসে বসলেন।

আমি লালবাজাব থেকে আসছি।

রীতার চোখে শঙ্কা মাখানো ঔৎসুক্য।

সামন্ত নিজের পদমর্যাদার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, আপনার শোচনীয় মনের অবস্থার কথা জেনেও বিরক্ত করতে আসতে হল। কর্তব্যের খাতিরেই আপনাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

ক্ষীণ গলায় রীতা বলল, বলুন—

ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল বলুন তো?

কোন্ ব্যাপারটা?

আপনার স্বামীর খুন হওয়ার কথা বলছি।

রীতা একবার নিজের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। সেই রক্তাক্ত বেদনাদায়ক দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে উঠল বোধহয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। তবু বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারল না।

এখন বলতে অসুবিধা বোধ করলে আমি অপেক্ষা করতে পারি।

আমি বলছি। উনি রাত সাড়ে এগারোটার কিছু পরে ফিরলেন। মিনিট কুড়ি

সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। তারপর আমি শুতে চলে গিয়েছিলাম পাশের ঘরে। এই সময় বাইরে থেকে কে নক করতে উনি দবজা খুলে দিলেন।

আগন্তুককে আপনি দেখেছিলেন?

না। মাঝে মাঝে ওই রকম অসময়ে লোক আসত ওঁব সঙ্গে দেখা করতে। আমার এ সমস্ত গা-সওয়া। তাছাড়া তখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল।

তারপর?

ও-ঘরে কি কথাবার্তা হয়েছিল জানি না। হঠাৎ কিছু পড়ে যাওয়াব শব্দে চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে পাশেব ঘবে আসতেই কে জড়িয়ে ধরল আমায়। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘরে ঢোকার মুখে আপনি কিছুই দেখতে পাননি?

ওঁকে বক্তাক্ত শরীরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

মিঃ সামন্ত মানস-চক্ষে দৃশ্যটি ছকে নিলেন। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের সাহায্যে দাশগুপ্তকে শেষ করেই হত্যাকারী ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মিসেস ছুটে আসার মুখেই তাঁকে ক্লোবফর্ম কবে সোফায় বসিয়ে রাখে। তারপর বাথরুমে গিয়ে মেথর ঢোকার দরজা খুলে, স্পাইবেলের সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে চম্পট দেয়। আপাতদৃষ্টিতে ওই দবজাটি খোলা থাকার এই হল একমাত্র যুক্তি।

এ ব্যাপাবে আপনার কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?

আমি কিছুই আন্দাজ করতে পাবছি না।

এবার ব্যক্তিগত কথায় আসছি। আপনাদেব কতদিন বিয়ে হয়েছিল?

বছর তিনেক।

আমি শুনেছি, আপনি তাঁর দ্বিতীয স্ত্রী ছিলেন। আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিভাবে ঘটেছিল জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বীতা ম্লান হেসে বলল, অবস্থাহীন বাপ ধনী বৃদ্ধের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন, এই আর কি!

আপনি ছাড়া এখন ওঁর নিজের বলতে কে কে আছেন?

ওঁর প্রথমপক্ষের মেয়ে তৃপ্তিই হল একমাত্র নিজের আত্মীয়। ইদানিং অবশ্য জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। এছাড়া—

বলুন?

দিবাকব এবং সুধাকর নামে দুই আগের পক্ষের শালার সঙ্গেও উনি সম্পর্ক বেখেছিলেন। ওদের চাকরির ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন নিজের অফিসে।

ওরা আসা-যাওয়া করত কি আপনাদের ফ্ল্যাটে?

মাঝে-মধ্যে আসত।

আপনাকে আজ আর বিরক্ত করব না। তিনজনের ঠিকানাটা আমায় লিখে দিন শুধু।

ঠিকানা লিখে নিয়ে ছায়াচ্ছন্ন মনে ওখান থেকে উঠলেন মিঃ সামন্ত। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে তেমন শোক-সন্তপ্ত বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য বৃদ্ধ স্বামীর জন্য সব তরুণী স্ত্রীই যে কাতব হয়ে উঠবে, এমন কোন কথা নেই। তবে—

লোক পাঠিয়ে ডেকে পাঠানো হল তৃপ্তি সেন ও তার স্বামীকে এবং ওই সঙ্গে দিবাকর ও সুধাকরকে। ইতিমধ্যে রেবতী চৌধুরী কথাবার্তা বলে গেছে। লক্কা পায়রার মত চেহারার এই লোকটি যে বিশেষ সুবিধার নয়, তা এক নজর দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

আপনি আমাব খোঁজ করছিলেন জানতে পেরেই চলে এলাম স্যার।

নিজেব দীর্ঘ চাকরি-জীবনে এ-ধরনের বহু লোকের মুখোমুখি হয়েছেন মিঃ সামন্ত। কাজেই স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি ও-সময়ে নিজের ফ্ল্যাটে অনুপস্থিত ছিলেন কেন?

দাশগুপ্তবাবুকে কেউ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে আমি আগে থেকে কিভাবে জানব, বলুন? জানা থাকলে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকতাম।

কোথায় গিয়েছিলেন?

কাছেই। শ্রীরামপুব। ওখানেই রাত কাটিয়েছিলাম। মিথ্যা কথা বলছি না, ওখানকাব কম করেও পাঁচজন লোক আমাকে সমর্থন করবে।

আপনি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক দেখছি! কি করেন?

আজ্ঞে, দালালী।

দালালী! কিসের?

কিসেব নয বলুন, স্যার!

সেই কথাই তো পরিষ্কাব করে শুনতে চাইছি।

এক ঝোঁক হেসে নিল রেবতী চৌধুবী। মনে হল, এমন হাসির কথা সে আগে কখনও শোনেনি। তারপব বলল, দালালরা সব সময় একনিষ্ঠ থাকে না স্যার। লাভের সম্ভাবনা থাকলে যে-কোন জিনিসেব দালালী করতে তাদের বাধে না। আমাব বেলাতে ওই কথাই খাটে।

খুন সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

আমার কোন অভিমত নেই।

মিঃ দাশগুপ্তকে আপনি কতদিন থেকে চেনেন?

তা এক যুগ থেকে বলতে পারেন।

তার মানে, আপনি ওঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন?

শুধু ওঁর কেন, ওঁর স্ত্রীর সম্পর্কেও আমি অনেক কিছু জানি—বলতে গেলে একটু বেশিই জানি।

অর্থাৎ?

বিচিত্র এক হাসিতে মুখ ভরিয়ে রেবতী চৌধুরী বলল যে লোক কবরের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে কোন ডাঁটো মেয়েমানুষ খুশি মনে দিন কাটাতে পারে কি? আপনি জানেন স্যার, সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। দাশগুপ্ত জানতেন না, কিম্বা জেনেও চোখ বুজে থাকতেন কিনা বলতে পারব না। তবে আমি জানি, শ্রীমতী রীতা অনেক পুরুষকেই ধন্য করেছেন।

সচকিত সামন্ত বললেন, অভিজ্ঞতার কথা কি বলছেন? সেই ধন্য পুরুষদের মধ্যে আপনিও কি একজন?

কি যে বলেন স্যাব। আমি হলাম আদার ব্যাপারী, প্রমোদতরী কেনার পয়সা পাব কোথায়? একটু সতর্ক থাকি বলেই সময় সময় অনেক কিছু চোখে পড়ে যায়।

আচ্ছা মিস্টার চৌধুরী, এমনও তো হতে পারে, রীতাদেবীব কোন উন্মত্ত প্রেমিক নিজের পথ পরিষ্কার করেছে.

হতে পারে!

ওই প্রেমিকদের মধ্যে আপনি ক'জনকে চেনেন?

জনা তিনেককে তো বটেই। দুজনের কথা বাদ দিন, তারা কিছুদিন মধু খেয়ে সরে পড়েছে। তৃতীয়জন অবশ্য সবে পথ-ঘাট বেঁধে কাজে নামবার চেষ্টা করছিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন স্যাব।

কার কথা বলছেন?

আইনের কচকচিতে ক্লান্ত হয়েই বোধহয় সুবীর সান্যাল এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তাই নাকি! আপনি আর কি জানেন বলুন?

আমি আর কিছু জানি না স্যার।

রেবতী চৌধুরীর কাছ থেকে আর কোন কথা বার করা গেল না। মনে হয়, এই ঘোড়েল লোকটি আরো অনেক কিছু জানে। তাকে ছেড়ে দিলেও তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করলেন মিঃ সামন্ত।

তৃপ্তি সেন ও তার স্বামীর কাছ থেকেও বিশেষ কিছু জানা গেল না। সচরাচর মধ্যবিত্ত সমাজে যে ধরনেব জীব দেখা যায়, জামাইটি সেই ছাঁচেই ঢালা। লোভী, হিংসুটে, শ্বশুরের প্রতি রাগ। মেয়ের বাগ বাপের ওপর আরো দু-পর্দা বেশি। তার বক্তব্য হল, বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নীরেন দাশগুপ্ত অসম্ভব স্ত্রৈণ হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রী যে অন্যের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে, তা নাকি দেখেও দেখতেন না।

তৃপ্তির দুই মামা দিবাকর ও সুধাকরের বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। দুজনেই সুপুরুষ এবং বলিষ্ঠদেহী। তারা ভাল চাকরি করে এবং পারিবারিক অবস্থাও তাদের ভাল। ভগ্নীপতির দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটা তারা ভাল চোখে না দেখলেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাতও হত। তিনি যে শেষ পর্যন্ত এইভাবে খুন হবেন, তা দুজনের কল্পনার অতীত ছিল। কাজেই তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

ওদের বিদায় দিয়ে মিঃ সামন্ত চিন্তিতভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এমন কোন জোরালো তথ্য হাতে নেই যাতে নীরেন দাশগুপ্তর চারপাশের কাউকে হত্যাকারী হিসেবে পয়েণ্ট করা যায়। তবে কি সে বাইরের কেউ? এমন কোন কারণে এই কাণ্ড বাধিয়েছে, যা এখন মোটেই ধরতে পারা যাচ্ছে না?

অকারণেই বাসব লালবাজারে এসেছিল। হাতে কাজকর্ম না থাকলে সময় কাটানোর জন্য ও চলে আসে এখানে। বর্তমানে ওর বেকার-পর্ব চলছে। তার ওপর আবার কয়েকদিন থেকে শৈবাল কলকাতায় অনুপস্থিত। আড্ডা দিয়েও কিছুটা সময় বেশ কাটানো যায়। তারও কোন ব্যবস্থা না থাকায় অগত্যা ওকে মিঃ সামন্তর শরণে আসতে হল।

সামন্ত সহর্ষে অভ্যর্থনা জানাবার পর বললেন, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কেন বলুন তো?

আজকের কাগজে 'দাশগুপ্ত মার্ডার' কেসের বিবরণ বেরিয়েছে। পড়েননি?.

বাসব মৃদু হেসে বলল, বোল্ড লেটারের হেডিং দেওয়া নিউজ নয় বলেই বোধহয় আমার চোখে পড়েনি। আমি আবার সব সময় খুঁটিয়ে কাগজ পড়তে পারি না। আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জটিল। আমার সহযোগিতা চাইছেন কি?

হাতে সময় থাকলে অবশ্য আপনি পালাবার পথ পাবেন না।

সময়ের কথা কি বলছেন মিস্টার সামন্ত? ঘড়ির কাঁটা যেন আর এগুতে চাইছে না। আমি পুরোদস্তুর বেকার।

যাক, বাঁচা গেল। কেসটা সত্যিই খুব জটিল, মিস্টার ব্যানার্জি। একজনের বিরুদ্ধে অবশ্য কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে। তবে...

প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বলুন।

সামন্ত বললেন একে একে সমস্ত কথা।

বাসব পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাডতে শুনছিল একমনে।

এবার কাজের অগ্রগতির কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে একজন সন্দেহভাজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। মেথর যাওয়া-আসা করার দরজাটা খোলা ছিল আগেই বলেছি। অবশ্য মেথরের যাতায়াত বহুদিনই ও-পথ দিয়ে নেই। ওই দরজার পাল্লা থেকে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলা হয়েছে, তাব সঙ্গে সুধাকরের হাতের ছাপ মিলে যাচ্ছে।

আপনি বলতে চাইছেন, সে রাতে বাগানের মধ্য দিয়ে যে লোকটাকে কালীকিঙ্কর ও সান্যাল পালাতে দেখেছেন, সে হল সুধাকর?

ঠিক তাই। কিন্তু এ অভিযোগ সে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করছে। ভগ্নীপতির এই ফ্ল্যাটে সে অজস্রবার গেছে। স্পাইরেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামাও করেছে কয়েকবার। কাজেই ওই দরজায় তার হাতের ছাপ পড়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এই তার বক্তব্য।

ওর কথা সত্যিও হতে পারে!

কিন্তু কেসটাকে মোটামুটিভাবে গুছিয়ে আনতে গেলে ওকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। আমার মনে হয় ওর অনেক কথা জানা আছে। চাপে পড়লে বলতে বাধ্য হবে।

আপনার ধারণাকে উড়িয়ে দিতে চাইছি না। তবে আমার মনে হয়, এই কেসে রেবতী চৌধুরীই হল সবচেয়ে দামী ক্যারেক্টার। সে ইচ্ছে করলে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় কথা শোনাতে পারে। সুধাকরকে ধরে আনলেও আটকে রাখতে পারবেন না কিন্তু। যদি প্রমাণিত হয়ও যে, সে-ই ওই ফ্ল্যাটের ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালিয়েছে—তাহলেও নয়। তাকে জোরালো ডিফেন্স দেবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা। আপনি একটু আগে বললেন রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। রীতা দাশগুপ্তার বক্তব্যও অনেকটা এই রকম। এক্ষেত্রে সুধাকরকে হত্যাকারী হিসাবে খাড়া করা যায় কি?

এমনও তো হতে পারে, সে খুন করাব পর কয়েক ঘণ্টা ওই ফ্ল্যাটেই ছিল! তারপব সাড়ে তিনটের সময় পিটটান দিয়েছে!

হতে যে না পারে, তা নয়। তবে প্রশ্ন হল, ওই ক'ঘণ্টা সে ওখানে কি কবছিল? অকারণে নিশ্চয়ই হত্যাকারী মড়া আগলে বসে থাকবে না?

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, দেখছেন তো কি রকম জটিল ব্যাপাব!

হুঁ! আচ্ছা, সেই কুড়িয়ে পাওয়া রিভলবারটার কি হল?

অনুসন্ধান করে দেখেছি, ওটা নীরেন দাশগুপ্তর। একটা গুলিও খরচ হয়নি। চেম্বার ফুল ছিল।

এর নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। আমার অবশ্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। তবে আর একটু না ভেবে কিছু বলতে চাই না। এবার সবুজ খামে ভরা সেই চিঠিখানার কথায় আসা যাক। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, দাশগুপ্ত নিজের স্ত্রীকে লিখে জানালেন বর্ধমান যাচ্ছেন, অথচ গেলেন না কেন? আমার মতে এটাও একটা ভাইটাল পয়েন্ট।

আমি অবশ্য চিঠিখানা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আপনি ঠিকই বলেছেন, তাঁর মত পরিবর্তনের কোন গূঢ় কারণ ছিল কিনা, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

আমি এখন চলি—

বাসব উঠে দাঁড়াল।

হাতে যখন কোন কেস নেই, এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্যই মাথা ঘামাব। সংশ্লিষ্ট সকলের ঠিকানাগুলো দিন তো। প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলব ভাবছি। আপনি কিন্তু আমার কথা সকলকে জানিয়ে রাখবেন।

সামন্ত এক সিট কাগজে ঠিকানাগুলি লিখে দিলেন।

বাসব ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি গেল না। উত্তর কলকাতার পথ ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ওল্ডস মোবাইল বিবেকানন্দ রোডের একটি বাড়ির সামনে এসে থামল। একনজরেই বুঝতে পারা যায় বাড়িখানা কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির। কলিংবেল পুশ কবতেই একজন চাকরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

সুধাকরবাবু বাড়ি আছেন?

আছেন।

সে বাসবকে ড্রইংরুমে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুধাকর ঘবে প্রবেশ করল। তার সুশ্রী মুখের ওপর চিন্তার প্রলেপ পড়েছে। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল।

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, দাশগুপ্ত মার্ডার কেসে আমার জড়িয়ে পড়াটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। সেই সূত্রেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এলাম।

সুধাকর মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে-ভাব দমন করে বলল, আপনার মত বিখ্যাত মানুষের নাম আমি অনেক দিন থেকে জানি। সৌভাগ্যের বিষয় আপনি আজ আমাদের বাড়ি এসেছেন।

এবার আমায় ব্যাপারটা বলুন তো?

বিশ্বাস করুন, খুনের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। একথা পুলিশ কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। আমাকে সন্দেহ করে বসে আছে। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। ভয় আমাকে তাড়া করে ফিরছে।

আমি পুলিশের লোক নই। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। প্রাণ খুলে সমস্ত কথা বলুন। এই ভয়—এই আতাস্তরের হাত থেকে আমি হয়ত আপনাকে বাঁচাতে পারব।

একটু চিন্তা করে সুধাকর বলল, বেশ, বলছি সব কথা। তবে এর সঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখছি, এই কেসে আমি আপনাকে নিযুক্ত করতে চাই। জামাইবাবুকে কে খুন করল তা জানা দরকার। আপনার যা ফি তা নিশ্চয়ই দেব। আমার টাকার অভাব নেই।

বেশ তো, এখন বলুন ব্যাপারটা।

পুলিশ ঠিকই ধরেছে। আমি সে-রাত্রে ওখানে গিয়েছিলাম।

কেন গিয়েছিলেন?

এক পারিবারিক কেচ্ছাকে ঢাকবার জন্যেই তো সেকথা আমি পুলিশকে বলতে পারিনি মিস্টার ব্যানার্জি।

কেচ্ছা!

প্রকৃত অর্থে তা অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। জানতে পেরেছিলাম আমার দাদা দিবাকর মজুমদার আমাদের নতুন সুন্দরী দিদির সঙ্গে অবৈধভাবে জড়িত। জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে উনি তাঁর ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করেন। আমি দাদাকে কিছুটা আক্ষেপের সুরেই চার্জ করেছিলাম। ও পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করে গেল। তখন দুজনকে হাতে-নাতে ধরবার জন্য তৎপর হলাম। সেদিন মাঝরাতে বাথরুমে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম দাদা নিজের ঘরে নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, দুপুরে যখন জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন আজ বিকেলে বর্ধমান যাবেন। তার মানে দাদা এখন ওঁর ফ্ল্যাটেই রয়েছেন। আমি আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত ওখানে চলে গেলাম।

একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল সুধাকর, বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে ভাবছিলাম জামাইবাবুর ফ্ল্যাটের মধ্যে কিভাবে যাওয়া যায়। হঠাৎ ঘোরানো সিঁড়ির ওপরকার দরজাটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। পাল্লা একটু ফাঁক হয়ে থাকায় বাইরে আলো এসে পড়েছে। ভীষণ অবাক হলেও ওই পথ দিয়েই আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাথরুমে আলো জ্বলতে থাকলেও পাশের ঘর অন্ধকার। অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোলাম। তার পরের ঘরটা—অর্থাৎ ড্রইংরুমে ছিল চাপা আলো। কারো সাড়া-শব্দ নেই। চৌকাঠ পেরিয়ে ড্রইংরুমে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেলাম। তখন চোখ সয়ে এসেছে। ওঠার মুখেই আমাকে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হল—জামাইবাবু রক্তাক্ত শরীরে পড়ে রয়েছেন। অসম্ভব ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল। আমি আর ওখানে অপেক্ষা না করে ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এসেছি। এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

আপনি কি কোন কাচের জিনিস ভেঙে ফেলেছিলেন?

বলতে ভুলে গেছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসটা পড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

দেওয়ালে রক্তমাখা হাতের ছাপ আছে। ওটা বোধহয় আপনার?

হতে পারে। আমার হাতে বক্ত লেগে গিয়েছিল। পালাবার সময় দেওয়ালে এক-আধবার হাত রেখে থাকতে পারি।

বাসব এতক্ষণে পাইপ ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনাদের দাদা এ সমস্ত কথা জানেন?

না, আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি।

তিনি বাড়ি আছেন নাকি?

আছেন। ডেকে দেব?

ডেকে দিন। তাঁব সঙ্গেও কথা বলা দবকার।

সুধাকর ভেতরে চলে গেল। পাইপ টানতে টানতে বাসব ভাবতে লাগল, এই খুনের মূল সূত্র একটি নারীকে ঘিরে রয়েছে কিনা। ঘটনাব আবর্ত অবশ্য সেইদিকেই আঙুল নির্দেশ করছে। কিন্তু এত স্থূল কায়দায় নিজের পথের কাঁটাকে কি সরাবে হত্যাকাবী?

দিবাকর এসে বসল কোচে। সুধাকরের মতই সুশ্রী ও সুগঠিত তার দেহ। বাসবের পরিচয় ছোটভাইয়ের কাছ থেকে যে পেয়েছে, তাব প্রমাণ তখুনি পাওয়া গেল।

আপনার কথা অনেক শুনেছি। আজ উপযাচক হয়ে এখানে এসেছেন—এ আমাদের সৌভাগ্য!

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, কেন এসেছি তাও বোধহয় আপনি শুনেছেন। সুধাকরবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আশা কবি আপনিও চাইবেন আমাব সঙ্গে সহযোগিতা করতে।

নিশ্চয়ই।

আপনার ভাই সে-রাত্রে মিস্টার দাশগুপ্তর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন জানেন?

পুলিশের তাই সন্দেহ। আমি অবশ্য সঠিকভাবে কিছু জানি না।

আমি জানি তিনি গিয়েছিলেন। আন্দাজ করতে পারেন ওই অসময়ে তিনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন?

দিবাকর চুপ করে রইল।

বাসব আবার বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি একটু স্পষ্ট করেই বলছি। তিনি দেখতে গিয়েছিলেন, জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে আপনি ওখানে বাত কাটাতে গেছেন কিনা। শুনুন মিস্টার মজুমদার, আপনার ও রীতাদেবীর মধ্যেকাব ব্যাপারটা আমার জানা হয়ে গেছে। আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে বিষয়টি খুবই বিশ্রী। অনুগ্রহ করে বলবেন কি, কিভাবে আপনাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

ধীর গলায় দিবাকর বলল, এ ব্যাপারের সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক আছে কি?

এখন জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। আপনাদের সকলের সব কথা শোনার পর একটা সমাধানে আসা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিজের চরিত্রের অসঙ্গতি নিয়ে আমি অবশ্য কারো সঙ্গে আলোচনা করি না। তবে এক্ষেত্রে অন্য কথা। যদিও বুঝতে পারছি, এ সমস্ত আপনার কোনই কাজে লাগবে না। বছর চারেক আগে রীতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয রেবতী চৌধুরী নামে একটা লোক। তখন ওর বিয়ে হয়নি।

কোন্ রেবতী চৌধুরী? যে আপনার জামাইবাবুদের ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে?

চেনেন তাহলে! হ্যাঁ, সে-ই। বাইরের ঠাঁট তার যা-ই থাকুক না কেন, আসলে পয়সাওয়ালা লোকদের মেয়ে সাপ্লাই করাই তার ব্যবসা। একদিন আমায় এসে বলল, ভাল দালালী পেলে সে চমৎকার একটা মেয়ের সঙ্গে আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। রাজি হয়ে গেলাম। রীতাদের অবস্থা ভাল ছিল না। সে এইভাবেই রোজগার করত। কিছুদিন তাকে নিয়ে সময় ভালই কাটল। তারপর সে কোথায় সরে পড়ল। এরকম হয়েই থাকে। আমি তার ব্যবহারে মোটেই আশ্চর্য হলাম না।

তারপর?

জামাইবাবু বাইরে বাইরেই থাকতেন। বুড়ো বয়েসে বিয়ে করেছেন খবর পেয়েছিলাম। রিটায়ার করার পব কলকাতায় এলেন। নতুন দিদিকে দেখে তো অবাক। সে রীতা। আমার বিশ্বাস, রেবতী চৌধুরী টাকা খেয়ে জামাইকে গেঁথে তুলেছিল। বুঝতেই পারছেন, এরপর আবার আমাদের পুরোন সম্পর্ক জোড়া লাগল। জামাইবাবু কলকাতায় অনুপস্থিত থাকলেই আমি ওঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসতে লাগলাম।

দুর্ঘটনার রাতে কি আপনার ওখানে যাবার কথা ছিল?

ছিল। বিকেলে রীতা পাবলিক ফোন থেকে জানিয়েছিল, জামাইবাবু কলকাতায় থাকছেন না। আমি বলেছিলাম মেথর যাবার দরজাটা খুলে রাখতে। ওই পথ দিয়েই যাওয়া-আসা করতাম। এগারোটায় পৌঁছে যাব একথাও জানিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারিনি।

কেন?

জামাইবাবু বাদ সাধলেন। এগারোটার কিছু আগে বাগানের পাঁচিলের কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম জামাইবাবু পাঁচিল টপকাচ্ছেন। কাজেই আমার আর ওঁর ফ্ল্যাটে যাওয়া হল না।

কিন্তু আপনি বাড়ি ফিরে যাননি! কোথায় ছিলেন বাকি রাতটা?

চৌরঙ্গীতে সত্যেন সেনের 'লাভলি হোমে।' পয়সার বিনিময়ে ওখানে মৌজ করার অঢেল ব্যবস্থা। অনুসন্ধান করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বাসব একটু চিন্তা করে বলল, সুবীর সান্যালকে চেনেন?

জামাইবাবুর পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন ভদ্রলোক। মুখ চেনাচিনি আছে।

তিনি রীতাদেবী সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড, জানেন কি?

মৃদু হেসে দিবাকর বলল, না জানলেও অবাক হচ্ছি না। রীতা এমন এক জাতের মেয়ে, যার পক্ষে সব ইন্টারেস্টেড পার্সানকে অবাধে সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

এখন উঠলাম। আশা করি, আপনি আমাকে সব সত্যি কথা বলেছেন।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

লোক আমি যত খারাপই হই না কেন, তবু অহেতুক মিথ্যা কথা বলি না। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা আমার রয়ে যাচ্ছে। আপনি আবার আমাকেই হত্যাকারী ঠাওরাননি তো?

সরাসরি এই মুহূর্তে না বলাটা ঠিক হবে না। চলি।

সুবীর সান্যালকে নিজের ফ্ল্যাটে পাওয়া না গেলেও কালীকিঙ্করকে পাওয়া গেল।

বাসব নিজের পরিচয় দিয়ে এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা জানিয়ে কথাবার্তা বলার অনুমতি চাইল। কালীকিঙ্করের রাজি না হবার কোন কারণ ছিল না। তিনি সাদরে বসালেন বাসবকে।

বাসব বলল, পুলিশের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়েছে আমি তা শুনেছি। আমার কিন্তু গোটা কয়েক অন্য ধরনের প্রশ্ন আছে।

বলুন?

রীতা দাশগুপ্তাকে আপনার কেমন মেয়ে বলে মনে হয়?

চোখে অবশ্য তেমন কিছু দেখিনি। তবে শুনেছি তাঁর স্বভাবচরিত্র তেমন ভাল নয়।

কার কাছ থেকে শুনেছেন?

সুবীরবাবু বলেছিলেন। আসল কথাটা কি জানেন, বুড়ো লোকেদের অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা সচরাচর এই রকমই হয়।

আচ্ছা, রেবতী চৌধুরী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

দালালরা একটু ঘোড়েল হয়। রেবতীও তার ব্যতিক্রম নয়।

আপনার সঙ্গে কি ভদ্রলোকের ভাল পরিচয় আছে? বলতে পারেন, মিস্টার দাশগুপ্তর সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম ছিল কি না?

আমার সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় আছে। দাশগুপ্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কিনা বলতে পারব না। মনে হয় ছিল না। লাভের সম্ভাবনা না থাকলে সে-পথ মাড়ায় না রেবতী। শুনেছি, দাশগুপ্ত অত্যন্ত কড়া মেজাজের এবং আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন। অবশ্য এখানকার কথা আমার চেয়ে অন্যরাই ভাল বলতে পারবে। কারণ, আমি দুর্ঘটনার আগের দুপুরে মাত্র এখানে এসেছি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কাছে কোন্ সূত্রে রেবতী চৌধুরী আসেন?

শুনেছেন নিশ্চয়ই আমি কণ্ট্রাক্টারি করি। ও আমাকে টেণ্ডার'এর ব্যবস্থা করে দেয়। টানাটানির সময় ছুটোছুটি করে সিমেণ্ট জোগাড় করে দেয়। এই সমস্ত কাজের বিনিময়ে সে আমার কাছ থেকে টাকা পায়।

দালালমশাইকে এখন পাওয়া যাবে নাকি?

সে যে কখন কোথায় থাকে বলা শক্ত। যদি বলেন ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

থাক। পরে দেখা যাবে। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। পরে আবার দেখা হবে।

বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কালীকিঙ্করও এলেন সঙ্গে। সিঁড়ির মুখে এসে দেখা গেল একজন লম্বা ও একজন বেঁটে লোক ওপরে উঠে আসছে। বাসব আগে দেখেনি, তাই বুঝতে পারল না ঐ লম্বা লোকটিই রেবতী চৌধুরী।

কালীকিঙ্কর বললেন, আপনি যাকে খুঁজছিলেন সেই ওই আসছে।—রেবতীবাবু, ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

রেবতী একবার তাকাল বাসবের দিকে। তারপর বলল, এখন তো আমার সময় হবে না। একটু ব্যস্ত আছি। পরে বরং..

বেশ, পরেই কথা হবে।

বাসব ওদের পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেল। রাস্তায় নেমে অপর ফুটপাথের মেডিকেল স্টোরটায় গিয়ে ঢুকল। ওখান থেকে ফোন করল লালবাজারে। সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল মিঃ সামন্তকে।

হ্যালো . বাসব বলছি...আমার একজন লোক চাই, যে অষ্টপ্রহর রেবতী চৌধুরীর ওপর দৃষ্টি রাখবে...হ্যাঁ...আমি অপেক্ষা করছি ফ্ল্যাটবাড়িটার অপর দিকে...কি বললেন.. আধঘণ্টার মধ্যে পাঠাবেন...ও কে....ছেড়ে দিলাম...

রিসিভার নামিয়ে রেখে কলচার্জ দিয়ে বাসব বেরিয়ে এল ওখান থেকে। কয়েক মিনিট ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ একটা সম্ভাবনা মনে উদয় হবার পর আবার গিয়ে ঢুকল মেডিকেল স্টোরটার ভেতর।

'ভোলগা কেবিনে' খাওয়া-দাওয়া সেরে রেবতী রাস্তায় পা দিল। প্রতিদিন দু'বেলা সে এখানেই খাওয়া-দাওয়া সারে। বেলা তখন সাড়ে বারোটা। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মন্থর পায়ে এগুতে লাগল ফুটপাথ ধরে। এক সময় সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে ট্রামে উঠল রেবতী। ও বুঝতে পারল না তার সঙ্গে যে লোকটি ট্রামে উঠল, সে ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করে চলেছে।

রেবতী ট্রাম থেকে নামল ওয়াটগঞ্জে।

জাহাজীদের আড্ডাখানা এই অঞ্চল। ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ও এগিয়ে চলল। সে লোকটিও আছে যথা নিয়মে পেছনে পেছনে। যতই গঙ্গা কাছাকাছি হচ্ছে, মাতাল জাহাজীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে তত বেশি। তারা নানা দেশের, নানা বর্ণের। রেবতী ভাঙা-চোরা এক চায়ের দোকানের সামনে এসে থামল।

বল্টু এসেছিল নাকি?

দোকানদার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, এখানেই তো ছিলেন!

এই সময় বাসবের দেখা সেই বেঁটে লোকটি সেখানে উদয় হল।

আমায় খুঁজছিলেন নাকি?

বিরক্তির সুরে রেবতী বলল, কোথায় থাক তার ঠিক নেই! তোমার জ্বালায় এদিকে পার্টিদের ধরে রাখা তো আমার পক্ষে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছে।

বল্টু সমাদ্দার কখনো কথার খেলাপ করে না চৌধুরীমশাই। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। মালকড়ি এনেছেন তো?

ওদিকে—

বাসব তখন রীতার সঙ্গে কথা বলছে হাসপাতালে। তার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বাসবের অনুরোধে পুলিশ এখনও তাকে হাসপাতালে রেখেছে। প্রশ্নের কিন্তু আশাপ্রদ উত্তর মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না। তার সম্পর্কে অনেকে যা কিছু বলেছে, তা নিতান্তই তার চরিত্রকে অনর্থক কলঙ্কিত করার চেষ্টা। স্বামীর মৃত্যুতে সে এখন দিশেহারা। এই সমস্ত প্রশ্নের কচকচি তার ভাল লাগছে না।

বাসব শান্ত গলায় বলল, আপনি তো আমার সমস্ত প্রশ্নই এড়িয়ে গেলেন। এখন

অবশ্য তাতে কিছু যাবে আসবে না। যা জানবাব, তা আমার জানা হয়ে গেছে। যা-ই হোক, আপনি ডাক্তাব ভবানী দত্তকে চেনেন?

কে তিনি?

আপনি তাঁকে তাহলে চেনেন না?

এই নামের কোন লোকেব সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

তিনি কিন্তু আপনাকে ভালমতই চেনেন। এখন উঠলাম। যাবার আগে আরো একটা কথা বলে যাই, এই কেস যথাসময়ে কোর্টে উঠবে। সাক্ষ্য-প্রমাণের বিপক্ষে তখন কিন্তু সত্যকে মিথ্যা বলে চালালে পার পাওয়া যাবে না।

পরের দিন

বাসব ইতিমধ্যে মিঃ দাশগুপ্তর ফ্ল্যাটের মধ্যে গিয়ে ঘুরে-ফিবে দেখে এসেছে। কথা বলেছে সুবীর সান্যাল ও তৃপ্তি সেনের সঙ্গে। চৌধুরীর সঙ্গে কথা না বললেও, তার কার্যকলাপের চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ ইনফরমারটির সাহায্যে। এখন জাল গুটিয়ে নিলেই হয়।

বেলা একটার সময় বাসব লালবাজারে ফোন করল, হ্যালো...মিস্টার সামন্ত.. বাসব বলছি..

....

কেসটার ব্যাপারে আমি মোটেই উদাসীন নই...কেন্দ্রবিন্দুতে এস উপস্থিত হয়েছি বলা চলে...শুনুন, আজ বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় বাড়িতে চায়ের আসরের আয়োজন করছি...আসা চাই কিন্তু.

....

হঠাৎ নয়.. আপনি যে কাজের ভার আমায় দিয়েছেন...এই টিপার্টি তার অঙ্গ বলতে পারেন...সংশ্লিষ্ট সকলকে ওই সময় আমার বাড়িতে জড়ো করা কিন্তু আপনার দায়িত্ব...ঘণ্টা দুয়েকেব মধ্যেই সকলকে ইনর্ফম করুন। কারণ, তিনটের সময় আপনার কাছে যাচ্ছি...

....

গুরুতর কাজ আছে...ইতিমধ্যে আপনি নামের জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক রেখে একটা ওয়ারেণ্ট ইসু করিয়ে রাখতে পারেন...সেই লোকটিকে বোধহয় বমালসমেত ধরা সম্ভব হবে আপনার ইনফর্মারের কৃতিত্বেই .এছাড়া আপনাকে নিয়ে একটা ড্রাগহাউসে যাব.

....

শুধু ড্রাগহাউস নয়...একজন ডাক্তারের বাড়িতেও যেতে হবে...গিয়ে সমস্ত কথা বলছি...এখন ছাড়লাম।

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পৌনে ছ'টাব মধ্যেই সকলে এসে উপস্থিত হলেন।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইরুম গম্‌গম্‌ করতে লাগল। মিঃ সামন্তও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছে আরো কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি। তারা বাইরে

অপেক্ষা করছে। চা ইত্যাদি পরিবেশন করে গেল বাহাদুর। বাসব লক্ষ্য কবল, সকলেই চা-মনোযোগী হয়েছেন, তবে কারুর মুখেই প্রসন্নতা নেই।

সুবীর স্যান্যাল প্রথমে কথা বললেন, যা বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলুন। আমার একটা জরুরী কাজ আছে—

আমারও একটু ব্যস্ততা আছে। রেবতী চৌধুরী বলল, পুলিশের ডাকে সাড়া না দিলে বিপদে পড়তে পারি—এই ভয়েই আসতে হল।

সামন্ত বললেন, পুলিশকে খুব ভয় পান দেখছি!

তা একটু ভয় পাই স্যার।

বাসব বলল, আপনাদের অসুবিধেয় ফেলার জন্য দায়ী আমি। তবে খুব বেশিক্ষণ সময় নেব না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। বুঝতেই পারছেন, নীরেন দাশগুপ্তর হত্যা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই সকলকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। যদিও এই তদন্তের সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত নই। বন্ধুবর মিঃ সামন্তর অনুরোধেই এতে মাথা গলাতে হয়েছে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমি হত্যা-রহস্য ভেদ করতে পেরেছি। সেই সমস্ত বিষয় অবতাবণা করার আগে আমি জানাতে চাই আপনাদের মিঃ দাশগুপ্তর উইলের কথা। তিনি মিঃ সান্যালকে দিয়ে যে উইলের খসড়া করেছিলেন, তা কার্যকরী না করে, মাত্র মাস তিনেক আগে 'মিত্র ও দত্ত' ফার্ম থেকে একটা উইল করিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন। ওই ফার্মের সিনিয়ার পার্টনারের মুখ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর একমাত্র মেয়ে তৃপ্তি সেনকে দিয়ে গেছেন।

এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা জানতে পেরে তৃপ্তির মুখ থেকে একটা অর্থহীন আনন্দধ্বনি বেরিয়ে এল। স্বাভাবিক ভাবেই রীতার কাছে এই সংবাদ হতাশার। সে মলিন মুখে বসে রইল চুপচাপ।

এটা ভেবে দেখবার বিষয়,—বাসব আবার আরম্ভ করল, দীর্ঘদিন বিপত্নীক থাকার পর দাশগুপ্ত বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ একটু বেশি হয়। তবুও সুন্দরী, অল্পবয়স্কা দ্বিতীয়পক্ষকে কিছুই না দেবার কারণ কি? যেক্ষেত্রে মিস্টার সান্যালকে দিয়ে যে উইলের খসড়া করানো হয়েছিল, তাতে অর্ধেক সম্পদের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই আমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি স্ত্রীর কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়েই তাঁকে এইভাবে বঞ্চিত করেছেন। সেই কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুতর না হলে কোন স্বামী নিজের পছন্দ-করা স্ত্রীর ওপর এত কঠোর হতে পারে না। বলা বাহুল্য ব্যাপারটা চরিত্রঘটিত। আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি, রীতাদেবী প্রাক্-বিবাহিত জীবন থেকেই নিজেকে ছেড়ে রেখেছিলেন আর দশর্জনের কাছে।

তীক্ষ্ণগলায় রীতা বলে উঠল, এ সমস্ত আপনি কি বলছেন। একজন মহিলাকে অপমানিত করার সীমা থাকা উচিত!

আপনি অনর্থক সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, দিবাকরবাবু আরেকবার নিজের স্বীকারোক্তি দিতে পশ্চাৎপদ হবেন না। তাছাড়া ওঁর

কাছে আপনাকে যে প্রথমবার নিয়ে গিয়েছিল, সেই রেবতী চৌধুরীও এখানে উপস্থিত। এছাড়া সময় মত আমরা আপনার আরো খদ্দেরকে উপস্থিত করব।

স্যার, আবার আমাকে নিয়ে কেন?

আমতা-আমতা করে রেবতী চৌধুরী চুপ করে গেল।

আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না। রীতা উঠে দাঁড়াল।

আপনার এখান থেকে এখন যাওয়া চলতে পারে না মিসেস দাশগুপ্তা। বসুন। এখন আমার অনেক কিছু বলার আছে। সমস্ত কিছু আপনার শোনা দরকার, তা কেন বুঝতে পারছেন না?

মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করে আপনি আমার সম্মান নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। এজন্য আমাকে কোর্ট পর্যন্ত যেতে হতে পারে!

বেশ তো, যাবেন। এখন বসুন। এ ঘরের বাইরে যাওয়া যে সম্ভব নয়, তা তো বুঝতেই পারছেন। আমার কথায় আর বাধা দেবেন না।

দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁট নির্মমভাবে চাপতে চাপতে রীতা বসে পড়ল।

হ্যাঁ, যা বলেছিলাম, উনি যে স্ত্রীকে কিছুদিন থেকে ঘোরতর সন্দেহ করছিলেন, তার প্রমাণ হল, কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন চিঠি লিখে জানিয়েও তিনি যাননি। কয়েকঘণ্টা অন্যত্র কোথাও কাটিয়ে, রাত এগারোটার পর চুপি-চুপি বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছিলেন। এর অর্থ জলের মতই পরিষ্কার। নিজেব স্ত্রীকে তিনি হাতে-নাতে ধরতে চাইছিলেন। কারণ, তাঁর ধারণা হয়েছিল বোধ হয়, তিনি কলকাতায় অনুপস্থিত থাকলেই তাঁর ফ্ল্যাটে স্ত্রীর কোন-না-কোন নাগরের আগমন হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি সত্যিই সেদিন কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে?

বাসব সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কেউ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। সকলেই বোধহয় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বাসবের মুখ থেকে শুনতে চান। একমাত্র রীতার মনের ভাব বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সে বসে রয়েছে মাথা নিচু করে।

আমিই তাহলে বলি। এই লাইনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তা থেকে সহজেই আমি এমন অনেক কিছু আঁচ করে নিতে পারি—যা বাস্তবের কাছাকাছি। অবশ্য ওই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র রীতাদেবীই চমৎকার ভাবে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার ইচ্ছে তাঁর নেই। সুতরাং আপনারা আমার রুল অব থ্রিব ওপর নির্ভর করুন। আমি বলব, হ্যাঁ—সেদিন তিনি হাতে-নাতেই ধরেছিলেন নিজের স্ত্রীকে। তা যদি না হত, তাহলে তিনি কখনোই খুন হতেন না।

এবার আমি বলব কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্বামী কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন না জানতে পেরে রীতাদেবী ফোনে যোগাযোগ করেন দিবাকরবাবুর সঙ্গে, এবং স্থির হয় মেথর আসার দরজাটা খোলা থাকবে। ওই পথ দিয়েই দিবাকরবাবু ফ্ল্যাটে ঢুকবেন। তিনি সময় মত আসতেনও। কিন্তু দাশগুপ্তকে পাঁচিল টপকাতে দেখে বাধ্য হয়ে ফিরে যান। ফ্ল্যাটের মধ্যে নিশ্চিতভাবে অন্য নাটক জমে উঠেছে। আরেক প্রেমিকেরও জানা ছিল স্বামী আজ কলকাতায় থাকবেন না। সুতরাং তিনি এলেন শ্রীমতীর সঙ্গে রাত

কাটাতে। বিশেষ আতান্তরের মধ্যে পড়লেন রীতাদেবী। কারণ, যে কোন মুহূর্তে দিবাকরবাবু এসে পড়তে পারেন। একথা এই প্রেমিকপ্রবরকে বলা চলে না। ও লাইনের এ-ই নিয়ম। এই রকম পরিস্থিতিতে, মেথরের দরজা খোলা পেয়ে নাটকের কালযবনের মত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন দাশগুপ্ত। চিন্তা করে দেখুন পরিস্থিতি কি রকম জটিল! রাগে অন্ধ হয়ে দাশগুপ্ত বিভলবাব বার করলেন দুজনকেই শেষ করে দেবার জন্যে। কিন্তু সে-সুযোগ প্রেমিকপ্রবর তাঁকে দেয়নি। উপায়হীন অবস্থার মধ্যে তাকে হয়ত একাজ করতে হয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না, নরহত্যাকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করার অবকাশ কম। পরপর দু'বার গুলি খেয়ে পড়ে গেলেন দাশগুপ্ত, আর তাঁর হাতের রিভলবার ছিটকে গেল সোফার তলায়। আসল সমস্যা দেখা দিল এর পর। উত্তেজনার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেলেও এখন যে কোন উপায়ে পরিস্থিতিকে আয়ত্বে আনা দরকার। কারণ, পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করবে রীতাদেবীকে। তিনি চাপে পড়ে হত্যাকারীর নাম বলে দিতে পারেন। দুজনেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য এক চাল চাললেন। রীতাদেবীকে ক্লোরফর্ম করে প্রেমিক চম্পট দিল। অর্থাৎ হত্যাকারী স্বামীকে সাবড়ে, স্ত্রীকে অজ্ঞান করে সরে পড়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে হত্যাকারীর কোন সম্পর্কের কথা পুলিশ ভাবতে পারবে না।

বাসব থামতেই রীতা চিৎকার করে বলে উঠল, এসবের আমি কিছুই জানি না। যা মনে আসছে, তাই বলে যাবেন? আমার সহ্যের একটা সীমা আছে জানবেন!

আপনার সহ্যের সীমা কতটা, তা অবশ্য আমি জানি না। তবে অভিনয়-নৈপুণ্য যে আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। আবার প্রশ্ন করছি, ডাঃ ভবানী দত্তকে আপনি চেনেন?

না।

ডাক্তার দত্ত, একবার এ-ঘরে আসুন তো—

বাসবের আহ্বানে একজন ভদ্রলোক পাশের ঘর থেকে ড্রইংরুমে এলেন। চল্লিশের নিচেই তাঁর বয়স। তিনি পাশের ঘর থেকেই সমস্ত কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন। এখন তাঁর কিছুটা সচকিত ভাব।

এঁকে চেনেন, ডাক্তার দত্ত।

হ্যাঁ। ইনিই মিসেস দাশগুপ্তা।

এঁকে কতদিন থেকে চেনেন আপনি?

বছর দেড়েক থেকে।

বাসব সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এঁর কথাটাই শেষ কথা নয়। আমার হাতে আরো জোরালো প্রমাণ আছে। দেখুন তো মিসেস দাশগুপ্তা, এই প্রেসক্রিপসনটা চিনতে পারেন কিনা?

বাসব পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে মেলে ধরল।

মড়ার মত শুকিয়ে উঠল রীতার মুখ।

ডাক্তার দত্তকে চেনেন না—এখন বোধহয় আর একথা অস্বীকার করা যায় না, কি বলেন? এই প্রেসক্রিপসন আপনার নামে ডাক্তার দত্ত ইসু করেছেন। এবং এটির সাহায্যে আপনি 'ফেবারিট ড্রাগ কনসার্ন' থেকে ক্লোরফর্ম কিনেছিলেন। চিকিৎসকের

নির্দেশ না থাকলে ক্লোরর্ফম কেনা সম্ভব হয় না। ওয়েল ডক্টর, অনুগ্রহ করে বলুন, কি রকম পরিস্থিতিতে এই প্রেসক্রিপসনখানা লিখেছিলেন।

ডাঃ দত্তর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলি-বলি করেও বলতে পারেলন না।

সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দেবেন না। মনে রাখবেন, একটি নিষ্ঠুর হত্যার নেপথ্য-ইতিহাস সংগ্রহে সহযোগিতা অপরিহার্য।

ব্যাপারটা হচ্ছে—থেমে থেমে ডাঃ দত্ত বললেন, গত মঙ্গলবার রাত আন্দাজ বারোটার সময় রীতা আমার বাড়িতে এল। আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। যে কোন সময়ই সে আমার বাড়িতে এসে থাকে। আমি তখন একটু হুইস্কির ঝোঁকে ছিলাম। ওর কথায়, নেশার মাথায় তখন কি প্রেসক্রিপসন করেছিলাম, আমার কিছুই খেয়াল নেই। পরে পুলিশের কাছ থেকে সেই প্রেসক্রিপসন দেখে বুঝলাম ক্লোরফর্মের কথা লিখেছিলাম।

বাসব বলল, ক্লোরর্ফম কাছে ছিল না। কাজেই তা সংগ্রহ করার ব্যাপারে এত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল হত্যাকারী ও রীতাদেবীকে। এই সূত্রটা সংগ্রহ করি একরকম দৈবাৎ। ওঁদের ফ্ল্যাট বাড়ির সামনেই 'ফেবারিট ড্রাগ কনসার্ন।' ওখানে গিয়েছিলাম ফোন করতে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসার পরই মনে হল, এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি ডাক্তারখানা। পাপপ্রবণ মন স্থূল ভুল বেশি করে থাকে। এখান থেকেই ক্লোরফর্ম সংগ্রহ করা হয়নি তো? আবার গেলাম ভেতরে। জানতে চাইলাম, মঙ্গলবার সারা রাত দোকান খোলা ছিল কিনা? ওঁরা বললেন, খোলা ছিল। আমি আবার জানতে চাইলাম, সেদিন রাত্রে কেউ এখান থেকে ক্লোরফর্ম কিনে নিয়ে গেছে কিনা? ওঁরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অগত্যা আমাকে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল। সাবইন্সপেক্টর মোহিত মিত্র আসতেই ব্যাপার পরিষ্কার হল। সাক্ষাৎ পেলাম ডাক্তার দত্তর দেওয়া প্রেসক্রিপসনের। পুলিশকে নিয়েই ছুটলাম তাঁর বাড়ি। তিনি স্বীকার করলেন রীতা দাশগুপ্তকে এই প্রেসক্রিপসন দিয়েছিলেন। ও-সমস্ত কথা এখন থাক। এবার আসা যাক মূল প্রশ্নে। মিসেস দাশগুপ্তা, হত্যাকারীর নামটা বলবেন কি?

রীতা চুপ।

বিপদের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারছেন না। নিজেকে ডিফেন্স দেবার সুবর্ণ সময় পার হয়ে চলেছে!

রীতা চুপ।

সরকার পক্ষ অবলম্বন করে প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে নিন। তাতে বিপদের গুরুত্ব কম। নইলে আদালতে একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা হবে আপনাকে। হত্যাকারীর সঙ্গে শাস্তির বিশেষ তারতম্য হবে না আপনার। দশ বছর জেল হতে পারে, বিশ বছর জেল হতে পারে, ফাঁসি হওয়াও বিচিত্র নয়।

রীতা আর চুপ করে থাকতে পারল না। কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর কোনরকমে বলল, ওই লোকটা—ওই লোকটা—

সকলে সচকিত হলেন।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, কার কথা বলছেন?

ওই যে বসে আছে—আমার জীবনের শনি—

রীতার আঙুল দিয়ে নির্দেশিত কালীকিঙ্কর ঝটিতে উঠে দাঁড়িয়ে কঁকিয়ে উঠলেন, এ—এ সমস্ত কি বলছেন—আপনাকে আমি তো ভাল করে চিনি না পর্যন্ত!

দ্রুত গলায় বাসব বলল, বল আউট হয়ে গেছে কালীকিঙ্করবাবু। আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

বিশ্বাস করুন, উনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ওঁর কথাই আমার কাছে শেষ কথা নয়। আপনাকে আগেই চিনেছি। এ তো একটা নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করার প্রয়াস মাত্র। থাক, আপনারা সকলে নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, ইনিই হলেন সেই প্রেমিকপ্রবর-কাম-হত্যাকারী।

নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে তীব্র গলায় কালীকিঙ্কর বললেন, গায়ের জোরে কাউকে খুনী প্রতিপন্ন করা যায় না। আমাকে এইভাবে অপমানিত করার ফল ভাল হবে না।

বললাম না, মিসেস দাশগুপ্তার কথার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে না। তবে ওঁর কথা আদালতে জোরালভাবে গৃহীত হবে সন্দেহ নেই। এরপর আসছে সেই বিশেষ প্রমাণ। রেবতী চৌধুরীর সহযোগিতায় কিছুদিন আগে আপনি যে আমেরিকান রিভলবার সংগ্রহ করেছিলেন, কাজটা তাই দিয়েই হয়েছে। এবং অনেক টাকা দিয়ে কেনা অস্ত্রটা আপনি এখনও ফেলে দিতে পারেননি।

রেবতী মিহি গলায় বলল, আবার আমাকে কেন?

আপনি যে একজন সাধারণ জীব নন, তা আমরা জানতে পেরেছি। মেয়েদের ব্যবসা ছাড়াও আপনি বিদেশী অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসের কেনা-বেচা করেন। আমাদের ইনফর্মার ছায়ার মত অনুসরণ করে আপনার সম্পর্কে নিখুঁত সংবাদ সংগ্রহ করেছে। শুনলে দুঃখিত হবেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আপনার বিশিষ্ট বন্ধু স্মাগলার বল্টু সমাদ্দারকে বমালসমেত পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে স্বীকার করেছে সব। একথাও বলেছে, অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে একটা পয়েণ্ট থ্রি ম্যাগনাম রিভলবার সে বিক্রি করেছে আপনার মাধ্যমে কালীকিঙ্করবাবুকে। ওই রিভলবার দিয়ে খুন করা হয়েছে কিনা তা অবশ্য সে জানে না, তবে ওটা কালীকিঙ্করবাবুর ল্যাভেটরির স্যানিটারি ওয়াটার ট্যাঙ্কের মধ্যে যে রাখা আছে, তা সে জানে। আমার আর কিছু বলার নেই। কিভাবে কোর্টে খুনের কেস ফ্রেম-আপ করা হবে বা আপনাকে বল্টু সমাদ্দারের মত লকআপে পাঠানো হবে কিনা, তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যাথা নেই। সে দায়িত্ব পুলিশের। তাঁরা এবার এগিয়ে আসছেন।

রেবতী চৌধুরীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে মনে হল। সে কোচের হাতল আঁকড়ে ধরে নিজেকে ঠিক রাখবার চেষ্টা করছে। কালীকিঙ্কর আর কিছু বললেন না, বসে রইলেন মুখ নিচু করে। তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে রীতা। এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল।

ওখানে সরিসৃপ

ভারী নিশ্বাসে ষ্টাডি ভরপুর।

সুদেব তাকিয়ে আছে সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের দিকে। শুধু সুদেব নয, ডাঃ দে, মিঃ সরকার এবং ইন্সপেক্টার সুকুমার দেবের দৃষ্টিও সেই দিকে নিবদ্ধ। রক্তাপ্লুত অবস্থায় টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন সৌমেন সিংহ।

কাল সন্ধ্যায দেখা সজীব সতেজ লোকটা আজ আর পৃথিবীতে নেই। স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও কথা ছিল, তাঁকে কেউ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। সুকুমার দেব এগিয়ে গিয়ে তাব গায়ে হাত রাখলেন, পাথরের মত শক্ত। পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, তিনি বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

মৃত অবস্থায় সৌমেন সিংহ কতক্ষণ এখানে পড়ে থাকতেন কে জানে? এক রকম দৈবাৎ তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে তন্দ্রা। সৌমেন সিংহের একমাত্র মেয়ে। গ্রাজুয়েট হবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। হাসিখুশী, প্রিয়ংবদা—কলেজের পরিচিতরা তাকে মিষ্টি মেয়ে বলে ডাকে।

খুব ভোরে তন্দ্রার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় খানিক এপাশ ওপাশ করে সে উঠে পড়েছিল। খাট থেকে নেমে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জানলার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে দেখলে বাগানটাকে ভারী সুদৃশ মনে হয়। মর্নিংগ্লোরির ঝোপটা কিন্তু দেখা যায় না এই ধার থেকে। গত সন্ধ্যায় ওই ঝোপের ধারে বসে অনেকক্ষণ দীপঙ্করের সঙ্গে গল্প করেছিল তন্দ্রা।

জানলার কাছ থেকে তন্দ্রা সরে আসছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি ষ্টাডির দিকে। সেকেলের বাড়ি। কাজেই দোতলার এই ধার থেকে একতলায় অবস্থিত ষ্টাডি পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে আলো জ্বলছে তন্দ্রা অবাক না হয়ে পারেনি। ভেণ্টিলেটারের ফোকর দিয়ে আলো আসছে। ব্যাপারটা কি? বাবা কি রাত ভোর ঘুমননি।

তন্দ্রা দ্রুত নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দাতেই দেখা হল বাড়ির পুরানো চাকর শ্যামাচরণের সঙ্গে।

—তোমাদের কি আক্কেল বলতো? বাবা যে রাত ভোর বই পড়ে কাটিয়ে দিলেন সে হুঁস আছে?

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত গলায় বলল আমি বলেছিলুম। উনি বললেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাজ সেরে শুতে যাবেন।

তন্দ্রা নীচে নেমে এল।

ষ্টাডির দরজায় ধাক্কা দিল বারকতক।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। টেবিলে মাথা রেখে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তন্দ্রা এবার জোরে জোরে ডাকতে লাগল। শ্যামাচরণ ধাক্কা মারতে লাগল দরজায়। কোন সাড়া নেই। তাইত! কি হল? অসুস্থ হয়ে পড়েন নি তো? দুজনে এবার ছুটে গেল

বাগানে। পর পর দুটো জানলা। পাল্লা অবশ্য ভেতব দিক থেকে বন্ধ কাচেব শার্শি থাকায় ঘরের ভেতবটা বাইবে থেকে দেখতে অসুবিধা নেই।

ওকি !!!

আর্তচীৎকার করে উঠল তন্দ্রা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শ্যামাচরণও দেখল, বসা অবস্থায় হুমড়ি খেযে পড়ে রয়েছেন সৌমেনবাবু। হাতদুটো-ঝুলছে চেয়ারের হাতলেব দু'পাশে পিঠের দিকে সাদা শার্ট চাপ চাপ রক্তে কালো হয়ে উঠেছে।

তারপর—

পুলিশ অবশ্য দরজা ভেঙ্গেই ভেতরে ঢুকেছে। ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিযে ইন্সপেক্টার দেব বিশেয চিন্তিত হয়েছেন। দুটো মাত্র জানলা আছে। দুটোই ভেতব থেকে ছিটকিনি লাগানো। দরজা একটাই—যা ভেঙ্গে পুলিশ ভেতরে এসেছে। হত্যাকারী তবে ঘরে ঢুকলো কোন পথ দিয়ে?

দ্রুতহাতে প্রাথমিক কাজগুলো সারলেন ইন্সপেক্টার। তারপর চাকর-বাকবদের জেরায় জেরায় জেরবার করে তুললেন। কিন্তু কোন মূল্যবান সূত্র পাওয়া গেল না তাদের কাছ থেকে। শ্যামাচরণের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই ডাঃ দে, মিঃ সরকাব আর সুদেব চলে এসেছে এখানে। পুরাতন ভৃত্যর অজানা নয়, বাবুর পেয়াবেব লোক এরাই।

মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হযে যাবাব পর ডাঃ দে প্রশ্ন করলেন, কি বকম বুঝছেন ইন্সপেক্টার?

—খুবই গোলমেলে ব্যাপাব। দেখি কত দূর কি করে ওঠা যায়। ওঁরা কথা বলতে বলতে পোর্টিকোতে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময় একজন কনেস্টবল চাকব শ্রেণীব একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। তার বক্তব্য, এই লোকটা খিডকিব দবজা দিয়ে পালাচ্ছিল। তাই ধবে এনেছে।

সুকুমারবাবু প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি রত্নাকর। এ বাড়িতে কাজ করি।

—কাজ কর' কই, একটু আগে যখন সকলকে জেরা করলাম, তুমি তো তখন ছিলে না?

—আজ্ঞে, ঘুমচ্ছিলাম।

কুম্ভকর্ণের ভায়রাভাই। বাড়িতে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল—এত হৈ-চৈ, তবু তোমার ঘুম ভাঙ্গল না? চোরের মত পালাচ্ছিলে কোথায়?

—পালাইনি। বাড়ির বাইরে যাচ্ছিলাম।

ভারী গলায় ইন্সপেক্টার বললেন, আমাব সঙ্গে দেখা না করে বাইরে যাচ্ছিলে কেন? জমাদার হাতকড়া লাগাও।

এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রত্নাকর।

—আমায় ছেড়ে দিন হুজুর। আমি কিছু জানি না—আমায় ছেড়ে দিন।

ওর কথায় কান দিলেন না সুকুমার দেব রত্নাকরকে পুলিশ ভ্যানে তোলা হল।

ওর পেট থেকে প্রচুর কথা বার করা যাবে এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। কে বলতে পারে, ওই লোকটা খুন করেনি।

ষ্টাডির ভাঙ্গা দরজার সামনে একজন কনেস্টবল মোতায়েন করে তখনকার মত বিদায় নিলেন তিনি। তন্দ্রা নিজেকে সামলে নিলে পরে তার সঙ্গে এসে কথা বলবেন। চিন্তিত সুদেব একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যার কথা। সবে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছে, টেলিফোন বেজে উঠল।

সুদেব রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো...কে...মিঃ সিংহ...আমি বর্মন...

অপর প্রান্ত থেকে সৌমেন সিংহ বললেন, এখুনি চলে আসুন... বিশেষ প্রয়োজন...

—এখনই আসছি...

—আমি অন্যান্যদের খবর দিয়েছি...ওঁরাও আসছেন...ছেড়ে দিলাম...

তিনি লাইন কেটে দিলেন।

সৌমেন সিংহ।

সুবিখ্যাত টিম্বার মার্চেণ্ট। লাউডন স্ট্রীটে নিজের বিরাট বাড়িতে একমাত্র মেয়ে নিয়ে বাস করেন। প্রচুর অর্থ থাকাব দরুন মনের আনাচে-কানাচে বহু হুজুগ বাসা বেঁধে রয়েছে। ওই সঙ্গে রয়েছে নানারকম বাতিক।

তাঁর মেয়ে তন্দ্রা। তৃতীয় বার্যিক শ্রেণীর ছাত্রী। সুশ্রী ও সুগঠনা—প্রাণচঞ্চল মেয়ে। জন্মের ক্ষণেই মাকে হারিয়েছে সে। বাবার প্রাণঢালা ভালোবাসা পেয়েই বড় হয়েছে।

সুদেবের সঙ্গে সৌমেন সিংহের আলাপ বেশ কিছু দিনের। লায়ন্স ক্লাবে এই আলাপের সূত্রপাত হয়। সিংহ ওকে স্নেহের চোখে দেখলেও, সম্মান দিয়ে কথা বলেন। সুদেব এ রকম টেলিফোন আহ্বান বহুবার পেয়েছে। প্রতিবার তলবেই অত্যন্ত জরুরী বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে তা নিতান্তই মাছি মারতে কামান দাগার সামিল। অর্থাৎ কোন বার হয়ত তিনি ডেকেছেন মাছ ধরার প্রোগ্রামের বিষয় আলোচনা করতে। আবার কোনবার আসাম থেকে কমলালেবু গাছের চারা আনাবার বিস্তৃত জল্পনার জন্য। আবার কখন হয় তো—

একেই বলে বড়লোকের খেয়াল।

সাতটার কিছু আগেই সুদেব 'সিংহ-লজে' এসে পৌঁছাল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ও সোজা চলে গেল ড্রইংরুমে—যেখানে ডাঃ দে ও মিঃ সরকার রয়েছেন। গম্ভীর মুখে সৌমেন সিংহ পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর মুখের থমথমে ভাবে কোন কৃত্রিমতা নেই। মনে হচ্ছে এবার প্রকৃত কোন গুরুতর ব্যাপারের জন্যই আহ্বান করেছেন। সুদেবের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। একটু দেরী করে ফেলেছেন। বসুন।

সুদেব, ডাঃ দে ও মিঃ সরকারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটলেন মিঃ সিংহ। আরো খানিক পায়চারি করার পর, সোফায় এসে

বসে বললেন, আমি হযত আর বেশীদিন বাঁচাবো না। বযস তো কম হল না। বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম—

ডাঃ দে ওঁকে, বাধা দিয়ে বললেন, এ আপনার মনের দুর্বলতা মিঃ সিংহ। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি তো, স্বাস্থ্য আপনার ভালোই আছে।

—আছে হয়ত। কিন্তু আপসেট করতে কতক্ষণ। কয়েকদিন ধরে নানা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে চলেছি। যাক সে কথা। যে জন্য আপনাদের ডেকেছি এবার তাই বলি। আমি আমার উইল পাল্টাতে চাই।

মিঃ সরকার বললেন, পাল্টাতে চান! কিন্তু কয়েক মাস আগেই তো আপনি উইল করেছেন।—তা কবেছি। আপনারাই সেই উইলের সাক্ষী ছিলেন। তবে এখন উইল পাল্টাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আপনারা জানেন, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমি আমার একমাত্র মেয়ে তন্দ্রার নামে লিখে দিয়েছি। তবু আবার উইল পাল্টাবার কেন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে, এ বিষযে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

ঘরেব আর তিনটি প্রাণী নিরবে উৎকর্ণ রইল। মিঃ সিংহ সিগারেট ধরিয়ে নিযে বললেন, এই প্রসঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের কিছু আপনাদের বলতে হবে, বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর বিপুল সম্পত্তি আমার ও দাদার হাতে আসে। আগেকার মত আমরা এক সঙ্গেই বাস করতে শুরু করি। আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে খুব মিল ছিল। সময় কেটে যেতে লাগলো আনন্দে। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। প্লেনক্র্যাসে মারা গেলেন দাদা-বৌদি। আমি চারিধারে অন্ধকাব দেখলাম। কিন্তু আমার সমস্ত শোক ভুলতে হলো দাদার একমাত্র ছেলে রণেনেব মুখ চেয়ে। রণেনের বয়স তখন আট বছর, তন্দ্রার জন্ম হয়নি। আমার স্ত্রী রণেনের ভাব নিলেন। কিন্তু ওকে মানুষ করার বিষয়ে আমরা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। পডার বইয়ের সঙ্গে ওব সম্পর্ক ছিল না—তার উপর বখা ছেলেদের সঙ্গে মিশে একেবারে বখে গিয়েছিল। আমি রণেনকে ভাল পথে আনার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। শেষে চরম হ'লো, যেদিন ও আমার আলমারির তালা ভেঙ্গে দু'হাজাব টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল।

থামলেন মিঃ সিংহ। নিভে যাওয়া সিগারেট আবার ধরালেন।

ঘরের আর তিনজন নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন। মনেব মধ্যে নানা কথা ওঠানামা করছে। সুদেবের মনে হ'ল, উনি এত সিরিয়াস বোধহয় কখনও হননি।

উনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। রেডিয়োতে এনাউন্সমেণ্ট হলো। কিন্তু রণেনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর কত বছর কেটে গেল—আমি ধরে নিয়ে ছিলাম, ও মারা গেছে। তাই সমস্ত কিছু উইল কবে দিয়েছিলাম তন্দ্রার নামে। কিন্তু দিন কয়েক আগে একটা চিঠি পাবার পর থেকে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। চিঠিখানা দিয়েছে আমার নিরুদ্দিষ্ট ভাইপো রণেন।

—বলেন কি? তাহলে সে মারা যায়নি? প্রশ্ন করলেন, মিঃ সরকার।

—না, এতদিন মাদ্রাজে ছিল। আপনারা চিঠিখানা দেখুন।

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করলেন মিঃ সিংহ। সকলে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। অল্প কয়েকটি মাত্র কথা তাতে লেখা।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু,

দীর্ঘদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন। অনেক অপরাধ করেছি, এখন আমি অনুতপ্ত। বাকী জীবন আপনার সেবাতেই কাটাতে চাই। কালই মাদ্রাজ থেকে রওনা হচ্ছি। বহুদিন এখানেই ছিলাম। প্রণাম নেবেন। ইতি—

রণেন।

সুদেব বললো, উনি আসবার আগেই তাই উইলটা পাল্টাতে চাইছেন?

—হ্যাঁ। চিঠি পড়েই বুঝতে পারছি, ও যথেষ্ট অনুতপ্ত। তাছাড়া সম্পত্তির উপর অর্ধেক দাবী ওর আছে। আপনারা বয়সে অনেক ছোট হলেও, কোন বৈষয়িক কাজ আপনাদের সাহায্য বা পরামর্শ ছাড়া আমি করি না। আজ উইল পরিবর্তনের ব্যাপারেও আপনাদের সাহায্য আমি চাই।

ডাঃ দে বললেন, আপনি এখন সম্পত্তি আধা-আধি বখরা করতে চান বোধহয়?

—হ্যাঁ। তন্দ্রা ও রণেনের মধ্যে সমান ভাগ।—কিন্তু আমি বলছিলাম—মিঃ সরকার বললেন, অবশ্য একজন আইনজ্ঞ হিসেবেই আমি বলছি, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই। আপনি বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করুন। তারপর যা হয় করবেন।

কিছু আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, রণেন ফিরে আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারটা মুলতুবি রাখা হবে।

সুদেব দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়ে। মাত্র গতকালের কথা—এখনও পায়চারিরত মিঃ সিংহের চেহারাটা চোখের ওপর ভাসছে। আর আজ তিনি নেই, নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

কে তাঁকে হত্যা করলো?

বেলা তখন একটা।

দুশো একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে একটা সোফায় গা এলিয়ে বাসব পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। মাত্র গতকাল একটি তদন্তের সাফল্য-জনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বেনারস থেকে ফিরেছে সে।

বাহাদুর একটা রেজেষ্ট্রী চিঠি নিয়ে এল। রিসিট সই করে দিয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করতেই বাসব অবাক হলো। চিঠির সঙ্গে পাঁচখানা একশ টাকার নোট পিন দিয়ে গাঁথা। চিঠিখানা বিশেষ বড় নয়। লাইন পাঁচেকের মধ্যে নিজের বক্তব্য শেষ করেছেন পত্রলেখক।

বাসব পড়লো—

মান্যবরেষু,

আপনি আমায় চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনার পরিচয় জানি, বিখ্যাত ধনী সৌমেন সিংহ নিহত হয়েছেন রহস্যজনক ভাবে, কাগজে পড়েছেন নিশ্চয়। এই হত্যার তদন্ত

কবাব জন্য আপনাকে অনুরোধ কবছি। আমাকে নিবাশ কববেন না আশা করি। কিছু টাকা পাঠালাম।

ইতি—

সিংহ পবিবারের জনৈক বন্ধু,

বাসব ভালোভাবে চিঠিখানা দেখলো। বিচিত্র ব্যাপাব! গতকাল ও কাগজে পড়েছে মিঃ সিংহের নিহত হওয়ার কথা। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে না চিনলেও, বহু বন্ধুর কাছে ও বহু ভাবেই তাঁর নাম শুনেছিল বাসব।

সোফা থেকে উঠে ও টেলিফোন স্ট্যাণ্ডেব দিকে এগিযে গেল। পুলিশের অনেক উপবওয়ালাব সঙ্গে ওর দহরম। এ সম্পর্কে কথাবার্তা তাদের সঙ্গে আগে থেকে বলে নেওয়া ভালো। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের সুবিখ্যাত মিঃ সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করল বাসব।

অপর প্রান্ত থেকে মিঃ সামন্ত বললেন, রক্তেব গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি চনমনে হযে উঠেছেন শুনে খুশী হচ্ছি। আমাদেব কাছ থেকে সমস্ত বকম সহযোগিতা পাবেন।

—ধন্যবাদ।

ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখছে বাসব। ১২x১২-ব বেশী হবে না। পেল গ্রীন কালাবেব ডিসটেম্পাব কবা দেওয়াল। বাগানেব দিকে পব•পব দু'খানা জানলা আছে।

সুকুমাব দেবকে সঙ্গে নিযেই বাসব মিঃ সিংহেব ষ্টাডিতে ঢুকেছে। সেক্রেটেবিয়েট টেবিল, খান তিনেক চেয়াব ও একটা আলমাবি ছাডা ঘবে আব কিছু নেই। দেওয়ালে গোটা কয়েক ল্যাণ্ডস্কেপ বয়েছে। মিঃ সিংহের দামী ওয়েবার্ণ ফ্রেমে বাঁধান একটা পোর্ট্রেটও ঝুলছে।

বাসব সিলিঙেব দিকে তাকালো। বাগানেব দিকে তাকালো। বাগানেব দিকে দেওয়ালে সারি সারি তিনটে ভেণ্টিলেটাব। হাল্কা নীল বঙের কাঁচযুক্ত ভেণ্টিলেটাবগুলো বিশেষ বড় নয়। নিয়ন লাইটে ঘব আলোকিত করা হয়। কোন পাখা নেই। এয়ার কুলিং ব্যবস্থা।

বাসব সুকুমার দেবেব দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ সিংহ টেবিলের উপব হুমডি খেয়ে পডে ছিলেন বললেন তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, মারা যাবার পূর্ব-মুহূর্তে তিনি কি কিছু কবছিলেন। অনুমান করা গেছে?

ইন্সপেক্টার বললেন, সে সময় তিনি চিঠি লিখছিলেন। কাবণ টেবিলের উপবেই ছিল অর্ধ সমাপ্ত চিঠি, আর ডান হাতে কলম।

—হুঁ। এ ঘরের কাজ আমার শেষ হয়েছে। চলুন, বাগানে ঘুবে আসা যাক এবাব।

দু'জনে বাগানে এলো।

বাড়ির পিছন দিকের বাগানেব অংশে বেশ কিছু জমি জুড়ে চতুর্দিকেই সিজিন ফ্লাওয়ারের সমাবোহ। ফুলের উপর গৃহকর্তার যে বিশেষ অনুবাগ ছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

—চলুন, ষ্টাডির ব্যাক পোর্শানে।

ইন্সপেক্টার ওকে যথাস্থানে নিয়ে এলেন।

বাসব ঝুঁকে সেখানকার মাটি পরীক্ষা করতে লাগল। মাটি যদিও দেখা যাচ্ছিল না। ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত চারিদিক! সুকুমার দেবও এধার ওধার দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, যদি কোন সূত্র চোখে পড়ে। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, ঘাসের উপর কি একটা চকচক করছে—একটা বোতাম। বড় সাইজের কুচকুচে কালো একটা বোতাম। বেশ পুরু। মনে হয় কোটের বোতাম!

ইন্সপেক্টার এগিয়ে এলেন বাসবের দিকে। তাঁর অপূর্ব আবিষ্কার দেখাবার জন্যই অবশ্য। বলা যায় না, এই বোতামটাই হয়ত পরে দেখা যাবে হত্যা রহস্যের চাবিকাঠি। বাসব তখন হাঁটু গেড়ে বসে কি একটা দেখছিল।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে বললো, এখানকার ঘাস দেখেছেন। কেমন যেন অবিন্যস্ত।

—মনে হচ্ছে ভারী কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘসে গেছে। এদিকে দেখুন, আমি এই বোতামটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

বাসব বোতামটা সুকুমার দেবের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললো, কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আমি এটাকে এখন নিজের কাছেই রাখছি। পরে ফিরিয়ে দেব আপনাকে।

ইন্সপেক্টার সম্মত হলেন।

ওখানে আর কিছু করার ছিল না। দু'জনে পার্লারে এসে দাঁড়ালো।

বাসব বললো, এখন আমি বাড়ি ফিরতে চাই। সন্ধ্যার পর আবার এখানে এসে এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাবে। ভাল কথা, পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট একবার দেখতে পেলে ভালো হয়।

অন্য একটি কেসে বাসবের সঙ্গে ছিলেন সুকুমার দেব। কাজেই তিনি ওর কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বললেন, রিপোর্টের নকল আপনাকে পাঠিয়ে দেব?

—তার চেয়ে নকল নিয়ে আসুন না সাড়ে আটটার পর আমার ওখানে। ততক্ষণে আমি এখান থেকে ফিরে যেতে পারব। দু'জনের মধ্যে কেস নিয়ে আলাপ আলোচনা হওয়া ভাল নয় কি?

—বেশ তাই হবে।

আটটা বেজে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

তন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে সিংহ-লজে যাওয়া হয়নি বাসবের। ও ড্রইংরুমে বসে জানলার দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কি চিন্তা করছে। শৈবাল ঘরে প্রবেশ করলো।

বসতে বসতে বললো, তুমি যে ক্রমেই ঈদের চাঁদ হয়ে যাচ্ছ। দেখাই পাওয়া যায় না। সকালে দু'বার এসে ঘুরে গেছি।

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললো, আর বল কেন ডাক্তার সিংহ মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছি।

—কোন্ সিংহ! সৌমেন সিংহ নাকি? পেপারে তাঁর খুন হওয়ার কথা পড়েছিলাম বটে। তারপর—

বাসব সমস্ত কিছু খুলে বলল, রেজিস্ট্রি চিঠি পাওয়া থেকে বাগানে বোতাম কুড়িয়ে পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। থানায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ষ্টেটমেন্ট পড়ে ও ঘটনাটা মোটামুটি জেনেছিলাম।

সুকুমার দেব এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন। বাসব সাদরে অভ্যর্থনা জানাল ওঁকে। উনি বসার পর পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন। কলিংবেলে চাপ দিয়েছিল বাসব। বাহাদুর এসে দাঁড়াল।

—আমাদের কফির ব্যবস্থা কর বাহাদুর।

বাহাদুর মাথা নেড়ে চলে গেল। বাসব রিপোর্টটা খাম থেকে বার করে চোখের সামনে মেলে ধরল। কোমরের উপর একটা এবং ঠিক ভার্টিব্রে ঘেঁসে একটা গুলি বিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সার্জেনদের অভিমত, মিঃ সিংহ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে একটু ছটফট করবারও অবকাশ পাননি।

বাসব রিপোর্টটা সেণ্টার টপের উপর রাখলো।

ইন্সপেক্টর বললেন, কি রকম বুঝলেন?

—কাজ ভালই এগুচ্ছে। এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ডাক্তার তুমিও তো সমস্ত শুনলে। সম্ভব হলে উত্তর দাও। মিঃ সিংহ যে ঘরে হত হয়েছেন, তার দরজা মাত্র একটা, দু'টো জানলা। সেগুলো সমস্তই ছিল ভিতর দিক থেকে বন্ধ। আমি দরজা পরীক্ষা করে দেখেছি, ইয়েল লক লাগান নয়—কাজেই হত্যাকারী ঘরের বাইরে এসে দরজা টেনে বন্ধ করে দেওয়ায় ভেতর থেকে লক হয়ে গিয়েছিল, এ সম্ভাবনাও নেই। এখন আমার প্রশ্ন হ'ল, হত্যাকারী কিভাবে ঘরে ঢুকে নিজের কাজ হাসিল করেছিল? নিশ্চয় সে হাওয়ায় মিশে ঘরে প্রবেশ করেনি?

সুকুমার দেব বললেন, প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল, কোন গুপ্ত দরজা আছে বোধহয়। মিঃ সিংহ বাড়ি তৈরী করেছিলেন. সম্প্রতি। 'নিউ লাইফ কনস্ট্রাকশন কোম্পানী'র তত্ত্বাবধানে ওই বাড়ি তৈরী হয়েছে খবর পেয়ে ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। শুনলাম বাড়িতে কোন গুপ্ত দরজা নেই।

—আপনি আলেয়ার পেছনে ছুটে গিয়েছিলেন সুকুমারবাবু। ডাক্তার, তুমি কোন হদিশ খুঁজে পেলে?

শৈবাল বলল, না ভাই, এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।

বাহাদুর কফি নিয়ে এল। ওই সঙ্গে নাট্ ও পোটাটো চিপস্‌ও আছে। সে তৎপরতার সঙ্গে পরিবেশন করল তিনজনকে।

বাসব কাপে চুমুক দিয়ে বললো, পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে উণ্ডের চারপাশে চামড়া পুড়ে গেছে ওকথা লেখা নেই। কাজেই অনুমান করে নিতে বাধা নেই যে, গুলি দূর থেকে করা হয়েছিল। এখন বাড়ির পোজিশানের কথা চিন্তা করুন। মিঃ সিংহ টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। পিঠে গুলি লাগার জন্যই ও রকমটা হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেওয়া যাক হত্যাকারী কোন রকমে ঘরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু পিঠেই বা সে গুলি করতে গেল কেন? যে পিঠে গুলি করতে পারে তার

পক্ষে বুকে গুলি করা নিশ্চয়ই খুব শক্ত ব্যাপার ছিল না। যে ক্ষেত্রে বুকে গুলি করলেই মৃত্যু দ্রুত আসবে।

বাসব থেমে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, ধাঁধা ওখানেই। আসলে হত্যাকারীর পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। অর্থাৎ সে আদপেই ঘরের মধ্যে ছিল না। সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে পিঠে গুলি করাই সুবিধাজনক।

শৈবাল বলল, ঘরের দরজা জানলা সমস্ত ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে গুলি চালান কিভাবে সম্ভব?

—সম্পূর্ণ সম্ভব। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সুকুমারবাবু, ষ্টাডির ঠিক পিছনে, বাগানের ওই অংশে ঘাসের উপর খানিকটা ঘসা দাগ দেখেছিলাম।

ইন্সপেক্টার মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

—এবার আপনাদের দু'জনকে ভেন্টিলেটারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

উত্তেজিত গলায় সুকুমার দেব বললেন, আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ভেন্টিলেটারের কাচ সরিয়ে গুলি চালিয়েছিল?

—এক্‌জ্যাক্টলি। ঘাসের উপর যে দাগ দেখেছি, আমার দৃঢ় ধারণা, তা মই রাখার চাপেই সৃষ্টি হয়েছে। হত্যাকারী মই বেয়ে ভেন্টিলেটারের কাছে উঠে যায়। সেখান থেকে মিঃ সিংহর পিঠটাই সে দেখতে পেয়েছিল। তাই পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না।

শৈবাল বলল, নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে দুবার গুলি ছোঁড়া হল কিন্তু কেউ শব্দ শুনতে পেল না। নিশ্চয় সায়লেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল?

—নিশ্চয়ই তাই। এখানে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। হত্যাকারী মই ঘাড়ে করে খুন করতে আসেনি। তাকে মইটা সংগ্রহ করে নিতে হয় মিঃ সিংহে'র বাড়ি থেকেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে সিংহ পরিবারের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ যে মই ইত্যাদির মত সামান্য জিনিসও কোথায় আছে তা তার জানা। তাছাড়া সে একজন ভালো লক্ষ্যবিদ। কারণ এত উঁচু থেকে ভার্টিব্রেটে টার্গেট করা সহজ কথা নয়।

সুকুমার দেব বললেন, আমি অবাক হচ্ছি মিঃ ব্যানার্জী। দ্রুত আপনি রহস্যের গেঁরোগুলো খুলে চলেছেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, চোখ কান খুলে রাখলেই অনেক রহস্য জটিল হবার অবকাশ পায় না।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় বাসব ও শৈবাল সিংহ লজে গিয়ে পৌঁছাল। ইন্সপেক্টার এখনও আসেনি। তাঁর উপস্থিতি বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনও নেই। আগেই টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সুদেব, ডাঃ দে ও মিঃ সরকারও উপস্থিত হয়েছেন। ড্রইংরুমে কথা হচ্ছিল। বাসবের অনুরোধে তিনজন পর্যায়ক্রমে সেদিন সন্ধ্যার ঘটনা বিবৃত করলেন।

—তাহলে মিঃ সিংহ সেদিন উইল পালটান নি।

সুদেব বলল, হ্যাঁ। আব রণেনবাবুর চিঠির বক্তব্য অনুসারে তাঁর এসে পড়া উচিত ছিল।

—কিন্তু.

ডাঃ দে বললেন, কেন সে এল না, বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

—হুঁ। এই বাড়িতে কে কে থাকেন?

সরকাব বললেন, তন্দ্রা বর্তমানে একাই আছে। অবশ্য চাকর দারোয়ানদেব কথা আলাদা।

—আপনাদের আব আটকাব না। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। অনুগ্রহ কবে বাড়ির পুরোনো চাকর শ্যামাচবণকে যদি পাঠিয়ে দেন তাহলে বিশেষ সুবিধা হয। তিনজনে ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন।

শ্যামাচবণ ঘবে এল মিনিট কয়েক পরে।

বেঁটেখাটো লোক, বযস হয়েছে। মাথার পাকা চুল ও শরীরের ঝুলে পড়া চামড়া তার সাক্ষী। দেখলে বুঝতে পারা যায়, এককালে বেশ বলশালী ছিল। এই দুর্ঘটনায় বেশ মুহ্যমান হযে পড়েছে সে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিযে বলল, তুমিই শ্যামাচরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—আমি তোমার বাবুর খুনের তদন্ত করতে এসেছি, নিশ্চযই শুনে থাকবে?

শ্যামাচবণ ঘাড নাড়লো।

—ওই সম্পর্কে তোমাকে গোটাকযেক প্রশ্ন কবতে চাই। এ বাড়িতে তুমি কতদিন কাজ করছো?

—ত্রিশ বছর হযে গেছে।

—খুব পুরানো লোক তুমি তাহলে। সৌমেনবাবুর ভাইপোর কথা তোমার মনে আছে?

—সে কথা কি ভুলতে পারি বাবু। ওবকম বিচ্ছু ছেলে আর হয না। কয়েক হাজাব টাকা নিয়ে সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।

—তারপর?

—খুব হইচই হল কয়েকদিন। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। ভাইপোকে মানুষ করবার চেষ্টা বাবু খুবই করেছিলেন, কিন্তু ভালো হওয়া কপালে না থাকলে যা হয় আর কি?

—সবই অদৃষ্টের ফের। বাসব বললো, পরে রণেনের আর কোন খবব পাওয়া যায়নি, না?

—না। এতদিন পরে শুনলাম, সে নাকি ফিরে আসছে। বাবু কয়েকদিন আগেই আমায় বলেছিলেন, তিনি চিঠি পেয়েছেন।

—ভালো কথা, রত্নাকব মানে যাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সে কতদিন এ বাড়িতে কাজ করছিল?

—দিন দশেকেব বেশী হবে না। দিদিমণি ওকে বেখেছিলেন।

—হুঁ। এখানে সে কোথায় থাকত? তোমাব সঙ্গে নাকি?

—আমার সঙ্গে! শ্যামাচবণ নিজের বিস্ময় ভাব দমন করে বলল, বাগানে যে চাকরদের কোয়ার্টার আছে তাতেই সে থাকত।

—আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো?

—আসুন।

শ্যামাচরণের পিছু পিছু বাসব ও শৈবাল বাগানের শেষ প্রান্তের একসারি এসবেশটাস্ শেড দেওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই ঘরটা।

দরজা খোলাই ছিল। ওরা তিনজন ঘরে প্রবেশ করলো। শ্যামাচরণ আলোটা জ্বেলে দিল। পাঁচ পাওয়ারের আলো বোধহয়। তারই হাল্কা আলোয় দেখা গেল ঘরখানা ছোট। একধারে একটা খাটিয়া পাতা। খাটিয়ার উপর মলিন বিছানা। টোল খাওয়া টিনের তোরঙ্গটা রয়েছে খাটিয়ার তলায়।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বিছানা উল্টে-পাল্টে দেখল। ছেড়া তোযকটার তলা থেকে পাওয়া গেল এক প্যাকেট উইলস্ সিগারেট আর দেশলাই। এবার তোরঙ্গটা খাটিয়ার তলা থেকে টেনে বার করল ডালা খোলাই ছিল। তোরঙ্গের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলি ধুতি আর সার্ট। একটা সোযান ফাউনটেন পেন্ আর টেলিফোন লেখা একটা ছোট্ট চিরকুট।

চিরকুটটা বাসব নিজের পকেটে বাখলো। তাবপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ঘরের সামনে একটা টানা বারান্দা। পর পর ঘরগুলো বারান্দা লাগোয়া। বারান্দার শেষের দিকে বাসবের দৃষ্টি আটকে গেল। বেশ বড় একটা মই দাঁড় করানো রয়েছে সেখানে। ও সেদিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মইটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে বাসবের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হল। সেখানে বাঁশের কিছুটা চাকলা উঠে গিয়ে চোঁচ বেরিয়ে রয়েছে। চোঁচে জড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো সোঁয়া ওঠা সুতো। বাসব সযত্নে সুতোগুলো খুলে নিয়ে, কাগজের অভাবে এক টাকার নোটে মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

—শ্যামাচরণ, বাড়িতে আরো মই আছে?

—আজ্ঞে না। ওই একখানাই মই।

—এবার আমাদের তোমার দিদিমণির কাছে নিয়ে চল।

—আজ্ঞে আসুন।

কয়েক পা এগোবার পর বাসব বলল, ওই যে তিনজন ভদ্রলোক তোমাদের এখানে আসা যাওয়া করেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পার?

শ্যামাচরণ একটু চুপ করে থেকে বলল আমি চাকর মানুষ আমার বলা ঠিক নয়। ওঁরা বাবুর সঙ্গে সব সময় গুজগুজ ফুসফুস করতেন, আমার ভালো লাগতো না। বাবু ওঁদের খুব ভালবাসতেন।

আর কোন কথা হল না। তিনজনে ক্রমে তন্দ্রার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার পর্দা সরিয়ে দিল শ্যামাচরণ। ঘরে প্রবেশ করল বাসব ও শৈবাল। সুসজ্জিত ঘর। তন্দ্রা জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল মুহ্যমানের মত। ওদের দেখে সে এগিয়ে এল।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনার মনেব শোচনীয় অবস্থা আমি অনুভব করছি মিস্ সিংহ, তবু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে এলাম।

ধরা গলায় তন্দ্রা বলল, আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। পুলিশের পক্ষ থেকে আপনার বিষয় আমাকে জানানো হয়েছে। সুদেববাবু বলছিলেন, আপনি আমার কাছেও আসবেন।

শৈবাল খুঁটিয়ে দেখছিল তন্দ্রাকে। অপূর্ব সুন্দরী না হলেও, মোটামুটি চেহারা ভালই। একহারা দেহের গঠন, গৌরাঙ্গী। একটানা কান্নাকাটি করার দরুন বোধহয় চোখের কোণ ভিজে রয়েছে। তন্দ্রার অনুরোধে ওরা সোফায় বসল।

বাসব গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, রত্নাকরকে আপনি অ্যাপয়েণ্ট করেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমাকে এসে ধরে পড়লো তাই রেখেছিলাম।

—ঠিক কি পজিসনে সে আপনাকে আবেদন জানিয়েছিল বলবেন একবার?

—বোধহয় দিন দশেক আগে সন্ধ্যার পর আমি আর দীপঙ্কর বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি। মোড়ের কাছটায়—

—এক মিনিট, বাসব বাধা দিল, যাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি কে?

তন্দ্রার মুখ আবিরের মত লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু নিজেকে সে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, দীপঙ্কর...মানে ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। আমরা বেড়িয়ে ফিরছিলাম, মোড়ের কাছটায় পৌঁছাতেই রত্নাকর আমাদের সামনে এসে করুণভাবে চাকরি প্রার্থনা করলো। আমার কেমন দয়া হল। তাছাড়া ওর ভদ্রগোছের চেহারা দেখে ওকে আসবাব ঝাড়া-মোছার কাজে বহাল করলাম।

—হুঁ। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বাবা অত্যন্ত সাদামাটা লোক ছিলেন। তাঁকে যে কেউ এইভাবে খুন করতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আপনার জ্যেঠতুতো দাদা ফিরে আসছেন।

—বাবার মুখে শুনেছিলাম। তিনি নাকি অনুতপ্ত হয়ে চিঠি দিয়েছেন।

—আপনার বাবার ইচ্ছে ছিল, রণেনবাবু ফিরে এলে সম্পত্তি তিনি দু'ভাগে ভাগ করে দেবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি। আপনি তাঁর একমাত্র ওয়ারিশন, তাই না?

—আমি এভাবে তাঁর একমাত্র ওয়ারিশন হতে চাই না মিঃ ব্যানার্জী। তন্দ্রার গলা থেকে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল, আমি কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

সমবেদনার সুরে বাসব বলল, আপনি অস্থির হবেন না মিস্ সিংহ। ভাগ্যের পরিহাসকে এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুর্ঘটনার আগের সন্ধ্যেবেলাকার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে? আপনার সেদিনকার কর্মসূচীটা জানতে পারলে ভালো হয়।

—কলেজ থেকে ফিরে এসে আমি বাড়িতেই ছিলাম। সাতটায় দীপঙ্কর এল। আমরা বাগানের মরনিং গ্লোরির কুঞ্জে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। দশটার সময়

বাবার সঙ্গে ডিনার শেষ করি। তারপর আধ ঘণ্টাটাক নানা বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।

—সে সময় মিঃ সিংহের সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল?

—খুবই হাল্কা ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল আমাদের। শুধু একবার তিনি বলেছিলেন, রণেনের চিঠি পড়েই বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে অনুতপ্ত। আমি তাকে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা করব।

—দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কি সূত্রে?

—দীপঙ্করের বাবা স্বর্গীয় সুপ্রকাশ রক্ষিত আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই।...

—ও। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। মিঃ বর্মন, ডাঃ দে ও মিঃ সরকার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

—ভালই। বাবা ওঁদের স্নেহ করতেন।

—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ওঁদের সম্বন্ধে আপনি বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন কিনা?

—বিশেষ কথা? একটু চিন্তা করে তন্দ্রা বলল, এইটুকু বলতে পারি, যে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে বাবা ওঁদের সাহায্য নিতেন, ওঁদের মতামতের উপর নির্ভর করতেন।

—ধন্যবাদ। আর আপনাকে বিরক্ত করব না। এখন আমরা চলি। পরে হয়ত আবার আপনার কাছে আসতে হবে।

বাসব তন্দ্রাকে কিছু বলবার অবকাশমাত্র না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবাল অনুসরণ করল ওকে। তন্দ্রার ঘরের সামনের বারান্দা শেষ হয়েছে সিঁড়ির মুখে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাসব বলল, আরেক বার বাগানে যেতে হবে।

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, আবার বাগান কেন?

—আবার মইটা পরীক্ষা করা দরকার।

দুজনে আবার চাকরদের কোয়ার্টারে এল।

মইটা মাটিতে শুইয়ে বাসব ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হল। একটা ধাপে খানিকটা মাটি আটকে রয়েছে। মাটিই তো! আধ শুকনো মাটি। বাসব সাবধানতার সঙ্গে মাটিটা ঝরিয়ে নিয়ে রুমালে মুড়ে পকেটস্থ করল।

—ও কি হে, যা পাচ্ছ পকেটে চালান দিচ্ছ দেখছি।

—কথায় আছে ডাক্তার, যাকে রাখ সেই থাকে। কে বলতে পারে, একদিন এই মাটির টুকরোই সমস্ত রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে প্রকৃত সত্যকে টেনে বার করবে না?

—তা বটে।

—চল, আজকের মত এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

বাড়ি ফিরেই বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শৈবাল আসেনি, হ্যাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রীটের মোড় থেকেই বিদায় নিয়েছে। রত্নাকরের তোরঙ্গ থেকে পাওয়া টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা বার করল বাসব। রিসিভার তুলে নিয়ে নাম্বার দেখে ডায়াল করল।

ও প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল. সেণ্ট্রাল কর্ণার থেকে কথা বলছি...

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখলো। ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ফোন নাম্বারটা কোথাকার তা জেনে নেবার জন্যই ও এই পথ অবলম্বন করেছিল। সেণ্ট্রাল কর্ণার—বোধহয় কোন হোটেল বা বোর্ডি ; হাউস হবে। টেলিফোন গাইড থেকে সেণ্ট্রাল কর্ণারের সন্ধান পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। বাসবের অনুমানই ঠিক। মর্ট লেনের একটা বোর্ডিং হাউসই বটে।

বাসব বাহাদুরকে ডেকে এককাপ কফি আনতে বলল। বেশ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে কিন্তু এখন বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। কফির পেয়ালা শেষ করেই লেবরেটারীতে গিয়ে ঢুকতে হবে। ও কফির অপেক্ষায় কোচে গিয়ে বসল।

ঠিক এই সময় সুকুমার দেব ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে মিঃ ব্যানার্জী। রত্নাকরের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি রকম! বাসব বিস্মিত গলায় বলল, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না মানে। তাকে তো আপনারা অ্যারেষ্ট করেছিলেন। জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে নাকি?

—জেল ভেঙ্গে পালালে বরং ভাল ছিল। আমার কোন দায়িত্ব থাকত না।

—কি হয়েছে আমায় খুলে বলুন।

—সেদিন পোষ্টমর্টমে মৃতদেহ পাঠাবার পর অফিসে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডি. সি. আমায় ডেকে পাঠালেন। গেলাম তাঁর কাছে। তিনি মার্ডার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিয়ে বললেন, মিঃ সিংহ আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর আশু মীমাংসা চাই। আপনি কি ভাবে এগুচ্ছেন। আমি নিজের কাজের প্রসিডিওরটা বললাম।

তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, তার চেয়ে এককাজ করুন, রত্নাকরকে ছেড়ে দিন। তারপর ওর ওপর ওয়াচ রাখুন। দেখুন, ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে। আমার মনে হয়, এতে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

রত্নাকরকে ছেড়ে দেওয়া হল। টোয়েণ্টিফোর আওয়ার্স ওর ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য দু'জন লোক নিযুক্ত করলাম। কিন্তু আজ বিকেলে রত্নাকর আমার লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে।

সুকুমার দেব থামতেই বাসব বলল, আমি আপনাকে ঠিক ফলো করতে পারলাম না। রত্নাকরকে তো ছেড়ে দেওয়া হল, তারপর সে কি করল?

—তাকে ছেড়ে দিতে সে পাবলিক ফোন থেকে ফোন করে। তারপর আশ্রয় নেয় বেলেঘাটার বস্তিতে। সেখানকার একটা ঘরে দু'দিন কাটিয়ে দেবার পর আজ বিকেলে শিয়ালদায় আসে। সর্বক্ষণ আমার লোক ওর পিছনে ছিল। কিন্তু শিয়ালদায় আর ওকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়নি। ভীড়ের মধ্যে এক সময় গা ঢাকা দেয়। এখন কল্পনা করুন আমার অবস্থা—ডি. সি.-কে কি উত্তর দেব।

—আচ্ছা, পাবলিক টেলিফোন থেকে কোথায় সে ফোন করেছিল, খোঁজ নিয়েছেন?

—সেও বিচিত্র ব্যাপার। ফোন করেছিল আমার স্ত্রীকে।

—কি রকম?

—আমার স্ত্রীকে সে ফোন করে বলেছিল, আপনাব স্বামী এলে বলে দেবেন আমাকে তিনি যতটা বোকা মনে করেছেন, আমি ঠিক ততটা নই। আমি জানি, আমার পিছনে লোক ফেউ এর মত লেগে রয়েছে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, রত্নাকরের রসজ্ঞান আছে বলতে হবে। যাই হোক, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার দৃঢ় ধারণা ওকে আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব।

পরের দিন বেলা আটটার সময় শৈবাল এল বাসবের এখানে। বাসব তখন বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাকে দেখেই বলল, মর্ট লেন কোথায় জান?

—থার্টিন এরিয়া। খুব সরু গলি।

—চল, সেই সরু গলির শোভা দেখে আসি।

ওরা বেরিয়ে পড়ল।

মর্ট লেনের মুখেই সেণ্ট্রাল কর্নার। আধুনিক প্যাটার্নের একটি বাড়ি। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে এনকোয়ারী লেখা কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কাউণ্টাব ক্লার্ক তাকাতেই বাসব নিজের পরিচয় দিযে প্রশ্ন করল, সম্প্রতি নতুন কোন বোর্ডাব এখানে এসেছে?

—সর্বদাই নতুনদের আনাগোনা এই বোর্ডিং হাউসে। আপনি কাব কথা জানতে চান বলুন?

—ধরুন, এমন কেউ সম্প্রতি এখানে এসেছেন কি, যিনি ঘর ভাডা নিয়েছেন অথচ থাকছেন না।

একটু চিন্তা করে ক্লার্ক বলল, বত্নাকর রায় নামে এক ভদ্রলোক ঘব ভাড়া নিয়ে দিন দু'য়েক বোধহয় থেকে ঘর বন্ধ করে রেখে গেছেন বটে।

—তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন বলতে পারেন?

লেজাব ঘেঁটে কাউণ্টার ক্লার্ক বলল, উত্তরপাড়া থেকে। আগাম টাকা দিয়ে একমাসের জন্য ভাড়া নিয়েছেন।

—এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। ভাল কথা, আমি যে এনকোয়ারী করতে এসেছিলাম, একথা কোন বোর্ডারকে বলবেন না।

সেণ্ট্রাল কর্নার থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে এল হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে। বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন।

বাসব তাঁকে দেখে বলল, আপনিই বোধহয় দীপঙ্করবাবু। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত।

দীপঙ্কর বললেন, মাত্র মিনিট পাঁচেক এসেছি। আপনার ফোন পেয়ে কাল রাত্রেই আসতাম। কিন্তু বিশেষ একটা কাজে জড়িয়ে পড়ায়—

—তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। আপনাকে কেন ডেকেছি বুঝতেই পারছেন। মিঃ সিংহ সংশ্লিষ্ট গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।

—বেশ তো। আপনাকে আমি যে কোন ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত মিঃ ব্যানার্জী। শৈবাল ভাল করে দেখলো দীপঙ্গর রক্ষিতকে। লম্বায় ফুট ছয়েকের কাছাকাছি হবেন

ভদ্রলোক। দোহারা চেহারা, মাজা মাজা গায়ের রঙ। চমৎকার শ্রী আছে মুখের। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যেই।

বাসব পাইপ ধরাল।

—সিগারেট খাই না, কাজেই অফার করতে পারলাম না।

—আমারও সিগারেটেব নেশা নেই।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, সৌমেন সিংহের সঙ্গে ডাঃ দে, মিঃ সরকার ও মিঃ বর্মনের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

—এ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনেছি প্রত্যেকটি বৈষয়িক ব্যাপারে উনি ওঁদের সাহায্য নিতেন।

—ওদের তিনজনের সঙ্গে মিঃ সিংহের কি ভাবে আলাপ হয়েছিল? বিশেষত বয়সের যখন এত পার্থক্য ছিল, তখন এই ঘনিষ্ঠতা একটু আশ্চর্যের নয় কি?

—আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন, মিঃ সিংহ বেশ খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন? এঁদের তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই মনে করি। আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল লায়ন্স ক্লাবে।

—আপনার কি মনে হয়, তিনজনই বেশ উচ্চমানের লোক?

—দেখুন, দুজন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে একজনের বিষয় কিছু বলা যায়। আমি সুদেববাবুর কথা বলছি। উনি যে বিশেষ এক অভিসন্ধি নিয়ে ও বাড়িতে যাওয়া আসা করেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—অভিসন্ধিটা কি বলতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?

দীপঙ্কর বললেন, মিঃ বর্মন তন্দ্রাকে বিয়ে করতে চান। আমার মনে হয়, এ ব্যাপাবে তিনি মিঃ সিংহকে কনভিন্স করবার চেষ্টা করছিলেন।

—কিন্তু আপনি যেন বললেন, তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে.....

-আপনি ঠিকই শুনেছেন, তন্দ্রার সঙ্গে আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে রয়েছে।

বাসব পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বলল, রত্নাকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে শুনেছেন?

—একথা শোনার পর আমি অবাক হয়ে গেছি। কারণ তাকে দেখে আমার ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিল।

—প্রথম দর্শনে যারা ভালো, অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত ভাল থাকেন না। আচ্ছা, আপনি রণেনবাবুকে চিনতেন?

—সিংহ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। স্কুলে আমি ও রণেন একই সঙ্গে পড়তাম। অত্যন্ত দুরন্ত ও উদ্ধত স্বভাবের ছিল সে।

—ধন্যবাদ দীপঙ্করবাবু। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। এখনকার মত প্রশ্ন আমার শেষ হয়েছে।

দীপঙ্কর রক্ষিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তন্দ্রার মনের অবস্থা কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠেছে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এখন যদি হত্যাকারী ধরা পড়ে তাহলে অন্ততঃ সে কিছুটা শান্ত হবে।

—আমি সে চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

দীপঙ্কর রক্ষিত বিদায় নিলেন।

বাসব কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়ার জাল বুনতে লাগল।

শৈবাল বলল, আমার ওই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের ব্যাপার স্যাপার খুব ভালো বোধ হচ্ছে না।

—কেন? এই মাত্র রক্ষিত তো ডাঃ দে ও ডাঃ সরকারের সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করলেন না।

—কিন্তু মিঃ বর্মন যে তন্দ্রা দেবীকে বিয়ে করতে চান তাকি ভুলে গেলে?

জোরে হেসে উঠল বাসব।

—দেখ ডাক্তার, আয়েষা যেখানে আছে, জগৎ সিংহ ও ওসমান সেখানেই থাকবে। ও বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। এখন তোমাকে আমার দু'চারটে আবিষ্কারের কথা বলি।

শৈবাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—কাল সৌমেন সিংহের বাগান থেকে তিনটে জিনিস পেয়েছি। একটি বোতাম, সোঁয়া ওঠা কয়েকটা সুতো আর খানিকটা মাটি। আমি পরীক্ষা করেছি সেগুলো। বোতামটা ওভার কোটের বলেই মনে হয়। সোঁয়া ওঠা সুতোগুলো পঙ্গাস জাতীয়।

—আর মাটিটা?

—মাটির ঢেলাটাকে তুমি সার্চ লাইট বলতে পার ডাক্তার। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে মাটির ঢেলার মধ্য থেকে আমি পেয়েছি সুরকি, বালির গুঁড়ো আর কয়লার ডাস্ট। এখন শীতকাল চলছে। দু'মাসের উপর হল বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায়নি। কাজেই কারুর জুতোর তলায় কাদা আটকে থাকবার কথা নয়। তোমাকে বলা হয়নি, ঐ কাদার টুকরোটা যে হত্যাকারীর জুতোর শোলে আটকে ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এখন তোমাকেই প্রশ্ন করি, এই ড্রাই সিজিনে হত্যাকারীর জুতোর তলায় কাদার টুকরো কি ভাবে এসেছিল?

শৈবাল একটু চিন্তা করে বলল, হত্যাকারী বোধহয় কাদা জমি পার হয়ে মিঃ সিংহর বাগানে ঢুকেছিল।

—ঠিক তাই। কিন্তু সিংহর বাড়ি অভিজাত পাড়ায়। আমরা তাঁর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও কাদার চিহ্নমাত্র দেখিনি। ধরে নিতে হবে, হত্যাকারীর বাড়ির কাছাকাছি এমন জায়গায় খানিকটা কাদা জমি আছে, যা তার পক্ষে মাড়িয়ে না আসা অসম্ভব।

—তোমার কথা মেনে নিলে একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, হত্যাকারী তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাদা মাড়িয়ে মিঃ সিংহের বাড়ি এল, অথচ শুকনো রাস্তায় পা দেবার পরও তার জুতো থেকে কাদা ঝরে গেল না।

—তুমি কি মনে কর, এই কথার উত্তর আমার কাছে নেই? আছে ডাক্তার। হত্যাকারী পায়ে হেঁটে নিশ্চয় মিঃ সিংহের বাড়িতে আসেনি। সে মোটর কার ব্যবহার করেছিল।

—শেষ পর্যন্ত তাহলে কি দাঁড়ালো? বোতাম, মাটির ঢেলা ও সোঁয়া ওটা সুতোকে যোগ করে তুমি কি রকম স্ট্রাকচার খাড়া করছো শুনি?

বাসব বলল, প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সিতে চড়ে হত্যাকারী মিঃ সিংহর বাড়ির বাইরে এসে নামে। তারপর পাঁচিল টপকে বাগানে প্রবেশ করে সিঁড়িটা সংগ্রহ করে নেয়। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে হত্যাকারী সিংহ পরিবারের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। সে সিঁড়ি ষ্টাডির দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে, উঠে গিয়ে মিঃ সিংহকে গুলি করে। এই ঠাণ্ডায় সে নিশ্চয় কোট বা ওভার কোট পরে এসেছিল। কোট পরে মই বেয়ে ওপরে ওঠা অসুবিধাকর বিবেচনা করে সে কোট খুলে ফেলে। সেই সময় একটা বোতাম বোধহয় খসে পড়েছিল। মই বেয়ে উপরে উঠবার সময় জুতোর শোল থেকে কাদা মইয়ের ধাপে আটকে যায়, আর পায়ের ঘসড়ানি লেগে চোঁচ বার করা অংশে সোয়েটারের উলের কিছু অংশ আটকে যায়। আমার থিওরি হল এই।

—রত্নাকর সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবে দেখেছো?

বাসব আর কিছু বলল না। পাইপে নতুন করে মিক্সচার ভরে, অগ্নি সংযোগ করে ঘন ঘন টান দিতে দিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছে তন্দ্রা। ওর কিছু ভালো লাগছে না। বাবার মৃত্যুর পর নিজেকে কোনমতেই আর সহজ করে নিতে পারছে না। খুব ছোট বেলায় মাতৃহীন তন্দ্রা বাবাকেই দেখে এসেছে নিজের পাশেপাশে। সেই তিনি এই ভাবে চলে গেলেন!

শ্যামাচরণ ঘরে এল। তন্দ্রার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। শ্যামাচরণ বলল, সুদেববাবু এসেছেন। তাঁকে ড্রইং রুমে বসাতে বলে তন্দ্রা বিছানা থেকে উঠে পড়লো। ও নিজের অবিন্যস্ত শাড়ী ঠিক করে নিয়ে ড্রইং রুমে এল।

সুদেব বলল, আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম মিস্ সিংহ। কিছু মনে করবেন না।

তন্দ্রা কোচে বসতে বসতে বলল, না, না, বিরক্ত আর কি! কিছু বলবেন আমায়?

—আজ রণেনবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। সেই বিষয়েই—

—রণেনদার চিঠি এসেছে!

—হ্যাঁ। তিনি আমায় লিখেছেন, বিশেষ কাজে আটকে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে আসতে পারেননি। ওখানকার সমস্ত কাজ মিটিয়ে দিন দশেকের মধ্যে আসছেন।

—কিন্তু! তন্দ্রা বলল, তিনি আপনাকে চিনলেন কি ভাবে?

—ভগবান জানেন। কোথা থেকে যে তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ করলেন তাও বলতে পারছি না।

—চিঠিটা সঙ্গে এনেছেন? আমি দেখতে পারি?

—নিশ্চয়।

সুদেব নিজের পকেট থেকে একটা খাম বার করে তন্দ্রার হাতে দিল। তন্দ্রা চিঠি খানা বার করল খামের মধ্যে থেকে।

মান্যবর সুদেববাবু,

আমার পরিচয় কাকার কাছে পেয়ে থাকবেন। কয়েকদিন আগে আমার কলকাতা

যাবার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হল না। এখানকার কাজ মিটিয়ে দিন দ'শেকের মধ্যে যাচ্ছি।

খবরের কাগজে কাকার মৃত্যু সংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হলাম। তন্দ্রাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই। খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো ও। হাজার হলেও আমি ওর বড় ভাই। কর্তব্যের খাতিরেই বলছি, তন্দ্রাকে দেখবেন। ওর সম্বন্ধে আপনার ওপর নিশ্চয় নির্ভর করা যায়। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

রণেন সিংহ।

তন্দ্রা চিঠি পড়ে ফিরিয়ে দিল। কারুব মুখে কিছুক্ষণ কথা নেই। শেষে সুদেবই নীরবতা ভঙ্গ করলো, আমি তাহলে উঠি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিল তন্দ্রা। ওখান থেকে বেরিয়ে সুদেব নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল।

রিপন স্ট্রীটের এক বিরাট ম্যানসানের টু-রুম ফ্ল্যাটে ও থাকে। বলা বাহুল্য এখানে ধনীদেরই বসবাস। উপরে উঠে সুদেবকে অবাক হতে হল, কারণ তাব ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে ডাঃ দে ও মিঃ সরকারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত তাঁদের কাছে গিয়ে সুদেব বলল, কতক্ষণ এসেছেন?

ডাঃ দে বললেন, এইমাত্র।

দু'জনের মুখ বেশ গম্ভীর। সুদেব তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ওদের ভেতরে প্রবেশ করতে অনুরোধ করল। ঘরের মধ্যে এসে ডাঃ দে ও মিঃ সরকার বসলেন।

সুদেব বলল, আপনাদের মুখেব ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু বলতে এসেছেন যেন?

মিঃ সরকার বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক। আমরা দু'জন আজ সকালে মিঃ সিংহর এটর্নি সত্যেন করগুপ্তর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম—

—ও, এই কথা। আপনারা ঠিক শুনেছেন। শেষ পর্যন্ত মত পালটেছিলেন মিঃ সিংহ। আমরা তিনজন সেদিন ওখান থেকে আসার পর, তিনি আবার আমাকে ফোন করে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি, করগুপ্ত সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

ডাঃ দে বিদ্রূপ মাখান গলায় বললেন. আপনি বোধহয় মিঃ সিংহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত বণেনবাবুর নামে ট্রান্সফার করতে।

সুদেব বলল, আমি তাঁকে এরকম পরামর্শ দিতে যাব কেন? আমি কোন কথাই বলিনি। করগুপ্তর সাহায্যে তিনি তক্ষুনি খসড়া করলেন উইলের। সমস্ত সম্পত্তি দান করা হল রণেনবাবুকে। আমিও এটর্নি সাক্ষী হিসেবে সই করলাম।

মিঃ সরকার বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, এখন পাল্টাবেন না। তাছাড়া উইল পাল্টালে সম্পত্তি অর্ধেক দেওয়া হবে তন্দ্রা দেবীকে আর অর্ধেক দেওয়া হবে রণেনবাবুকে। অথচ—

—তিনি যে খেয়ালী লোক ছিলেন তা নিশ্চয় আপনারা অস্বীকার করবেন না। তাঁর কোন কাজে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

মিঃ সরকার আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দরজার সামনে বাসবকে দেখতে পেয়ে আর কিছু বললেন না। শৈবালও সঙ্গে রয়েছে। কেউই ওদের আগমন আশা করেন নি।

বাসব ঘরে প্রবেশ করে বলল, আপনাদের বিশ্রাম ও আলাপে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত।

সুদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি অনর্থক কুণ্ঠিত হচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জী। আমরা কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম না। বসুন আপনি, শৈবালবাবু বসুন।

ওরা বসল।

—এবার বলুন, কি প্রয়োজনে এসেছেন?

—কিছুক্ষণ আগে পুলিশের সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, মিঃ সিংহ শেষ পর্যন্ত নতুন উইল করেছিলেন এবং আপনি সেই উইলের অন্যতম সাক্ষী।

ডাঃ দে ও মিঃ সরকারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

—হ্যাঁ।

—এ সম্বন্ধে পুলিশকে বা আমাকে কিছু আপনি বলেননি?

—আপনারা যে প্রশ্ন করেছিলেন আমি তার জবাব দিয়েছি। খুনের কেসে উপযাচক হয়ে কিছু বলা আমি বিবেচনার কাজ বলে মনে করি না।

—এখন নিশ্চয় বলতে আপত্তি নেই?

ডাঃ দে ও মিঃ সরকারকে সুদেব যা বলেছিল সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলো সে।

বাসব বলল, শুধু তিনি আপনাকে কেন ডাকলেন দ্বিতীয়বার?

—বলতে পারব না। এটাও তার একটা খেয়াল হতে পারে।

—হুঁ। আপনি ও মিঃ করগুপ্ত যখন বাড়ি থেকে চলে আসেন তখন রাত ক'টা হবে?

—প্রায় দশটা।

—বাড়িতে ঢোকার সময় বা বেড়িয়ে আসবার সময় কাউকে দেখেছিলেন?

—কাউকে? সুদেব একটু ভেবে বলল, আমরা যখন ওখান থেকে বেড়িয়ে আসার মুখে পোর্টিকোর কাছে এসেছি, তখন যেন একজনকে গেট পেবিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

—চিনতে পেরেছিলেন?

—না জায়গাটা অন্ধকার ছিল।

—উঠি এবার। আরেক জায়গায় যেতে হবে। ভাল কথা, এখানে আসার পথে তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর মুখে শুনলাম, আপনি রণেনবাবুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—চিঠিখানা একদিনের জন্য আমায় দেবেন?

—কেন দেব না?

সুদেব চিঠিখানা পকেট থেকে বার করে বাসবকে দিল।

—চলি তাহলে। এস ডাক্তার।

পুরো একটা দিন কেটে গেছে এরপর।

তন্দ্রার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এইমাত্র ফিরে এলেন দীপঙ্কর রক্ষিত। তাঁর মেজাজ বিশেষ ভাল নেই। তিনি শ্যামাচরণের মুখে শুনেছেন, সুদেব ও বাড়িতে ঘনঘন আসা যাওয়া শুরু করেছে। তন্দ্রাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট কয়েক বিশ্রাম করে দীপঙ্কর খাওয়ার ঘরে গেলেন। সংসারে তিনি একা মানুষ। চাকর দয়ারাম সবদিক সামলে চলে। নিজের বলতে একমাত্র পিসিমা আছেন। তিনি থাকেন বেনারসে। ওখান থেকে প্রায়ই চিঠি লিখছেন ভাইপোকে বিয়ের জন্য। এই ফাল্গুনেই তো বিয়েটা হয়ে যেত। মিঃ সিংহ মারা গিয়ে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল।

রাত্রের আহার শেষ করে তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। খাতাপত্র টেনে নিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে। বাড়ির সামনের অংশ ভাড়া দেবার জন্য যে ফ্ল্যাট তৈরি করাচ্ছেন, তারই হিসাবের উপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। ঘণ্টা দেড়েক কাজ করবার পর উঠে পড়লেন। এবার শুয়ে পড়লেই হয়। আলো নিভিয়ে নরম বিছানার মধ্যে আশ্রয় নিলেন দীপঙ্কর রক্ষিত।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। বেড সাইড ল্যাম্পের আলোয় ঘরের অন্ধকার কিছুটা তরল হল। প্রথমে কিছুটা ঠাহর করতে পারেননি দীপঙ্কর। হাত দিয়ে চোখ রগড়ে এধার ওধার তাকাতেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো খাটের ঠিক সামনে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তির উপর।

অসংলগ্ন গলায় দীপঙ্কর বললেন, কে, কে ওখানে?

গম্ভীর গলায় উত্তর এল, তোমার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে এলাম।

—কে তুমি?

—চিনতে পারছো না?

—দীপঙ্কর বিছানা থেকে নামতে গেলেন, বাধা দিল আগন্তুক।

—যে ভাবে আছো, সেই ভাবেই থাক। বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বেলে আমার মুখ দেখার কোন স্বার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

—কি চাও তুমি?

শীতের রাত্রেও দরদর করে ঘামতে লাগলেন দীপঙ্কর। আগন্তুক অনুচ্চ গলায় হেসে বলল, সাদা কথায় তোমার প্রাণটা নিতে পারলেই আমি খুশী হই।

—দীপঙ্কর বলল, আমার প্রাণ নেবে?

—ঘুমন্ত অবস্থায় আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। তা যে করিনি দেখতেই পাচ্ছ।

—কিন্তু আমাব অপরাধ কি?

—অবুঝ হবার চেষ্টা করোনা। আমি কি বলতে চাইছি, তুমি যে না বুঝতে পারছো তা নয়। তোমাকে আর সুযোগ দেব না।

চাপা আলোকে আগন্তুকেব ছোবা ঝলসে উঠল।

—না—না—না—

বাহাদুরের আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে গেল বাসবের।

ও বিছানায় উঠে বসতেই বাহাদুব বলল, পুলিশ সাহেব এসেছেন।

—পুলিশ সাহেব' এত বাত্রে' বাসব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে গরম ড্রেসিং গাউন গায়ে গলিয়ে নিয়ে ড্রইংরুমে এল। সুকুমার দেব বসেছিলেন চিন্তিত মুখে।

ওকে দেখেই ইন্সপেক্টার বললেন, আবার এক ঝামেলা বেধেছে। দীপঙ্করবাবুর শোবার ঘরে ঢুকে তাঁকে কেউ গুরুতরভাবে আহত কবে গেছে।

—বলেন কি! কখন ঘটেছে ঘটনা?

—কখন ঘটেছে বলতে পারব না। তবে কিছুক্ষণ হল খবর পেয়েছি জোড়াবাগান থেকে। দীপঙ্কববাবুর বাড়ি ওই অঞ্চলে।

—পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরাল হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

—আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। আপনি যাবেন নাকি?

—নিশ্চয়। আমায় মিনিট পাঁচেক সময় দিন, কাপড বদলে আসছি।

সুকুমাব দেব ও বাসব যখন দীপঙ্করবাবুব বাড়ি পৌঁছাল তখন ভোব হযে এসেছে' গৃহকর্তা মুমূর্ষুভাবে শুয়েছিলেন খাটে। বাঁ হাতে আগাগোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্সপেক্টারের প্রশ্নে ঘটনাটা বললেন দীপঙ্করবাবু। মৃত্যু তাঁকে প্রায় ছুঁয়ে গেছে। ছোরা আমূল বসে যেত তাঁর বুকে—ঠিক সেই সময দযারাম দবজার গোড়ায এসে পড়ায আগন্তুক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

বাসব বলল, আপনি কি আন্দাজ করতে পেরেছেন, লোকটা কে?

—আমি তাকে চিনতে পাবিনি। অথচ সে আমার সঙ্গে পবিচিত ভঙ্গীতে কথা বলেছে।

সুকুমার দেব বললেন, সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন, নইলে আপনাকে পোষ্টমর্টমের টেবিলে থাকতে হত এখন।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় দয়ারামকে জেরা করছিলেন জোড়াবাগান থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টাব।

—মাঝরাতে তুমি দীপঙ্করবাবুর ঘরে গেলে কেন?

—আজ্ঞে বুড়ো হয়েছি। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। জেগে ছিলাম। হঠাৎ বাবুর ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম।

এত রাত্রে কে এসেছে দেখবার জন্য তাঁর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, একটা লোক বাবুকে চেপে ধরে ছোরা মারতে যাচ্ছে।

—তোমাকে দেখেই বোধহয় সে পালাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর আমি ডাক্তার ও পুলিশকে ফোন করলাম।

বাসব দয়ারামের কথা মন দিয়ে শুনলো।

ওরা যখন দীপঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন বেলা আটটা। বাসব প্রস্তাব করলো চা-পর্বটা ওর এখানেই সেরে যেতে। ইন্সপেক্টরের আপত্তি নেই। হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটে এলেন দু'জন। ড্রইংরুমে শৈবালকে খবর কাগজ পাঠবত অবস্থায় দেখা গেল। তাকে ঘটনাটি বলল বাসব। তারপর বাহাদুরকে ডেকে চা আনতে আদেশ করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চা এসে গেল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুকুমার দেব বললেন, এই ঘটনার সঙ্গে মিঃ সিংহের হত্যাকাণ্ডের কোন সংযোগ আছে বলে মনে করেন?

—আপাতদৃষ্টিতে কোন রকম সংযোগ দেখা যাচ্ছে না বটে, তবে আমার দৃঢ় ধারণা নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে। মিঃ সিংহ মারা গেছেন ১০ই জানুয়ারি, না?

—হ্যাঁ।

—আপনি ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তো, ওই তারিখে রাত দশটার পর তারা কাউকে মিঃ সিংহের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে কিনা।

—বেশ, খোঁজ নেব।

—যদি কোন ট্যাক্সিওয়ালা বলে, সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, তাহলে তার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করবেন, যাত্রীর দেহের বর্ণনা।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সুকুমার বিদায় নিলেন।

শৈবাল বলল, কি রকম বুঝছো?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, অনেক এগিয়েছি। আমার সাম্প্রতিক একটা আবিষ্কারের কথা তোমাকে বলি।

—তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সিংহ পরিবারের জনৈক অজ্ঞাতনামা বন্ধু আমাকে চিঠি লিখে কেসটা হাতে নিতে অনুরোধ করেছিল।

—মনে আছে বৈকি।

—সেই বন্ধুটি কে জান? সৌমেন সিংহের ভাইপো রণেনবাবু।

—সেকি! তিনি তো মাদ্রাজে।

—ওই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে।

—তুমি বলতে চাও, তিনি কলকাতায় ছিলেন?

হ্যাঁ এবং এখনও আছেন।

—বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু তুমি কিভাবে বুঝলে, রণেনবাবুই তোমাকে তদন্ত ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন?

—রণেনবাবুর লেখা চিঠিখানা সুদেববাবুর কাছ থেকে পেয়েই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। খামের কথা বাদ দাও। ওই চিঠির গায়ে কার কার হাতের ছাপ থাকা স্বাভাবিক? প্রথম, পত্র লেখকের, দ্বিতীয় যারা চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়েছে

তাদের। কাজেই চিঠিটা থেকে তিনটে হাতের ছাপ পাওয়া গেল, রণেনবাবুর, তন্দ্রাদেবী ও সুদেববাবুর। এদিকে আমার কাছে অজ্ঞাত পরিচয়ে যে চিঠিখানা এসেছিল, তার থেকে একটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। বলা বাহুল্য এটা পত্রলেখকের। আমি মিলিয়ে দেখেছি, পত্রলেখকের হাতের ছাপের সঙ্গে রণেনবাবুর হাতের ছাপ মিলে গেছে।

—এযে ভীষণ ক্রমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তারপর?

—এরপর? এরপর আজ রাত্রে আমাদের ঘুমের দফারফা।

—অর্থাৎ?

—আজ রাত্রে আমাদের অভিসারে বেরুতে হবে ডাক্তার।

—অভিসারে! কোথায়?

—নিশ্চয় কোন উচ্ছ্বল যুবতীর নিভৃত আবাসে নয়। বারোটার পর আমাদের যাত্রা শুরু হবে। তোমার প্রস্তুতি প্রার্থনীয়।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, তথাস্তু।

শীতের রাতে কলকাতার একটা বিচিত্র রূপ আছে। তিমি মাছের পিঠের মত কালো অ্যাসফাল্টে মোড়া রাস্তাগুলো খাঁ খাঁ করছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। ঘুমেব কোলে এলিয়ে আছে মহানগরী। গ্রেটকোটের কলার যতদূর সম্ভব তুলে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফুটপাত ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে বাসব আর শৈবাল। এক সময় ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পডল। সামনেই একটা তেতলা বাড়ি। বাসব দরজায় কবাঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। ওরা ভেতরে প্রবেশ করলে যে খুলে দিয়েছিল, সে দরজা বন্ধ করল।

—ফিরেছে?

—ঘণ্টাখানেক হল ফিবেছে।

—আমাদের ঘরখানা দেখিয়ে দিন।

—আসুন।

লোকটা অগ্রসর হল। ওরা ওকে অনুসরণ করে দোতালায় এল। তৃতীয় ঘরখানায় করাঘাত করতেই সাড়া পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

—দরজাটা একটু খুলুন। আমি ম্যানেজাব।

—এতরাত্রে বিরক্ত করছেন কেন?

—বিশেষ প্রয়োজন আছে। একবার দরজা খুলুন।

একটু অপেক্ষা করার পর দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসব ঘরে প্রবেশ করলো। শৈবালও।

দরজার পাশেই একজন দাঁড়িয়ে ছিল।

—একি! কে আপনারা?

বাসব হাল্‌কা গলায় বলল, বড় আলোটা জালুন। আমাদের চিনতে আপনার কষ্ট হবে না।

কথাটা শেষ করে বাসব নিজেই এগিয়ে গেল। পকেট থেকে টর্চ বার করে সুইচ খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালল।

ভদ্রলোককে দেখে শৈবালের চেনা চেনা মনে হতে লাগল।

বাসব বলল, ভদ্রলোককে খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে তাই না ড্যাক্তার? এঁর ছবি ইন্সপেক্টার সুকুমার দেবের কাছে দেখেছো। ইনি রণেন সিংহ, ওরফে পলাতক রত্নাকর।

রণেন এবার কথা বলল, এতরাত্রে আপনারা হঠাৎ আমার ঘরে কেন এলেন বুঝতে পারছি না?

—দিনের বেলা যখন আপনার দর্শন পাওয়া গেল না, তখন এই সময়টা বেছে নিতে হল। আপনার ব্যাপার-স্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। এই তদন্ত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে অসহযোগিতা করছেন?

—আমি...মানে...আমতা আমতা করতে লাগল রণেন।

—শুনুন মিঃ সিংহ, আমার জানা নেই, কি পরিকল্পনায় আপনি এত কাণ্ড-কারখানা করেছেন। যাই-হোক, পুলিশের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান তবে এখনও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

রণেন নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু গলায় বলল, বসুন আপনারা। আমি আন্তরিক ভাবে চাই কাকার হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

—বেশ। তাহলে আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আপনি ওদের বাড়িতে চাকর হয়ে প্রবেশ করেছিলেন কেন?

—আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন। অল্প বয়সে যে দুর্দান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছি, কাকা এখনও আমার ওপর বিরূপ মনোভাব নিয়ে আছেন কিনা জানবার জন্যই ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিলাম।

—তারপর?

—কয়েকদিন ওখানে থাকার পর এবং আগেকার ব্যবস্থা মত আমার চিঠিটা ওঁর হাতে পড়ার পর, নানা রকম আলাপ আলোচনা আমার কানে আসায় বুঝতে পারলাম, কাকা আমার উপর বিরূপ নেই।

—তখন আপনার উচিৎ ছিল, কাকাকে নিজের পরিচয় দেওয়া।

—তাই তো দিলাম।

—অর্থাৎ?

—সরাসরি কাকার কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। খুন হওয়ার আগের সন্ধ্যার কথা। মিঃ বর্মন ইত্যাদিরা বিদায় নিয়েছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়ালাম। কাকা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি চাই? আমি তাকে প্রণাম করে বললাম, কাকা, আমায় চিনতে পারছেন না? তিনি প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বললেন, কে, রণেন! তুমি! তুমি এইভাবে—। ছদ্মবেশে এ বাড়িতে আমার আসার কারণ বর্ণনা করবার পর বললাম, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আপনাকে ঠকাচ্ছি না। ছোটবেলায়

আমাব ডান হাতে যে গভীর ক্ষত হযেছিল. তার চিহ্নও রয়েছে। তারপর অনেক সুখ দুঃখেব কথা হল আমাদের দু'জনের। কাকা বললেন, এখন আর তোমার আসল পরিচয় কাউকে দেবার নেই। তুমি এখন যাও। আমি এটর্ণি কবগুপ্তকে ডেকে পাঠাই। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

—সে সময় তন্দ্রাদেবী কোথায় ছিলেন?

—বলতে পারবো না।

—এতদিন ধরে মাদ্রাজে আপনি কি করছিলেন?

—নারকেলেব ব্যবসা। এখনও আমার সেখানে ব্যবসা আছে।

—আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে।

—কি করতে হবে বলুন?

—প্রথম, আপনাকে কাল সকালে নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তন্দ্রাদেবীকে ফোন করে আপনার সম্বন্ধে বলে রাখব। দ্বিতীয়, আমি আপনাকে যা বলব তা অক্ষরে অক্ষরে শুনে যেতে হবে।

—বেশ।

ওরা যখন সেণ্ট্রাল কর্ণার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল তখন রাত আড়াইটা। বাসবের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। শৈবালের মনে হল চিন্তার সমুদ্রে ও ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর বাসব বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার মাথায় বোধহয় চিকিৎসা করানো বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডাক্তার।

—কেন?

—একটা সহজ বিষয় আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—বিষয়টা কি?

—আরো নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলতে চাই না। চল, শেষ রাত্রিটা সার্থক করে তুলি।

—আবাব কোথাও যাবে নাকি?

—হ্যাঁ। আরেক জায়গায় হানা দিতে হবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় রণেনের আহ্বানে বাসব ও শৈবাল সৌমেন সিংহের বাড়িতে এল। ড্রইংরুমে ঢুকেই ওরা দেখল, সুদেব, ডাঃ দে, মিঃ সরকার ও দীপঙ্করবাবু উপস্থিত রয়েছেন, তন্দ্রা ও রণেন তো আছেই।

রণেন সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা প্রায় সকলেই আমাদের পারিবারিক বন্ধু। তাই আমি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। দীর্ঘদিন পরে ফিরে এসেছি। আশা করি. আপনারা সকলেই আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন।

ডাঃ দে বললেন. আপনি মিঃ সিংহর ভাইপো. আমাদের আন্তরিকতা পাবেন বৈকি।

মিঃ সরকার বললেন, ডাঃ দের সঙ্গে আমি একমত। তবে একটা অনুরোধ, আপনার উচিত মিঃ সিংহর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা।

—সে ব্যবস্থা করেছি। বাসববাবু আমার অনুরোধেই একাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

এখন আপনাদের আরেকটা কথা জানানো প্রয়োজন মনে কবি। কাকা মারা যাবার আগে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী আমায় করে গেছেন। ওই সঙ্গে আমায় নিযুক্ত করে গেছেন তন্দ্রার অভিভাবক।

—তন্দ্রার অভিভাবক? দীপঙ্কর রক্ষিত প্রশ্ন করলেন?

হ্যাঁ। তন্দ্রা তাঁর সে আদেশ মেনে নিয়েছে।

বাসব এতক্ষণে কথা বলল, কিন্তু উপস্থিত আপনি সম্পত্তির অধিকারী বা তন্দ্রাদেবীর গার্জেন হতে পারেন না।

—কেন?

—হত্যাকাণ্ডের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা কবতে হবে।

—এ রকম কোন আইন আছে কি?

—আইন থাকলেও আমার জানা নেই। তবে পুলিশ আপনাকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখছে, তাই—

রণেন উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি কাকাকে খুন করেছি, এই কি পুলিশের ধারণা?

—পুলিশের ধারণার কথা পুলিশই আপনাকে বলতে পারবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মত হল, আপনার সামগ্রিক ব্যবহার অত্যন্ত সন্দেহজনক।

—আপনি ভুলে যাবেন না মিঃ ব্যানার্জী; এই কাজে আমিই আপনাকে নিযুক্ত করেছি।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এত দুর্বল স্মরণশক্তি আমার নয়। আপনি আমায় এ কাজে নিযুক্ত করেছেন বলে আপনার যে কোন সন্দেহজনক ব্যবহারকে বেমালুম চেপে যেতে হবে, নিশ্চয়ই এরকম কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

নিজের উত্তেজিত ভাবকে দমন করে রণেন বলল, এখন ও কথা থাক। পরে আলোচনা করবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

আমার মতে এই হল উপযুক্ত সময়। সকলে উপস্থিত রয়েছেন। শুনুন মিঃ সিংহ, কথার জাল বুনে আমার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। কাল রাত্রে আপনি যে সমস্ত কথা আমায় বলেছেন তার উপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। কারণ আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি আপনি দীপঙ্করবাবুকে—

—বাসববাবু!

—হ্যাঁ, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি দীপঙ্করবাবুকে প্রাণে মারতে গিয়েছিলেন।

ঘরে চাঞ্চল্যের ঢেউ বয়ে গেল।

দীপঙ্ক বললেন সেকি! রণেন আমাকে ষ্ট্যাব করেছিল?

রণেন মুখ নিচু করে বসে রইল।

বাসব বলল, কাউকে আঘাত করতে যাওয়াও বিরাট ক্রাইম। আপনাকে আমি শেষ সুযোগ দিচ্ছি কাল সকালেব মধ্যে যদি আপনি প্রকৃত তথ্য আমায় সরবরাহ না করেন তবে পুলিশকে সমস্ত কথা জানাতে বাধ্য হব। এস ডাক্তার। কথার অপেক্ষা না করে বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে শৈবাল বলল, চলে এলে যে?

—এইভাবে চলে আসব আগে থেকেই ঠিক কবে গিয়েছিলাম।

—কি যে হেঁয়ালী করে বলো কিছুই বুঝতে পাবি না।

বাসব শুধু মৃদু হাসল।

প্রেত পুরীর মত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। চাপ চাপ অন্ধকার বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে। সশব্দে কোথায় রাত একটা বাজল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চলেছে কে? তাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা চলন্ত ছায়া। সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। তারপর শেষ প্রান্তের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল বাবান্দার আলো। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তন্দ্রা। ছায়ামূর্তির দিকে দৃষ্টি পড়তেই আর্ত চীৎকার করে উঠল, কে, কে, ওখানে!

ওখান থেকে সরে আসবার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে ওর দু' চোখে অন্ধকার নেমে এল। ও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছায়ামূর্তি আর দাঁড়াল না। যে কাজ করতে এসেছিল তা না করেই দ্রুত নীচে নামতে লাগল। সিঁড়ির মুখ আগলে রয়েছে প্রতিবন্ধকের মত শ্যামাচরণ। এক লহমা। পরক্ষণে পকেট থেকে রিভলবার টেনে বার করল ছায়ামূর্তি। হিস্ করে একটা শব্দ হল—হুমড়ি খেযে পড়ে গেল শ্যামাচরণ।

ছায়ামূর্তি দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে গেল। এখন শুধু বাগানের পাঁচিলটা পার হতে পারলেই হল। কিন্তু দেওয়ালের—কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই নিস্তব্দ রাতকে চুরমার করে আগ্নেয় অস্ত্র গর্জে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ কবে টলে পডল ছায়ামূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে বাগান জেগে উঠল। ঘনঘন হুইশিলের শব্দ পাওয়া গেল। এখানে ওখানে টর্চ জ্বলে উঠল। টর্চ হাতে সুকুমার দেব দ্রুত এগিযে আসছেন। হঠাৎ তিনি বাধা পেলেন।

—আর এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না ইন্সপেক্টার।

—কে, মিঃ ব্যানার্জী? গুলির শব্দ পেলাম—বাসব বলল, টর্চের আলো মাটির দিকে ফেলে দেখুন।

মাটির দিকে আলো ফেলতেই দেখলেন, উপুড হয়ে কে পড়ে আছে।

—কে পড়ে রয়েছে?

—আপনার আসামী। মারা যায়নি, একটু আহত হয়েছে মাত্র। চিনতে পারছেন না—সৌমেন সিংহর হত্যাকারী দীপঙ্কর রক্ষিত।

কোচের উপর আড় হয়ে বসে বাসব পাইপ টানছিল। শৈবালের দিকে বার কয়েক আড় চোখে তাকিয়ে বলল, শেষটুকু শোনবার জন্য বোধহয খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছো ডাক্তার?

—স্বাভাবিক।

—তোমার ব্যস্ততা এক্ষুণি দূর করে দিচ্ছি। বাসব পাইপ নামিয়ে আরম্ভ করল, প্রথমে সন্দেহের লিষ্ট থেকে সকলকেই বাদ দিতে হচ্ছিল। কারণ মিঃ সিংহ মারা গেলে দীপঙ্কব রক্ষিত, মিঃ বর্মন, মিঃ সরকার ও ডাঃ দে-র আর্থিক বা অন্য কোন ধরনের লাভ হচ্ছিল না। তন্দ্রাদেবী তাঁর বাবাকে খুন করেছেন—একথা ভাবতে মনে জোর পাচ্ছিলাম না। বাকী রইল রণেন সিংহ। চাকর হয়ে বাড়িতে ঢুকে কাকাকে

নিজের পরিচয় দিয়ে যখন পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়লেন, তখন কাকাকে খুন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কারণ পরে আবার মিঃ সিংহ মত পাল্টাতে পারেন। মেরে ফেলতে পারলে আর কোন ঝামেলা থাকে না। সেদিন বোর্ডিং হাউসে রণেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় নামার পরই মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনা ঝলসে উঠল। ছেঁড়া কথা জোড়া লাগাতেই বুঝতে পারলাম হত্যাকারী কে? এক আগন্তুকের দীপঙ্করবাবুকে ওই ধরনের কথাবার্তা বলে আহত করার কি উদ্দেশ্য। দুই, দীপঙ্করবাবু ফ্ল্যাট বাড়ি করেছেন। কাজেই সুরকি, পাথরের গুঁড়ো তাঁর বাড়ির কাছে ছড়ান। ইঁট ধুয়ে ধুয়ে কিছুটা অংশ কাদা হয়ে রয়েছে। সুতরাং ওই ধরনের কাদার ডেলা তার জুতোর তলা থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিন, সুকুমারবাবু অনুসন্ধান করে এক ট্যাক্সি চালকের কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে খুনের দিন একজন ভদ্রলোককে রাত এগারটার সময় মিঃ সিংহর বাড়ির সামনে সে নামিয়ে দিয়েছে। সে যা প্যাসেঞ্জারের চেহারার বর্ণনা দিয়েছে—তখন আমার মনে হতে লাগল, দীপঙ্কর বাবুর সঙ্গে যেন ভীষণ মিল। আমি আর তুমি সেই রাত্রেই দীপঙ্করবাবুর বাড়ি হানা দিলাম। সেখানে একটা ওভারকোটের সন্ধান পেয়ে যাই, যার একটা বোতাম ছিল না। আর যেগুলো ছিল তার সঙ্গে মিঃ সিংহর বাগানে কুড়িয়ে পাওয়া বোতামটার মিল হল।

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করল, পরের দিন দুপুরে রণেন বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পরিষ্কার ভাবে নিজের সন্দেহের কথা বললাম এবং এও জানালাম, তিনি যে কাণ্ড করেছেন, তার হাত থেকে আমি তাকে বাঁচাব। শেষে তিনি যা বললেন তার সারাংশ হল, বাড়ি থেকে পালিয়ে রণেনবাবু সোজা মাদ্রাজ চলে যান। সেখানে এক ধনী তামিল ভদ্রলোকের আশ্রয়ে থেকে তার বিষয়-বুদ্ধি পাকে। এইভাবে বহু বছর কেটে যাবার পর কলকাতা ফেরার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠল। তিনি বাল্যবন্ধু দীপঙ্করকে চিঠি দিলেন। এদিকে তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে দীপঙ্করের বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। রণেন কলকাতায় এসে দীপঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে সিংহ বাড়িতেই চাকরি নেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত মাদ্রাজ থেকে তার লেখা চিঠি সৌমেনবাবুর কাছে আসে। এরপর কি ঘটেছে তুমি জান। সৌমেনবাবু খুন হলেন। যে কোন কারণেই হোক, রণেনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, হত্যাকারী কে? তিনি পুলিশের হাত এড়িয়ে, এমনকি আমাকে নিযুক্ত করেও, নিজের হাতেই দীপঙ্করকে শাস্তি দিতে গেলেন। এইখানেই তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা হল তাঁর। হত্যাকারী কে জানা সত্ত্বেও, তিনি নিজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে নাম প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এদিকে প্রমাণের অভাবে আমি কিছু করতে পারছিলাম না।—আমার অবস্থা হয়েছিল, দূর থেকে নরম আলোয় হত্যাকারীকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ছুঁতে পাচ্ছি না। শেষে রণেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্ল্যান ঠিক করলাম। সেদিন সকলের সামনে আমাদের দু'জনে যা কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে, সমস্ত কথা আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া। আমি যখন বললাম, কাল সকালে যদি রণেনবাবু হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত কথা আমায় না বলে দেন তাহলে বিপদে পড়বেন।

দীপঙ্কবাবু প্রমাদ গুণলেন। রণেনবাবু সত্যি যদি তাঁর সমস্ত কথা বলে দেন, তাহলে?

পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। রাত্রেই রণেনবাবুকে পথ থেকে সরাবেন। আমি ইন্সপেক্টারকে প্রস্তুত রেখে ছিলাম। দীপঙ্করবাবু এলেন প্ল্যান মত। কিন্তু বাদ সাধলেন তন্দ্রাদেবী। বাথরুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ঘব থেকে বেবিয়ে বারান্দার আলো জ্বালতেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। চীৎকার কবে উঠলেন। ধরা পড়ার ভয়ে উপায়ান্তর না দেখে তন্দ্রাদেবীকে আঘাত করে পালাতে গিয়ে দীপঙ্করবাবু শ্যামাচরণের মুখোমুখি হলেন। অগত্যা পথ পরিষ্কার করবার জন্য সায়লেন্সারযুক্ত রিভলভার ব্যবহার করলেন, আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম, হাতে-নাতে ধরব দীপঙ্করবাবুকে কিন্তু সে সম্ভবানা সুদূর পরাহত দেখে এবং আসামী নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে লক্ষ্য করে, গুলি করে তাঁকে আহত করলাম।

—কিন্তু দীপঙ্করবাবু সৌমেন সিংহকে হত্যা করলেন কেন?

—এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারলে না। দীপঙ্করবাবু তন্দ্রাদেবীকে বিয়ে করে সৌমেন সিংহর সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত্ব করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু রণেনবাবু মাদ্রাজ থেকে আসায় চিন্তিত হলেন। বোধহয় মিঃ সরকার, ডাঃ দে ও মিঃ বর্মনের সঙ্গে মিঃ সিংহর আলোচনা তাঁর কানে গিয়েছিল। তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে গল্প শেষ করে ড্রইংরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কথাগুলো তাঁর কানে যাওয়া বিচিত্র নয়। এরপর বুঝতেই পারছো, মিঃ সিংহ যাতে উইল বদলাতে না পারেন, সে ব্যবস্থা পাকা করবার জন্য চিরদিনেব মত তাঁকে বিদায় দিতে দীপঙ্কর রক্ষিতের কোন অসুবিধা হয়নি।

শৈবাল বলল, দীপঙ্কর বক্ষিতেব মত লোক পৃথিবীতে আরো কত আছে বলতে পার?

—অনেক—অনেক আছে। আবার তাদের ধবিয়ে দেবার মত লোকেরও তো অভাব নেই ডাক্তার। যেমন আমি—

বাসব আবার পাইপ মুখেব কাছে তুলে নিল।